বর্ষ] [২য় সংখ্যা ।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭ ।

আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা ।

সম্পাদক

শ্রীনলিনী কান্ত দাশ গুপ্ত

বিদ্যাভূষণ, কবিরত্ন ।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী সভায়

অনুমোদিত ও

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত ।

ঢাকা, বৈকুণ্ঠনাথ যন্ত্রে

প্রিণ্টার শ্রীবিহারীলাল দত্তদ্বারা মুদ্রিত ।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা] [বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা ।

সূচী।

প্রাপ্তিসংবাদ

আমরা গত মাসে আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণীর বিনিময়ে ভারতী, ব্রহ্মবিদ্যা, ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, The East, জগজ্জ্যোতি, প্রতিভা, তোষিণী, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষাসমাচার, কুশদহ প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি প্রাপ্ত হইয়া আমাদের সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আষাঢ়ের সংখ্যা হইতে ক্রমশঃ ঐসমস্ত পত্রিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়িনী মাসিক পত্রিকা।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।"

২য় বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ—১৩১৯। { ২য় সংখ্যা

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে—ঘটযোগ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ শারীর ও মানসভেদে ব্যাধিকে দুইভাগে বিভাগ করিয়াছেন। এই শরীর ও মন সুস্থ থাকিলে উভয়াশ্রয়ী আত্মা (জীবাত্মা) সুস্থ থাকেন। এই দুই লইয়াই মানবের পার্থিব সাধনা আবদ্ধ হয়। এই দুইটি ভিত্তি অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে মানব আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। দেহ বাদ দিয়া—দেহকে অবহেলা করিয়া, কেবল মন লইয়া কার্য্য চলে না। আবার মনকে বাদ দিয়া কেবল শরীর লইয়া কেহ কোনও দিন কর্ম্ম করিতে পারেন নাই। দেহস্থ আত্মাও বোধ হয় এই দুইটি ছাড়াইয়া কার্য্য করিতে পারেন না। অশরীরী জীব অথবা যাহারা মুক্তির আদর্শের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা বলিতেছি না। আমাদের মত বদ্ধজীবের সম্বন্ধেই এ কথা সমধিক প্রযোজ্য।

নানা কারণে দেহ ও মন অহরহ অসুস্থ হইতেছে। প্রকৃতিদেবী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম লইয়া এই দেহ ও মনের সুস্থতা সম্পাদন জন্য

সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতেছেন। মানবের ধর্ম্ম, এই প্রকৃতির অবিরোধী কার্য্য করা—প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহারই ভাবে চলিয়া যাওয়া। প্রকৃতি ও তাহার ধর্ম্ম কি? কি করিলে স্বভাবের অবিরোধী কর্ম্ম করা হয়? ইহা জানিতে হইলে প্রাকৃতিক জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লাভ করা প্রয়োজন। আর্য্য-ঋষিগণ এই প্রাকৃতিক জ্ঞান প্রদানের জন্য নানাভাবে নানা ছন্দে শাস্ত্রসমুদ্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। দেহ ও মনের ধর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া এতদুভয়কে সুস্থ রাখিবার নানাবিধ পন্থারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী পথ—হঠযোগ।

হঠযোগ সম্বন্ধে আমাদের দেশে আজকাল জনসাধারণের একটা অদ্ভুত সংস্কার জন্মিয়াছে। অনেকেই ইহাকে অশিক্ষিত সন্ন্যাসী-ফকিরবেশী জুয়াচোর-দিগের বুজ্‌রুকীর একটা পন্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বুজ্‌রুকী দেখাইবার জন্যই যেন হঠযোগের উৎপত্তি। ফাঁকি দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করাই যেন হঠযোগ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ভ্রম ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আজ ইহাকে আমাদের চিন্তার গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়া দিয়াছি। হঠযোগের ভিত্তি যে কত গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি থাকিলেও আমরা কেবল মাত্র অন্ধ সংস্কার বশে তাহা আদৌ বুঝিবার চেষ্টা করি না। স্বাস্থ্যরক্ষাই যে হঠযোগের প্রধান লক্ষ্য ইহা আমরা একেবারেই ধারণা করিতে পারি না। কতকগুলি বুজ্‌রুক্‌ দেখিয়া যদি হঠযোগের ব্যাপার বুঝিতে হয়, তবে অবশ্যই এ ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এই বুজ্‌রুক্‌-গণের কুকর্ম্মের জন্য দায়ী হইতে পারে না।

আমরা সাধারণতঃ যে সমস্ত যোগী দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে বিষম সাম্প্রদায়িকতা বর্ত্তমান। অনেকে তাহাদিগের মতামত শুনিয়াই যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে সংস্কার প্রাপ্ত হন। হঠযোগিরা বলেন হঠযোগ ভাল, হঠযোগে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। রাজযোগীরা বলেন, তা কেন হবে? রাজযোগই শ্রেষ্ঠ, হঠযোগ নিতান্তই নিম্নাঙ্গযোগ, হঠযোগ সাধন করিয়া কোনও লাভ নাই। আবার মন্ত্রযোগীরা বলেন, তা নয়! কলিতে মানবগণ শক্তিহীন, রোগ-শোক-তাপে সদাই মুহ্যমান। হঠযোগ, রাজযোগ

প্রভৃতি সাধনা করা তাহাদের সাধ্যাতীত। কাজেই মন্ত্রযোগই কলিতে একমাত্র অবলম্বনীয়। এইরূপ নানাবিধ মতামত লইয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধ অনবরতঃ চলিতেছে। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে এ সমস্ত অদ্ভুত মতামত কেবল সেই সার্ব্বভৌমিক উদার শিক্ষারাহিত্যের ফল বলিয়াই মনে হইবে। যোগশাস্ত্র সমূহ কখনও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার সামগ্রী নহে। এই বিরোধ বা মতভেদ কেবল পতিত অশিক্ষিত যোগিগণের মধ্যে নিরুদ্ধ। আর আমাদের দেশে অনেকেই এই সমস্ত সন্ন্যাসী ও সাধু-বেশধারিগণের একমাত্র বক্তৃতা শুনিয়া সংস্কারবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং আজীবন সেই ধারণা বহন করতঃ এ সম্বন্ধিয় সত্যের আলোচনায় সূক্ষ্মভাবে মনোনিবেশ করেন না। যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু ভাবেন, মূলে একমাত্র সেই যথাশ্রুত কথা—সেই ভ্রম ধারণা। কিন্তু আমরা যদি এই সংস্কারের গণ্ডীর অপর পারে দাঁড়াইয়া এই বিভিন্ন যোগপন্থার ক্রিয়াক্রমগুলি চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিব—হঠযোগ, রাজযোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি সমস্তই মানবের দেহ, মন ও আত্মার অবস্থাভেদে উহাদের উন্নতি বিধায়ক বিভিন্ন পন্থা মাত্র।

সময় ও প্রয়োজনানুসারে এক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কেবল এই সকলের মধ্যে কোনও একটিকে অবলম্বন করিতে হয়। বিষয়ের পর বিষয় অভ্যাস করিবার নিমিত্ত, অধিকারীর পর অধিকারী হওয়ার জন্য মাত্র এই সকল বিভিন্ন পথ একটির পরে একটি গ্রহনীয়। যোগ—পন্থা, লক্ষ্য নহে। যাহারা লক্ষ্য ও তাহার পন্থা এই দুইকে এক করিয়া ফেলেন তাহারাই যোগাঙ্গ সমুদায়কে ভাগে ভাগে মূল লক্ষ্যরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া বিষম সাম্প্রদায়িক বিরোধের পথ প্রশস্ত করিয়া তোলেন। পরিশেষে এই বিরোধের ফলে মূল হারাইয়া কেবল সংকীর্ণতার খোসা লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকেন।

ধান ভাঁনিতে শিবের গীত গাহিতে চলিলাম। এক্ষণ দেখা যাক্ হঠযোগ কি? শিবসংহিতা প্রভৃতি যোগশাস্ত্রের সারভাগ গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে হঠযোগ দেহ ও মনের উন্নতি বিধানের ও এতদুভয়কে চিরকাল সুস্থ রাখিবার জন্য সুন্দর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে

প্রতিষ্ঠিত একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধারা। হঠযোগের নিয়মে চলিলে রোগ নিবারিত হয়, দেহ ও মনকে দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম রাখিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় এবং বল, বীর্য্য ও আয়ু অক্ষুন্ন থাকে। আজকাল যে সমস্ত হঠযোগী আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তাহাদের অবলম্বনীয় ক্রিয়া-ক্রমের ত্রুটিতে সম্পূর্ণ ফল অনেকেই পা'ন না। কেহ বা না বুঝিয়া ক্রিয়াক্রমগুলি বিপরীতভাবে অবলম্বন করা হেতু রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এই সমস্ত ত্রুটি সত্বেও বলিতে পারা যায়, তাহাদের মধ্যে এখনও যতটা শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি দেখা যায় অন্য কোন মতেই তাহা পরিলক্ষিত হয় না। কর্ম্ম করিবার মত অসাধারণ দৈহিক শক্তি লাভ করিতে হইলে হঠযোগই তাহার একমাত্র উপায়।

শাস্ত্রে হঠযোগের দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। গোরক্ষ নামক জনৈক যোগী এবং প্রাচীন মার্কণ্ডেয় মুনি এই দুই মতের অনুষ্ঠা[illegible]। উভয়ের প্রণালীও বিভিন্ন। এই যোগাঙ্গ গোরক্ষমুনির মতে ছয়টি [illegible] মার্কণ্ডেয় মতে আটটি। উভয়মতেই "ঘটযোগ" সর্ব্বাগ্রে আচরণীয়। এই ঘটযোগই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

এক্ষণ দেখা যাক, ঘট্ অর্থে কি বুঝায়। শাস্ত্র বলেন—

প্রাণাপান নাদ বিন্দু জীবাত্মা পরমাত্মনঃ
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘটউচ্যতে।

প্রাণ, অপান, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই সমুদায়ের একত্র সমাবেশকেই ঘট বলে। ঘট শব্দে শরীরকে বুঝায়। শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব (দেহের লঘুত্ব অর্থাৎ শরীরের স্ফূর্ত্তিযুক্ত সচ্ছন্দতা) প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ততা এই সাতটি গুণের সাধনাই ঘটযোগ। ঘটযোগের ক্রিয়াক্রমগুলি যথানিয়মে অবলম্বিত হইলে দেহাভ্যন্তরে এই সপ্তগুণ ক্রম-বিকাশিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। ষট্‌কর্ম্ম, আসন, মুদ্রা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান ও সমাধি এই সাতটী কার্য্যের দ্বারা উক্ত সাতটি গুণ জন্মিয়া থাকে।

শোধনই দেহকে সুস্থ রাখিবার পক্ষে প্রথম ও প্রধান উপায়, ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকি, ত্রাটক ও কপালভাতি এই ষট্‌কর্ম্মদ্বারা

দেহের সেই শোধন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহাতে দূষিত শ্লেষ্মা, পিত্ত রস ও মল প্রভৃতি দেহের নানা অংশে আবদ্ধ রুজাকর পদার্থগুলিকে আকর্ষণ ও নিষ্কাসন করিয়া শরীর নির্ম্মল রাখে। ইহার মধ্যে আদি ধৌতিযোগ চারিভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে আবার কতকগুলি উপভাগ আছে। পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার নিমিত্ত নিম্নে ধৌতিযোগের একটি খণ্ডা বা 'টেবিল' প্রদত্ত হইল।

ধৌতি

- অন্তর্ধৌতি
  - বাতসার
  - বারিসার
  - বহ্নিসার
  - বহিস্কৃত
- দন্তধৌতি
  - দন্তমূলধৌতি
  - জিহ্বামূলধৌতি
  - কর্ণরন্ধ্রধৌতি
  - কপালরন্ধ্রধৌতি
- হৃদ্‌ধৌতি
  - দণ্ডধৌতি
  - বমনধৌতি
  - বাসধৌতি
- মূলশোধন
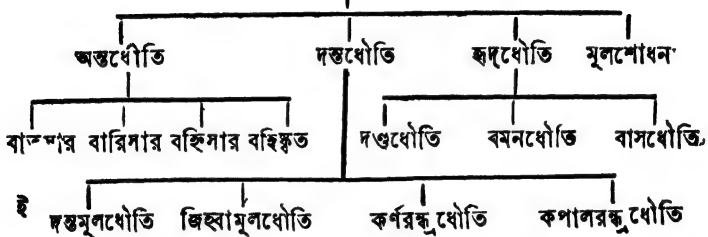
এতন্মধ্যে প্রথম অন্তর্ধৌতি—"ঘটস্য নির্ম্মলার্থায় অন্তর্ধৌতি চতুর্ব্বিধা।" শরীরকে মলশূন্য করিবার নিমিত্ত বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার ও বহিস্কৃত, এই চারিপ্রকার ধৌতির ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে প্রথমে বাতসার—কাকের ঠোটের মত ওষ্ঠদ্বয় সঙ্কুচিত করতঃ ধীরে ধীরে ঐ ওষ্ঠপুটে বায়ু টানিয়া টানিয়া পুনঃ পুনঃ পান করতঃ ঐ বায়ু উদরমধ্যে পরিচালিত করিয়া পুনরায় মুখ দিয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহাই বাতসার ধৌতি বিধি। বাতসার করিলে শরীরের নির্ম্মলতা সাধিত হয়, রোগ সমূহ বিদূরিত হইয়া যায় ও জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (১) যিনি এই ভাবে শীতল সরস বায়ু পান করেন, শ্রম, দাহ, জরা প্রভৃতি কোনও রোগই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। (২) দিবা রাত্রি এই ভাবে বায়ু পান

(১) বাতসারং পর গোপ্যং দেহ নির্ম্মলকারকম্‌
সর্ব্বরোগক্ষয়করং দেহানলবিবর্দ্ধনম্‌।

(২) সরসং য পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধী
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহ জরাময়াঃ।

করিলে ক্ষয়রোগ পর্য্যন্ত দূরীভূত হয়। (৩) ইহাতে দূরশ্রুতি ও দূরদৃষ্টি লাভ হয় এবং প্রাণ ও অপান বায়ুর কার্য্য সমভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে। (৪) পাশ্চাত্য মতের দোহাই না দিলে আজকাল শত যুক্তি থাকিলেও আমরা কোনও কিছুই গ্রহণ করিতে রাজি নহি। কাযেই এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মতের সহিত ইহার কতটুকু সমন্বয় করা যাইতে পারে তাহাই অতঃপর আলোচনা করিব। পাশ্চাত্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানবিদেরা বলেন অক্‌সিজেন (Oxygen) দেহকে সুস্থ সবল ও রোগশূন্য রাখিবার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান যৌগিক পদার্থ। তাহারা আজকাল নানাবিধ রোগেই ইন্‌হেলার (inhaler) বা ধূমনেত্র (৫) সাহায্যে এই অক্‌সিজেন সেবনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য মহামুনি অগ্নিবেশ ধূমনেত্র সাহায্যে বাষ্প প্রয়োগের জন্য নানাপ্রকার রোগারোগ্যকর যোগ উপদেশ দিয়াছেন। একটু মনোযোগের সহিত এই ধূমনেত্র প্রয়োগোপযোগী ব্যবস্থাসমূহের বিষয় চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলিই প্রকারান্তরে অকসিজেন গ্যাস প্রয়োগেরই প্রকার ভেদ মাত্র। হঠযোগ শাস্ত্রে কেবল ওষ্ঠদ্বয়ের আকারগত অবস্থান সঙ্কেত দ্বারাই ঐরূপ অক্‌সিজেন পানের সুন্দর ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পাঠক, এক্ষণ বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যে এই বাতসার ধৌতিযোগ কতখানি গভীর বৈজ্ঞানিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আরও ভাবিয়া দেখুন, নিত্য আচরণীয় কার্য্যাদির মধ্যে ইহা অভ্যস্ত রাখা আমাদের পক্ষে কত প্রয়োজন। দুইটী Dyspepsia (বাতাজীর্ণ) রোগীর বিষয় আমি জানি তাহারা এই বাতসার ধৌতি যোগ যথানিয়মে অবলম্বন করিয়া কঠিন ডিস্পেপ্‌সিয়া রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

---

(৩) অহর্নিশং পিবেদ্‌যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ
দূরশ্রুতি দূরদৃষ্টিস্তথাস্যাদ্দর্শনং খলু।

(৪) কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে।

(৫) শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা বাষ্প বিশেষের গ্রহণোপযোগী যন্ত্র।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে পাশ্চাত্যমতে যে সমস্ত রোগে (oxygen) পান করা রোগারোগ্যের পক্ষে প্রয়োজন মনে হয়, সেই সমস্ত স্থলেই এই বাতসার ধৌতি যোগ যথানিয়মে অবলম্বন করিলে সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। অথচ অনেক অনর্থক অর্থব্যয়ও লাঘব হয়। পবিত্র, নির্ম্মল ও চতুর্দ্দিকে খোলা মেলা স্থানে বসিয়া এই বাতসার ধৌতিযোগ-ক্রিয়াক্রম অভ্যাস করিতে হয়। দূষিত পূতিগন্ধময় আবদ্ধ গৃহে এ যোগ অভ্যাস করিলে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। এইটুকুই ইহার বিশেষত্ব।

(ক্রমশঃ)

শ্রী ঃ—

যক্ষ্মা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যে সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদা ঘরের মধ্যে থাকিয়া কাজ করে, ব্যবসায়ের খাতিরে অথবা অন্য কোন ও কারণে যে সমস্ত ব্যক্তি বাহিরে খোলা স্থানে থাকিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না অথবা থাকে না এই ব্যাধি দ্বারা তাহারাই আক্রান্ত হয়। পরন্তু চিকিৎসক, আমিন, কনট্রাক্টার, কৃষক, শকটচালক নৌকাচালক, ধীবর, ট্রাম্‌কণ্ডাক্টার, যোগী, সন্ন্যাসী ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যক্তির অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকিয়াই কাজ করিতে হয়, তাহাদের এই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অতি কম। যে সমস্ত ইতর জন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সর্ব্বদা বাহিরে থাকে, তাহাদেরও এই ব্যাধি হইতে দেখা যায় না। কিন্তু সেই সমস্ত জন্তুদিগকে গৃহে বদ্ধাবস্থায় রাখিলে সময়ে এই ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

এস্থলে আর একটি কথা বলাও নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করি যে, যক্ষ্মারোগীর পক্ষে দিন রাত্রি খোলা ঘরে কি খোলা স্থানে থাকা পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট অত্যন্ত বিরক্তিকর হইতে পারে, এবং সমাজের অনেকের নিকট ইহা নিতান্ত "বাড়াবাড়ি" কি অসঙ্গত বিবেচিত হইতে পারে। এমন কি কোন কোন স্থানে রোগীকে কেহ বাতুল ও

সাব্যস্ত করিতে পারে। কিন্তু তজ্জন্য রোগীর বিন্দুমাত্রও বিচলিত হওয়া উচিত নহে। রোগীর সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে তাহার জীবন তুলাদণ্ডের একদিকে স্থাপিত, অপর দিকে ঈষৎ ভার বৃদ্ধি হইলেই তাহার মৃত্যু। মৃত্যুও সহজ মৃত্যু নয়, দীর্ঘকালস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু।

শরীরে হঠাৎ ঠাণ্ডা কি প্রবল বায়ু প্রবাহ না লাগে এবং শরীর সর্ব্বদা গরম থাকে এজন্য যক্ষ্মা রোগীদের দেহ সকল সময়েই উপযুক্ত বস্ত্রাদির দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। পরিচ্ছদ হালকা অথচ গরম হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। সর্ব্ব নিম্নে অর্থাৎ প্রথমেই (next to the skin) ফ্লানেলের জামা ব্যবহার করা অনেকের পক্ষেই হিতকর। যক্ষ্মারোগীদের গোঁপ দাড়ি বৃদ্ধি হইতে দেওয়া ভাল। তাহাদের ব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগীর ফুসফুসের ব্যায়াম (Breathing or lung's exercise) দ্বারা ফুসফুসের বল বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক। খুব দ্রুত ও গভীর শ্বাস গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া (Deep and strong inhalation and long exhalation) যতদুর সম্ভব ফুসফুস প্রসারিত এবং সঙ্কুচিত কর, সময়ে সময়ে খুব দ্রুত ও গভীর নিশ্বাস দ্বারা ফুসফুসে বায়ু কয়েক মুহূর্ত্ত ধারণ কর এবং পরে অতি ধীরে ধীরে উহা ত্যাগ কর। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া দিবসের মধ্যে বহু সময় বহু বার ঐরূপ কর, ব্যাসিলাসগুলি যেন এক মুহূর্ত্ত ও বিশ্রাম না পায়। তাহারা যেন বুঝিতে পারে যে পশ্চাদ্দিক হইতে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে তাড়া করা হইতেছে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত ব্যাসিলাসগুলি অবসর পাইলেই তাহাদের ধ্বংসকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে।

যত অধিক এইরূপ ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিবে, ততই এই সমস্ত ব্যাসিলাসগুলি ধ্বংস হইতে থাকিবে এবং ততই ফুসফুসের অনাক্রান্ত সুস্থ অংশ শক্তিশালী হইয়া এই সমস্ত ব্যাসিলাসের আক্রমণে বাধা দিতে সক্ষম হইবে। খোলা স্থানে বিশুদ্ধ বায়ুতে যত অধিককাল এইরূপ ভাবে শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করা যায় ততই উত্তম।

গ্লাসগো মেডিকেল জার্ণেলে (Glasgow Medical journal) ডাক্তার রিচার্ডসন (Richardson) বলেন যে শারীরিক অন্য কোন যন্ত্র ব্যাধিগ্রস্ত

হইলে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্রাম রাখা আবশ্যক, কিন্তু ফুসফুস রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে যত বিশ্রাম না দেওয়া যায় ততই ভাল। রোগীর গয়ার (কফ) জলে ডুবিয়া গেলে তাহার অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন মনে করিতে হইবে, কিন্তু তা বলিয়া হতাশ হওয়া উচিত নহে। (To loose heart is fatal) "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"। বিপদে অধীর হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। "চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।" রোগ যতই কেন কঠিন না হউক, নিশ্চয় আরোগ্যলাভ করিবে, মনে মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ঐকান্তিক একাগ্রতার সহিত অদম্য উৎসাহে অবিলম্বে সংগ্রামে লিপ্ত হইতে পারিলে তাহার আরোগ্যলাভের বিশেষ সম্ভাবনা।

"হাইজিনিক ট্রিটমেণ্ট (Hygienic Treatment) রচয়িতা সুবিখ্যাত হল সাহেবের (A. Wilford Hall) ২৯ বৎসর বয়ক্রম কালে, সাধারণ্যে বক্তৃতা করিতে করিতে ফুসফুসের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে এবং পশ্চাৎ তিনি যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা এইরূপ সাংঘাতিক হয় যে, তাঁহার একটী ফুসফুস সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় এবং অপরটী ও বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার একভ্রাতা এইরোগে ঈদৃশ অবস্থায় মারা গিয়াছেন। বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎকদিগকে আহ্বান করা হইলে সকলেই তাঁহার আসন্ন মৃত্যু নিশ্চয় বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তিনি ইহাতে অত্যন্ত চমকিত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই জীবনে হতাশ হইলেন না। সম্পূর্ণরূপে যক্ষ্মারোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিব মনে মনে তিনি এই সঙ্কল্প করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং অচিরে এই ব্যাধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, ক্রমে তিনি এইরূপ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন যে ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও তাহাকে যুবা ব্যক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইত।

যক্ষ্মারোগীর শরীর অতি দ্রুতবেগে ক্ষয় হইতে থাকে। সুতরাং তাহার খাদ্য এইরূপ হওয়া আবশ্যক যে তদ্দ্বারা যেন তাহার শারীরিক দৈনন্দিন ক্ষয়পূরণ হইয়া অতিরিক্ত বল সঞ্চয় হইতে পারে। এই নিমিত্ত তাহাকে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলে রোগী সহজেই আরোগ্যলাভ করিতে

সক্ষম হয়। স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিজনক অথচ সহজ পাচ্য দ্রব্যাদি অল্প পরিমাণে দিবসের মধ্যে বহুবার ভোজন করা কর্ত্তব্য। ডাক্তার এণ্ডার্সন (Dr. Mc Call Anderson) রোগীর শক্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাহাকে সমস্ত দিনরাত্র ব্যাপিয়া এক ঘণ্টা কিং অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর পুষ্টিকর পেয় খাদ্য দিতে বলেন।

পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে পাশ্চাত্যমতে কডলিভার অয়েলই (Codliver Oil) সর্ব্বপ্রধান। ইহাকে ঔষধ না বলিয়া খাদ্য বলাই সঙ্গত। ইহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। ভুক্ত জিনিষ পরিপাকের সহায়তা করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, এবং দেহের ওজন বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ডাক্তার হুইট্‌ল (Dr. Whitlow) বলেন যে পরিমাণ কডলিবার অয়েল সেবন করা যায়, সেই পরিমাণ দেহের ওজন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

রোগীর কোষ্ঠ বেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। মাঝে মাঝে, কিম্বা আবশ্যক বোধ করিলে প্রতিদিনই, ডুশ দ্বারা অন্ত্র ধৌত করা ভাল। শীতল জলে স্নান সহ্য না হইলে উষ্ণজলে স্নান করাই বিধেয় এবং তন্মধ্যে কিঞ্চিত সামুদ্রিক লবণ (sea salt) মিশ্রিত করিয়া স্নান করা সমধিক উপকারী। সমুদ্র জলে স্নান অনেকের পক্ষেই বিশেষ হিতকর। কোন প্রকার স্নানই সহ্য না হইলে গরম জলে গামছা ভিজাইয়া এবং উহা নিঙ্‌ড়াইয়া তদ্দারা উত্তমরূপে গা মুছিয়া ফেলা উচিত। যে প্রকারে হউক যক্ষ্মারোগীদের শরীর উত্তমরূপে পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক। স্নান ইত্যাদির পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বেশ করিয়া গা মুছিয়া গরম বস্ত্রাদির দ্বারা অন্ততঃ কিয়ৎকাল শরীর আবৃত করিয়া রাখা ভাল। ইহাতে শরীর হইতে প্রচুর ঘর্ম্ম বাহির হইয়া শরীরের প্রভূত উপকার সাধন করিবে। স্নানের পূর্ব্বে শরীরে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করা বিশেষ ভাল।

প্রথম অবস্থায় এই রোগ এরূপ গুপ্ত অবস্থায় থাকে যে ইহা কিয়ৎদূর অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ইহার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। কিয়ৎপরিমাণে ফুসফুসে টিউবারকেল (Tubercle, স্ফোটক বিশেষ) না জন্মিলে অনেক সময় বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকগণও রোগ নির্ণয়ে সমর্থ হন না। এমতাবস্থায় কফ, সামান্য কাশী, ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস, শরীর দুর্ব্বল,

সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্তি বোধ এবং ক্রমে ত্বকের উষ্ণতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই এই রোগ সন্দেহ করা উচিত।

যক্ষ্মারোগ অতি ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া যে স্থানে এই রোগ একবার দেখা দেয়, সেই স্থানের বহু দুর্ব্বল ও রুগ্ন ব্যক্তি ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তৎকালে ঐ সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানে যত্নশীল হওয়া উচিত। ব্যাধি জন্মিতে না দেওয়া যেমন সহজ, জন্মিলে তাহা রোধ করা তত সহজ নহে। সময়ের একটী ফোঁড় অসময়ের দশটী ফোঁড়ের সমান। পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে অতি অল্প আয়াসেই ইহার আক্রমণ ব্যর্থ করা যাইতে পারে। কিন্তু পরে বহুচেষ্টা কি ক্লেশ স্বীকার করিলেও অনেক সময় বিশেষ কোন ফল লাভ হয় না। অনেক সময় ইহা যেরূপ ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আমন্ত্রন করে তাহা মনে করিয়াও ঐ সমস্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যক্ষ্মারোগীর "গয়ারে" বহুসংখ্যক ব্যাসিলাস বিদ্যমান থাকে, সুতরাং তাহার 'গয়ের' ফেলিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। একটি পাত্রে কার্ব্বলিক য়্যাসিড রাখিয়া তন্মধ্যে সমস্ত "গয়ের" ফেলা উচিত, অন্য কোনও স্থানে যাহাতে বিন্দুমাত্র "গয়ের" না পড়ে তাহা করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। পরে ঐ 'গয়ের' মাটিতে প্রোথিত করিয়া ফেলা বিশেষ আবশ্যক। এতদ্দ্বারা রোগের সংক্রমতা নিবারিত হয়, সুতরাং রোগব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। অন্য কোনও ব্যক্তি ইহা দ্বারা আক্রান্ত না হয় কেবল তজ্জন্যই যে ইহা করা আবশ্যক তাহা নহে, ইহা দ্বারা রোগীরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ঐ সমস্ত নিক্ষিপ্ত ব্যাসিলাস দ্বারা সে নিজেই প্রবল বেগে আক্রান্ত হইতে পারে, এবং সমস্ত শরীর বিষে জর্জ্জরিত হইয়া অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। অনেক স্থলে রোগী আরোগ্য পথে উপস্থিত হইয়াও পুনর্ব্বার ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে এরূপ দেখা গিয়াছে। যক্ষ্মারোগীর 'গয়ার' যে পর্য্যন্ত শুষ্ক না হয় সে পর্য্যন্ত তাহা হইতে কোনও আশঙ্কা থাকে না। সুতরাং কার্ব্বলিক য়্যাসিড অভাবে পিকদানে জল রাখিয়া তন্মধ্যেও নিষ্ঠীবন ফেলা

যাইতে পারে, কিন্তু যাহাতে তদুপরি মাছি ইত্যাদি বসিয়া রোগ ব্যাপ্তি না ঘটায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পিকদানে কিঞ্চিৎ কেরোসিন তৈল কি চূণের জল ইত্যাদি রাখিলে এই উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারে। সাধারণ পিকদান অপেক্ষা "স্পুটাম মাগ" (Sputum mug) নামক পাত্র মধ্যে নিষ্ঠীবন ফেলা যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অধিক নিরাপদ। একটী স্পুটাম মাগের মূল্য প্রায় দুই টাকা।

যক্ষ্মারোগীকে সকলেই অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক রোগী যদি বুদ্ধিমান হয়, এবং তাহার 'গয়ের' সে যত্নপূর্ব্বক কোনরূপ আধারে সঞ্চিত করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে সেই রোগী হইতে ভয়ের কোনও কারণ থাকে না। যক্ষ্মারোগীদের বাহিরে ব্যবহার করার জন্য এক প্রকার "পকেট-ফ্লেক্সস" (Pocket flax) নামক গয়ের বা কফ ফেলিবার পাত্র পাওয়া যায়। উহা সঙ্গে করিয়া রোগী যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারে। উহা সঙ্গে থাকিলে, রাস্তায় কি অন্য কোনও স্থানে থুথু না ফেলিয়াই পারে। উহাতে ফেলিলে তাহা পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা নাই। উহা লইয়া রোগীর সভ্যসমাজে চলাফেরা কোন অসুবিধা ঘটে না। উহা আয়তনে ক্ষুদ্র বলিয়া কাহারও বড় নজরে আসে না, সর্ব্বদা পকেটে করিয়া রাখা যায়। যক্ষ্মারোগী যাহাতে তাহার নিজের 'গয়ের' গিলিয়া না ফেলে তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক। 'গয়ের' গিলিয়া ফেলার দরুণ অনেক সময় তাহার অন্ত্র তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। দৈবাৎ গিলিয়া ফেলিলে ভয়ে নিতান্ত আড়ষ্ট হওয়া অবিধেয়।

যক্ষ্মারোগীদের প্রশ্বাসবায়ু দ্বারা কখনও এই রোগব্যাপ্তি ঘটে না। তবে কথা বলিবার সময় এবং কাসিবার সময় নিষ্ঠীবন বহির্গত হইলে তদ্দ্বারা রোগব্যাপ্তির সর্ব্বদাই সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং কথা বলিবার সময় এবং কাসিবার সময় মুখের নিকট তাহাদের রুমাল কি নেকড়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক এবং তৎপর ইহা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা কিম্বা অগ্নিতে ভস্ম করা কর্ত্তব্য।

যক্ষ্মারোগীর সেবাশুশ্রূষাকারিগণের বেশ স্বাস্থ্যবান হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে সুস্থব্যক্তির কখনও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার

সম্ভাবনা নাই, তবুও সেবাশুশ্রূষাকারিগণের সর্ব্বদা রুগ্ন ব্যক্তির ন্যায় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলাই ভাল।

যক্ষ্মাবীজের "টীকা" দ্বারা এই রোগ আরোগ্য করার যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহা বিপজ্জনক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারাও কোন সুফল লাভ হয় নাই। পাশ্চাত্যমতে ক্রিয়োজুট (Creasote) এ রোগের পক্ষে একটী ভাল ঔষধ। ইহাতে যক্ষ্মাবীজ ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। কডলিভার অয়েলের সহিত দুই বিন্দু ক্রিয়জোট মিশ্রিত করিয়া অথবা ইহার বটিকা (Capsule) দিবসের মধ্যে ৩।৪ বার সেবন করা যাইতে পারে। ক্রিয়জোট এক প্রকার বিষ, সুতরাং খালি পেটে কখনও সেবন করা উচিত নহে। অন্ততঃ সামান্য কিছু দুগ্ধ পান করিয়াও ইহা সেবন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্রিয়াজোট সেবন না করিয়া রেস্পিরেটার যন্ত্রযোগে ইহা আঘ্রাণ করাই সর্ব্বপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এতদ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যাসিলাসের উপর কাজ করিয়া থাকে। একটী পঞ্চাশং ছিদ্রযুক্ত রেস্পিরেটার (a fifty-colled respirator) যোগে দশ বিন্দু "বিচউড্ ক্রিয়জোট" (Beechwood creasote) প্রাতে ও রাত্রিতে আঘ্রাণ করা যাইতে পারে। ক্রিয়জোট যক্ষ্মারোগীর "গয়ার" নির্ব্বিষ করিয়া থাকে বলিয়া ইহা ব্যবহারে যক্ষ্মারোগী কখনও তাহার "গয়ার" গিলিয়া ফেলিলে তাদ্দ্বারা তাহার অন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং "গয়ারের" সংস্পর্শে ফুসফুসের অন্যস্থান আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও দূরীকৃত হয়। ক্রিয়জোটে কফনাশক শক্তিও আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মকরধ্বজ ও পুটপক্ক লৌহ।

প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ বাদীদের মতে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন ঔষধ প্রস্তত প্রণালীতে অনেকগুলি ভ্রম পরিদৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা মকরধ্বজ ও পুটপক লৌহ সম্বন্ধে তাহাদের মতের আলোচনা করিব।

তাহাদের মতানুসারে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে স্বর্ণের ব্যবহারের কোন তাৎপর্য্য নাই। এবং যদিও স্বর্ণ সংযুক্ত করা যায়, তবে তাহাতে ও বিনাস্বর্ণে

প্রস্তুত রসসিন্দূর নামক পদার্থে কোন প্রভেদ থাকেনা। যেহেতু উভয়ের রাসায়নিক পরীক্ষায় কোন প্রভেদ দেখা যায় নাই। লৌহ পুটপক্ক করিয়া যে পদার্থ পাওয়া যায়, নব্য বৈজ্ঞানিকেরা অতি সামান্য মাত্র ব্যয়ে ও পরিশ্রমে হীরাকস হইতে তদপেক্ষাও উত্তম লৌহভস্ম প্রস্তুত করিতে পারেন। রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে শত বা সহস্র পুটের লৌহে যে অবিশুদ্ধ ফেরিক অক্সাইড (Ferric Oxide) পাওয়া যায়, হীরাকস হইতে প্রস্তুত করিলে তাহা বিশুদ্ধ ভাবে পাওয়া যাইতে পারে সুতরাং এই প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞান সম্মত উপায়গুলি গ্রহণ করা কবিরাজ মহাশয়দের বিশেষ আবশ্যক।

যাঁহারা রীতিমত আয়ুর্ব্বেদ পড়িয়াছেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রমাণ (শব্দ) গুলি উদ্ধার করিয়া এই তর্কের উত্তর দিতে পারেন, কিন্তু সেভাবে বৈজ্ঞানিকগণ বুঝিতে রাজী হইবেন না। এবং আজকালকার বিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ ব্যক্তিই তাদৃশ প্রমাণ গুলিকে ঋষিবাক্য বলিয়া শ্রদ্ধা করতঃ মানিয়া লইবেন না। সুতরাং তাঁহাদের বুঝিবার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা যুক্তি সমূহের অসম্পূর্ণতা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

দ্রব্য মাত্রেরই রাসায়নিক (Chemical action) ও শারীরিক কার্য্যকারিতা শক্তি (Physiological action) এক প্রকার নহে। রসায়ণবিৎ দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া তাহার সাধারণ গুণ প্রকাশ করিলে ভিষক্ মানব শরীরে প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার শারীরিক কার্য্যকারিতা শক্তি নির্ণয় করেন। তৎপর তাহা ঔষধরূপে পরিগৃহীত হয়। কেবল রসায়ণবিদের পরামর্শ অনুসারে প্রাচীন ঋষিগণ ঔষধ নির্ণয় করেন নাই এবং বর্ত্তমানেও বোধ হয়, পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান কেবল রসায়ন শাস্ত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। তাহা হইলে সর্ব্বাবস্থায়ই সাপের বিষও মানব শরীরের বিশেষ উপযোগী পদার্থ হইয়া পড়িত। (১) সর্প বিষের মধ্যে রাসায়নিক পরীক্ষায় যে পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা মানব শরীরের বিশেষ পুষ্টিসাধনেই সক্ষম। দ্রব্যের

(১) Chemistry has not yet succeeded in separating the active principles of snake poison. Ency. 9th Edi. 22. Vol. 191 p. p.

বিশ্লেষণ বিচার করিলেও বর্ত্তমান রসায়ন বেত্তাগণ এখনও বহু পদার্থের গুণ বিচারে অক্ষম। সুতরাং এস্থলে চিকিৎসকদিগের ব্যবহারিক বচনই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। প্রাচীন চিকিৎসকগণ শরীরে প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে স্থলে রসসিন্দুর "অনুপান বিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্" সেস্থলে স্বর্ণসিন্দুর "রসায়নং বৃষ্যতরঞ্চ বল্যং মেধাগ্নিকান্তি স্মরবর্দ্ধনঞ্চ।" সুতরাং "বল্য ও বৃষ্যতরঞ্চ" ইহার বিশেষগুণ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ কবিরাজ মহাশয়েরাও এতদুভয়ের প্রয়োগে এই প্রকার পার্থক্য দেখিতেছেন। রোগীর অবসন্নতায় স্বর্ণসিন্দুর অল্পমাত্রায় যে প্রকার কাজ করিয়া থাকে তাহা রসসিন্দুর দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই।

লৌহ সম্বন্ধেও প্রাচীন ঋষিগণ দেখিয়াছেন যে:—

যথা যথা প্রদীয়ন্তে পুটাঃ সুবহুশো যদি।
তথা তথা প্রকুর্ব্বন্তি গুণানেব সহস্রশঃ।

রাসায়নিক পরীক্ষায় পুটপক্ক লৌহ ও হীরাকস হইতে প্রস্তুত ফেরিক অক্সাইড এক পদার্থ হইলেও তাহাদের গুণগত পার্থক্য দেখাযায়। হীরাকসের লৌহ সেবনে মলের সঙ্কোচ হয় ও মল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। (২) কিন্তু প্রাচ্যমতের লৌহভস্ম সেবনে মল কৃষ্ণবর্ণও হয় না আর মলের সঙ্কোচও জন্মে না। আয়ুর্ব্বেদে—"লৌহং তিক্তং সরং শীতং কষায়ং মধুরং গুরু" এই বচন দ্বারা লৌহকে মল সঙ্কোচক না বলিয়া সারকই বলা হইতেছে। ইহা ব্যবহার করিয়া সকলেই বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

অবশ্য দ্রব্যগত উপাদান এক হইলে গুণের পার্থক্যের হেতু কি? এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদবিৎ কখনও সে প্রকার প্রশ্ন করিবেননা। কারণ তাঁহারা জানেন—

"রস-বীর্য্য-বিপাকানাং সামান্যং যত্র লক্ষ্যতে।
বিশেষঃ কর্ম্মণাঞ্চৈব প্রভাবস্তস্য স স্মৃতঃ॥
মণীনাং ধারণীয়ানাং কর্ম্ম যদ্ বিবিধাত্মকম্।
তৎপ্রভাব কৃতং তেষাং প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে॥"

(চরক সূত্রস্থান ২৬ অঃ)

---

(২) Vide Kerr's Meteria Medica Page 306-7.

রসবীর্য্য বিপাকে তুল্যগুণ হইলেও বস্তুদ্বয়ের মধ্যে ভিন্নরূপ ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এই পার্থক্য যে শক্তিদ্বারা সম্পাদিত হয় সে শক্তিকে ঋষিগণ "প্রভাব" বলিয়াছেন। তাহার ভূরি উদাহরণ আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত আছে। এই শক্তি জড়তত্ত্ববাদিগণের স্থূল বিশ্লেষণী জ্ঞানের অতীত। ইহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত। বস্তুতঃ মনোবিজ্ঞানের সীমায় না পৌছিতে পারিলে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সম্ভাবনা নাই। ডাক্তার ক্রুগ্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও আজকাল ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। বর্ত্তমান রসায়ণবিদের মতে বহুদ্রব্যের গুণের প্রতি প্রত্যক্ষ কারণতা এতক উপলব্ধি হয় নাই। একই উপাদানের দ্বারা বিভিন্ন গুণসম্পন্ন বিভিন্নদ্রব্য হইতে দেখা যাইতেছে। (৩) কেবল উত্তাপের ভেদেই এমোনিয়ম সাওনেট হইতে ইউরিয়া নামক পদার্থ জন্মে। তাহার উত্তাপও অতি মৃদুভাবে দিতে হইবে নতুবা ঐ পদার্থ হইবেনা। কেবল মৃদু উত্তাপ দিয়াই যদি এক পদার্থকে ভিন্ন পদার্থে পরিণত করা যায় এবং তাহাদের রাসায়নিক উপাদান একমতই থাকে, তবে লৌহ ক্রমশঃ পুটাধিক্যে কেন যে বিশিষ্ট গুণ হইবেনা এরূপ প্রশ্ন করাই বিশেষজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে। বর্ত্তমান রসায়নের আরও একটী উদাহরণ দ্বারা আমরা এইমত বিশেষভাবে সমর্থন করিব। নব্য রসায়নী বিদ্যায় ফস্‌ফরাস একটী মৌলিক উপাদান। ইহা দুইপ্রকার—রেড্ ফস্‌ফরাস ও এমর ফস্‌ফরাস। ইহার মধ্যে রেড্ ফস্‌ফরাস বিষাক্ত নহে এমর ফস্‌ফরাস তীব্র বিষ। এই বিষাক্ত ফসফরাসকে আবৃত পাত্রে রাখিয়া পরিমিত উত্তাপ দিলে তাহা রেড্ ফসফরাস হয় ও তাহার বিষগুণ থাকেনা। (৪) এইপ্রকার বিষয়গুলি

(৩) Ammonium cyonate and urea are two totally different and distinct kinds of matter, their molecules, however, each contain the same atoms and in the same number .... When Ammonium is gently warmed. the eight atoms composing the molecules undergo process of rearrangement and the substance is changed into urea. (Newth's chemistay p. p. 13.—14.)

(৪) Phosphorus is a powerfully poisonous substance. In large doses it causes death in a few hours and in small

অধ্যয়ন করিয়াও পুটপক্ক লৌহে এবং স্বর্ণসিন্দুরে বিশিষ্ট গুণ কেন হয় যদি কেহ প্রশ্ন করেন তবে আমরা নাচার।

প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণবাদী রসায়নবিদ্‌গণ যৎকালে এইরূপ গুণের পার্থক্য দেখিয়া প্রমাণ দেখাইতে অক্ষম হ'ন, তখন পারমাণবিক ব্যবস্থা বিপর্য্যয় (Molecular rearrangement) নামক অনুমান প্রমাণকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুটপক্ক লৌহের পুটের তারতম্য অনুসারে এবং মকরধ্বজ ও রসসিন্দুরে যখন আমরা গুণের পার্থক্য দেখিতে পাইতেছি তখন এক উপাদান হইলেও তাহাতে এইপ্রকার (Molecular rearrnge-ment) পারমাণবিক ব্যবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে স্বীকার করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

এস্থলে আর এক তর্ক উঠিতে পারে। পাশ্চাত্য প্রথার ঔষধগুলি যাদৃশ বিশুদ্ধ (Pure) হয়, প্রাচীন প্রথায় তাদৃশ বিশুদ্ধ না হইয়া বহু আবর্জ্জনা তাহার সঙ্গে মিশিয়া থাকে। এই পুটপক্ক লৌহ রসায়ন-বেত্তারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহার মধ্যে শতকরা অন্যূন দশ ভাগ অন্য পদার্থ মিশ্রিত রহিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র লৌহাদি দ্রব্যই যদি প্রাচীনেরা ঔষধার্থে ব্যবহার করিবার সংকল্প করিতেন তাহা হইলে এ তর্ক হইতে পারিত বটে। কিন্তু তাহাদের সে প্রকার কোন উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বুঝা যায় না। ঐ প্রকার পুটপক্ক পদার্থ মিশ্রই হউক আর অমিশ্রই হউক তাহাই ব্যবহার করিয়া ফল পাইয়াছিলেন, এইজন্যই ঐ প্রকার ব্যবহার করা হইয়াছিল। এস্থলে ব্যবহারই প্রমাণ, তর্ক অনাবশ্যক। আরও সেই সমস্ত মিশ্র পদার্থ না থাকিলে হয়ত কোনই ক্রিয়া করিত না। মানব যদি তাহার আহার্য্য বস্তু সমূহ হইতে মৌলিক উপাদানগুলি বাছিয়া লইয়া খাইতে পারিত তবে আর আজ দেশময় দুর্ভিক্ষের হাহাকার উঠিত না। স্থানে স্থানে অন্ন সত্র না খুলিয়া আজকালকার রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা অম্লজান প্রভৃতি মৌলিক উপাদানের কারখানা খুলিলেই দুর্ভিক্ষও নিবারিত হইত, আর পরিশ্রম করিয়া খাদ্য দ্রব্যও উৎপাদন

---

quantity it produces stomachic pains and sickness ending in correction. Red phosphorus is not poison. It is manufactured by heating ordinary phosphorus in closed vessels. Encyclo. 9th Vol. V. p. p. 515.

করিতে হইত না। বড় বড় চিনির কারখানা উঠিয়া যাইত। মানবগণ সর্ব্বত্র অযত্ন সুলভ কয়লা ১২ ভাগ ও জল ১১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া চিনির কাজ করিত ‡ (৫)। সুতরাং অমিশ্র পদার্থের সহিত অন্য পদার্থ মিশ্রিত হইয়াই তাহাকে শরীরের উপযুক্ত করিয়া থাকে। সুধু কল্পনাকে (Theory) আশ্রয় করতঃ স্বর্গের সিঁড়ি না বান্ধিয়া তাহার কার্য্যতঃ পরিণতি দেখিবার চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ মাত্রেরই ভিত্তি বর্ত্তমান রসায়নীবিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, নব্য রসায়নের দ্রব্য-বিশ্লেষণী শক্তি থাকিলেও দ্রব্যের গুণনির্ণয়ে সর্ব্বথা প্রভুত্ব নাই। যেস্থলে শুধু ব্যবহারিক (Practical) রসায়ন-বিজ্ঞান দ্বারা কোন দ্রব্যের গুণাদির উৎকর্ষাপকর্ষ সমালোচিত হইতে পারেনা, পরন্তু প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণকে (Theory) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, আরও যে স্থলে মীমাংসা করিতে হইলে পারমাণবিক ব্যবস্থা বিপর্য্যয়কে (Moleculer rearrangement) প্রধান অস্ত্ররূপে অবলম্বন করিতে হয়, সেস্থলে কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকে উপজীব্য করিয়া স্বর্ণসিন্দুর ও রসসিন্দুর বা বাজারের চীনে সিন্দুরে কোন ভেদ নাই, পুটপক্ক লৌহে ও হীরাকস হইতে প্রস্তুত লৌহে (Ferric Oxide) তারতম্য দেখা যায়না প্রভৃতি যুক্তি যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহারা কেবল মাত্র নব্য রসায়নী বিদ্যার সাহায্যে প্রাচীন চিকিৎসা সম্মত ভেষজ সমূহ পরিবর্ত্তন করিতে বাসনা করেন, তাঁহাদের যে বিশেষ ভ্রম হইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের স্থূল সিদ্ধান্ত এইযে, স্বর্ণসিন্দুর কেবল পারদের রক্ত ভস্ম (Red Oxide of Mercury) এবং সহস্র পুটপক্ক লৌহ অবিশুদ্ধ লৌহ ভস্ম (Impure Ferric Oxide) হইলেও, তাহাতে সাপের বিষের ন্যায় পৃথক্ শক্তি বর্ত্তমান থাকে। গুণের পার্থক্য দেখিয়া আমরা অনুমান করি, স্বর্ণসিন্দুর ও রসসিন্দুর বা চীনে সিন্দুরে, পুটপক্ক লৌহ ও হীরাকস হইতে প্রস্তুত লৌহভস্মে, এমোনিয়ম সায়নেট ও ইউরিয়া অথবা রেড্ ফসফরাস ও এমর ফসফরাসের ন্যায় দ্রব্যগত উপাদান এক হইলেও বহু পার্থক্য আছে, তাহা প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী স্বীকার করিতে বাধ্য।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরস্বতী ভিষগাচার্য্য।

---

(৫) Cane sugar = $C_{12}H_{22}O_{11}$.

আয়ুর্বিজ্ঞানে

বায়ু—পিত্ত—শ্লেষ্মা।

আর্য্য শাস্ত্রকারগণ মানব শরীরকে স্থূলদেহ ধরিয়া কখন ও কোন সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পান নাই। এই দেহের প্রতি তত্ত্বের মীমাংসা তাহারা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্থির করিতেন। তজ্জন্যই আয়ুর্ব্বেদীয় সূত্র সমুদায় নির্ভুল, শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয়। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে এই দেহ যেরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমাযুক্ত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, আর্য্য ঋষিগণের সূক্ষ্মদর্শনের নিকট কিন্তু তাহা কেবল কতকগুলি পরমাণু সমষ্টি বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। এই পরমাণু-পুঞ্জের ক্রিয়া ও গুণ প্রভৃতি বিচার করিয়া প্রকৃতি ও বিকার বিষয়ে মীমাংসাই আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। চরক সংহিতায় উক্ত আছে—"শরীরাবয়বাস্তু পরমাণুভেদেনাপরিসংখ্যেয়া ভবন্ত্যতিবহুত্বাদতিসৌক্ষ্ম্যাদতীন্দ্রিয়ত্বাচ্চ"—চরকোক্ত এই পরমাণু সমূহ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধরিবার উপায় নাই। তাহা কেবল মনশ্চক্ষুর গোচরীভূত। শারীরতত্ত্বে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই পরমাণু-তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন শারীর-তত্ত্বজ্ঞান যে অসম্পূর্ণ ও নিত্য পরিবর্ত্তনশীল হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কেবল শারীর-তত্ত্বজ্ঞানই বা বলি কেন! সমস্ত জাগতিক তত্ত্বে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা একমাত্র, এই পরমাণুজ্ঞান সাপেক্ষ।

য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জীবিতের দেহতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। ভবিষ্যতে আর ও কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারেন। কি স্তবে সূত্র (principle) ভিত্তি করিয়া তাঁহারা ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে এভাবে চলিলে যে কোন ও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন সে সম্ভাবনা নাই। কারণ য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ভিত্তি পদার্থের স্থূল দর্শন জ্ঞানের উপরে স্থাপিত। মনস্তত্ত্বে যতদিন না ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে ততদিন ইহা সম্পূর্ণতা (Perfection) লাভ করিবেনা। সূক্ষ্মতত্ত্বে সম্পূর্ণ জ্ঞান পরিস্ফুট না থাকিলে পদার্থের স্থূল বিচার যে সর্ব্বাঙ্গীণ হইতে পারে না, ইহা বোধ হয় আর অধিক করিয়া বলিতে হইবেনা। ব্রহ্মবিদ্যায় সিদ্ধা বিদুষী শ্রীমতী এনি

বেসন্ত তাঁহার Changing world (পরিবর্ত্তনশীলজগত) নামক পুস্তকে এই কথা নানা প্রকার যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, কলা ও শিল্পবিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্তই জড় বিজ্ঞানের এমন একটি প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছে যে তাহা বর্ত্তমান অবলম্বিত সূত্রে আর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেনা (Deadlock in Art, Religion and Science), এক্ষণ ইহার ভিত্তিসূত্র পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন। যাহা না হইলে এই পাশ্চ্যাত্য বিজ্ঞানের গতি অচলই থাকিয়া যাইবে। তিনি অনেক যুক্তিদ্বারা সেই নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। (New doors opening to Art, Religion and Science) সেই উন্নতির ভিত্তি—প্রাচ মনোবিজ্ঞান।

প্রাচীন কালে আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রবিদগণও, পাশ্চাত্যের ন্যায় স্থূল শারীর তত্ত্ব ও শারীর ক্রিয়া তত্ত্বের আলোচনায় বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে অনেক উন্নত স্থানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা অগ্রসর হইতে হইতে দেখিলেন, জীবিতের দেহতত্ত্ব আমূল আলোচনা এভাবে করিতে যাওয়া অসম্ভব। অনন্ত শিল্পির শিল্পকৌশল তন্ন তন্ন করিয়া রহস্যোদ্ভেদ করা মনুষ্যবুদ্ধির সাধ্যাতীত। গুরোপদেশ, শাস্ত্রসমালোচনা, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং অনুমানাদি দ্বারা যতই কেন চেষ্টা করা যা'ক না, শারীর ক্রিয়া তত্ত্বের স্থূল বিষয়গুলিই বুঝা যাইবে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গিণ জ্ঞানের তুলনায় এই জ্ঞান অতি অকিঞ্চিৎকর মাত্র। তাহারা উক্ত বিষয়ের বিশালত্ব উপলব্ধি করিয়া যে কালে বিহ্বল হইতেছিলেন তৎকালে ঐশীশক্তির স্ফুরণে এক মহা সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। মনস্তত্ত্বই তাহাদের অবলম্বনীয় হইল। তাহারা দেখিলেন স্থূল দর্শনের বিষয় ধরিয়া চলিলে জীবিতের দেহতত্ত্বে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না। যতদূর হওয়া সম্ভব, তাহাও শত সহস্রের মধ্যে ২।১ জনের ভাগ্যে ঘটে কিনা সন্দেহ। অথচ সেই অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য চলা অসম্ভব। কাযেই এমন একটি সিদ্ধান্তের প্রয়োজন যাহা অবলম্বন করিয়া চলিলে সমস্ত কার্য্যই অভ্রান্ত হইতে পারে। সেই সিদ্ধান্তই বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। আর্য্যদিগের শারীর বিজ্ঞান এই জন্যই স্থূলাবয়ব বোধক না বলিয়া সূক্ষ্মাবয়ব বোধক বলা যাইতে পারে।

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যাহা পরিদৃষ্ট হয় তাহাও আয়ুর্ব্বেদমতে স্থূল পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। আর্য্য শারীর বিজ্ঞান ভিত্তি ইহারও উপরে অবস্থিত এবং কেবল মাত্র মনোদৃষ্টির দ্বারা অনুভূত।

এই বায়ু, পিত্ত ও কফ কি? কিভাবে এই তিনের সত্ত্বা আর্য্যগণের চিন্তার বিষয়ীভূত হইল তাহাই অতঃপর আমরা আলোচনা করিব।

জগতের ব্যাপার সমূহ স্থিরভাবে চিন্তা করিলে আমরা ইহার কার্য্যাবলীর মধ্যে তিনটি শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই। এই তিনটি শক্তির পরস্পর সামঞ্জস্যে যাবতীয় জাগতিক ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। ইহাদের কোনও একটির হ্রাস বৃদ্ধিতেই নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যায়, এই ত্রিশক্তির কার্য্য—গতি, তাপ ও আপ্যায়ন। পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত ক্রিয়া পরম্পরা ও গঠনাদি সমস্তই এই তিনের বিষয়ীভূত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আজকাল কল্পনা করেন যে জগৎব্রহ্মাণ্ডব্যাপি এক আণবিক কম্পন (Molecular vibration) সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হয় এই কম্পনের ফলেই সমস্ত জাগতিক কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। দ্রব্যের যে গুণ দেখিয়া আমরা পদার্থের সত্তা উপলব্ধি করি তাহা তদভ্যন্তরস্থ কোনও না কোনও গতিক্রিয়া মাত্র। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিরা এই গতি ক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের নাম রাখিয়াছেন "জগৎ" (গচ্ছতীতি জগৎ, গম + ক্বিপ্) এই গতির কার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে জগৎ কিভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহা অভ্রান্তভাবে বুঝিতে পারা যায়।

গতিক্রিয়া হইতে উদ্ভূত আর একটি শক্তি আমরা এই জগতের কার্য্য উপলব্ধি করিতে পারি তাহা তৈজস শক্তি। ইহাকেই আমরা তাপ বলিয়া থাকি। যেখানে গতি সেইখানেই তাপ আছে। আণবিক কম্পনের ফলে এই তাপের উদ্ভব কল্পনা করা যাইতে পারে। আণবিক কম্পনে ঘর্ষন ক্রিয়া (friction) সম্পাদিত হওয়ায় এই তাপের উৎপত্তি হয়। জগতের সর্ব্বত্রই এই আণবিক কম্পন আছে, কাযেই তৎসঙ্গে তাপও রহিয়াছে। এই কম্পনের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেই তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই তাপই বিষ্ণুতেজ (Temperature) নামে অভিহিত।

এক্ষণ আমাদের লক্ষ্য করিবার আর একটি দিক আছে। এই আণবিক

কম্পনের ফলে যে তাপ উদ্ভূত হইতেছে তাহা যদি অন্য কোনও শক্তিদ্বারা প্রতিহত না হইত, তবে জগতের যাবতীয় পদার্থ পুড়িয়া ছাড়খার হইয়া যাইত। কিন্তু সেরূপ কোনও বিপর্য্যয় যখন লক্ষিত হয় না, তখন কাযেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে আর একটী শক্তির সত্তা অনুভব করিয়া থাকি। এই শক্তি উদ্ভূত তাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ ইহার নাম দিয়াছেন আপ্যায়নী শক্তি।

উপরোক্ত এই গতি, তাপ ও আপ্যায়ন দ্বারাই সমগ্র জগতের কার্য্য চালিত হইতেছে। মানব দেহও এই তিনটি দ্বারাই রক্ষিত। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞানবিদ্ ঋষিগণ দেহের এই ব্যাপারকে পরিস্ফুট করিবার জন্য এই গতি তাপ ও আপ্যায়নের তিনটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা।

বায়ু।

গত্যর্থক 'বা' ধাতু লইয়া বায়ু শব্দ গঠিত হইয়াছে। নিরুক্তিরপি লক্ষণম' অর্থাৎ শব্দের নিরুক্তি বা ব্যুৎপত্তি দ্বারা সেই শব্দ শক্তিতে যাহা বুঝায় তাহাই সেই শব্দের লক্ষণ। বায়ু শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করিয়া আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে যাহার শক্তিতে যাবতীয় শারীর গতিক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হয় তাহার নাম বায়ু। বায়ু স্বয়ং চলনশীল ও গতিক্রিয়ার নেতা। ইতিপূর্ব্বে যে আণবিক কম্পন (Molecular Vibration) কথিত হইয়াছে তাহা এই দেহেও অবশ্যই বর্ত্তমান আছে। এই দৈহিক আণবিক কম্পন এই বায়ুর কার্য্য। দেহের মধ্যে এই আণবিক কম্পনের হ্রাস বৃদ্ধি বা সমতা হইলেই বায়ুর হ্রাস বৃদ্ধি বা সমতা বলা যায়। এই আণবিক কম্পন বা বায়ুর ধর্ম্ম এবং ইহা কিসে প্রকোপ হয় কিসেইবা প্রশমিত হয়, সমতাই বা কোন উপায়ে থাকে ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিলে বিস্তীর্ণ শারীর ক্রিয়াতত্ত্ব ও রোগনির্ণয় তত্ত্বের প্রতিপাদ্য অনেক বিষয় সহজ বোধগম্য হয়। জীবশরীরে বায়ুই একমাত্র শক্তি। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই শক্তির যৎসামান্য আভাস পাইয়া তাহাকে Nerve force নামে অভিহিত করিয়াছেন। (১) তাঁহাদের নিকট ইহা একটি অজ্ঞেয় শক্তি

(১) The nerves may be regarded as conductors or a mode of energy which for want of better term is termed nerve force. The

বলিয়া পরিচিত মাত্র। তাঁহাদের ইহাও বিশ্বাস যে এই সকল ক্রিয়া তাড়িৎ কিম্বা কোনও তৈজস শক্তির অনুগত শক্তিদ্বারা সম্পাদিত হইলেও ইহা এমন কোন বিশেষ শক্তি যাহার নামকরণ তাঁহাদের ভাষায় আজিও সৃষ্ট হয় নাই। উপস্থিত প্রকাশ করিবার জন্য কেবল Nerve force এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার আর্য্যঋষিগণের নিকট কিন্তু এই শক্তি অজ্ঞেয় নহে। তাহারা ইহার তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছিলেন। যোগশাস্ত্র তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যোগীরা যোগ বলে এই বায়ুকে বিশেষভাবে আয়ত্তে রাখিতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদে এই গতি শক্তি বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে।

অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত ও ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্তভেদে বায়ু দ্বিবিধ। (২) যে বায়ু নিশ্বাস দ্বারা ফুসফুসে প্রবিষ্ট হইতেছে প্রশ্বাসরূপে বাহির হইতেছে, কোষ্ঠে সঞ্চিত হইয়া আধ্মান জন্মাইতেছে, অপান পথে নিঃসৃত হইতেছে, তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত বায়ু বলে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা অনুভূত হয় তাহাকেই ঐন্দ্রিয়ক ব্যক্ত বলে। ইহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়। আর যাহার বলে উরোবিভাজিকা (Diaphragm) এবং পঞ্জর মধ্যবর্ত্তী পেশী সমূহ কুঞ্চিত হইয়া প্রশ্বাস ত্যাগ হয় (৩) রস রক্ত প্রভৃতি গতি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদেহে চালিত হয়, দেহের কোনও স্থানে সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হইলে বেদনা অনুভব করাইয়া দেয়, স্নায়বিক স্পন্দন, পেশী সঞ্চালন, মলরেচন, উন্মেষ, নিমেষ প্রভৃতি দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহাকে অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত বায়ু বলে। ইহা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বিষয় নহে। এইজন্য এই বায়ুকে অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

---

genarel result of measurement made by these methods is that the nerve current travels slowly compared with the velocity of electricity or of Light *. *. *. Encyclo. Brit. M. Kendrick on physiology.

(২) ব্যক্তমৈন্দ্রিয়কঞ্চৈব গৃহ্যতে তদ্যদিন্দ্রিয়ৈঃ।
অতোঽন্যৎ পুনরব্যক্তং লিঙ্গগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ॥
চরক সংহিতা,শারীরস্থান ১ম অঃ।

(৩) আভিঃ শ্বসনপ্রশ্বসনশোণিতযন্ত্রধারণাদ্যা ক্রিয়া সম্পাদ্যন্তে (আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান)

রোগ-পরীক্ষা।

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।"
ততঃ কর্ম্মভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥

চরক সংহিতা।

"প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাহার ঔষধ কল্পনা" পূর্ব্বক চিকিৎসা করিতে হয়, ইহাই সমুদায় চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশ। বস্তুতঃ চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ রোগ পরীক্ষা। যথাযথরূপে রোগ নিশ্চিত না হইলে, তাহার ঔষধও নির্দ্ধারণ করা যায় না। যাহার যে নাম, সেই নাম ধরিয়া না ডাকিলে যেমন উত্তর পাওয়া যায় না, অথচ অনেক সময়ে সেই অযথা আহূত ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সেইরূপ অনিশ্চিত রোগে ঔষধ প্রয়োগেও ব্যাধি প্রতিকারের আশা করা যায় না। পরন্তু অধিকাংশ স্থলেই রোগবৃদ্ধি বা জীবননাশের কারণ হইয়া থাকে। অতএব প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

সংক্ষেপতঃ রোগ পরীক্ষার তিনটি উপায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রথমতঃ রোগীর নিকট সমুদায় অবস্থা অবগত হইয়া, শাস্ত্রোপদিষ্ট লক্ষণের সহিত মিলাইতে হইবে; তৎপর অনুমান দ্বারা রোগের আরম্ভক দোষ ও তাহার বলাবল নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। রোগীর নিকট অবস্থা অবগত হইবার সময়ে সমুদায় ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। রোগীর বর্ণ, আকৃতি, গঠন (ক্ষীণতা বা পুষ্টতা) ও কান্তি, এবং মল, মূত্র প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় দর্শনদ্বারা: রোগীর বাচনিক তাহার সমস্ত অবস্থা এবং অন্ত্রকূজন, সন্ধিস্থান বা অঙ্গুলিপর্ব্ব সমূহের স্ফুটন প্রভৃতি শরীরগত যে সকল লক্ষণ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহা শ্রবণদ্বারা; শারীরিক গন্ধ প্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে তাহা পরীক্ষার জন্য সর্ব্ব শরীরগত গন্ধ, এবং মল, মূত্র, শুক্র বা বান্ত পদার্থ প্রভৃতি গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা; আর সন্তান ও নাড়ীর গতি প্রভৃতি স্পর্শদ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। কেবল স্বকীয় রসনেন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। এজন্য মধুমেহাদিতে মূত্রাদির মিষ্টতা, রোগ বিশেষে সর্ব্বশরীরের বিরসতা ও রক্তপিত্তে রক্তের আস্বাদ জানিবার

আবশ্যক হইলে, তাহা অন্য অন্য প্রাণীদ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। শরীরে উকুনাদি কীটের উৎপত্তি হইলে সর্ব্বশরীরের বিরসতা এবং বহুল পরিমাণে মক্ষিকা উপবেশন দ্বারা সর্ব্বশরীরের মিষ্টতা অনুমান করিতে হয়। মূত্র মিষ্টাস্বাদবিশিষ্ট হইলে, তাহাতে পিপীলিকার সমাগম হয়। রক্তপিত্তে প্রাণরক্ত বমন হইয়াছে কিনা সন্দেহ হইলে, কাক কুক্কুরাদি জন্তুকে খাইতে দিয়া উহা পরীক্ষা করিতে হয়। তাহারা ঐ প্রদত্ত শোণিত পান করিলে তাহা প্রাণরক্ত এবং ইহার ব্যত্যয় হইলে রক্তপিত্তের রক্ত বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে। দেহ ও অগ্নির বলাবল জ্ঞান ও স্বভাবের প্রাকৃত ও বৈকৃতাবস্থা প্রভৃতি অনুমান এবং ক্ষুধা, পিপাসা, রুচি, অরুচি, সুখ, গ্লানি, নিদ্রা ও স্বপ্ন প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, রোগ নির্ণয় করিবার পক্ষে প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতি সামান্য পার্থক্যবিশিষ্ট দুই তিনটি রোগের মধ্যে রোগবিশেষকে নির্ণয় করিতে হইলে সামান্য ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা উপশয় ও অনুপশয় (বৃদ্ধি বা হ্রাসের লক্ষণ) দেখিয়া প্রকৃত রোগটি নির্ণয় করিয়া নেওয়ার বিধান শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। লক্ষণ বিশেষে রোগ সাধ্য, অসাধ্য কিম্বা যাপ্য থাকিবে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এমন কি তদ্দ্বারা রোগীর মৃত্যু পর্য্যন্তও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই রোগ নির্ণয়ের প্রধান ভিত্তি নাড়ী, মল, মূত্র, নেত্র ও জিহ্বা প্রভৃতির সূক্ষ্ম পরীক্ষা। ইহাদের অস্বাভাবিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রোগের সমুদায় গতি বুঝিয়া লইতে হয়। ক্রমশঃ একে একে ইহাদের আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রথমে নাড়ীপরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

রোগী দেখিতে হইলে প্রথমেই তাহার নাড়ীর প্রতি লক্ষ্য করা চিকিৎসকের যে একটি গুরুতর কর্ত্তব্য তাহা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক চিকিৎসককেই এই বিশেষ কার্য্যে মনোযোগ প্রদানে শৈথিল্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়। এ অমনোযোগ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মধ্যেই কিছু অধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। আমাদের দেশে আগে "হাত দেখা" তারপর অবস্থাদি শুনিয়া ব্যবস্থা করার রীতি বহু প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত আছে। এমন দুই একটি চিকিৎসকের নাম এখনও শুনা যায়, যাঁহারা কেবল মাত্র নাড়ী

দেখিয়াই রোগের আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইতেন। বস্তুতঃ আর্য্যশাস্ত্রে নাড়ী বিজ্ঞানালোচনা এক সময়ে উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল। এখনও সেই আর্য্য শাস্ত্র আছে, সেই মহাত্মগণের বংশধর আমরাও আছি। কিন্তু সে মেধা নাই, সে ধৃতি নাই, সে শ্রুতি নাই, সে ব্রহ্মচর্য্য নাই। কাযেই সর্ব্বোপরি সে শক্তিও নাই। আর্য্যঋষিগণের এই নাড়ীজ্ঞানশাস্ত্র ষট্‌চক্রাদি বিষয়ক জ্ঞান ও যোগাভ্যাসলব্ধ অন্তর্দৃষ্টি শক্তিসাপেক্ষ। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানেও নাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ-সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তাহাতেও রোগ নির্ণয়ের উপযোগী অনেক শিখিবার, জানিবার ও বুঝিবার আছে। আমাদের ন্যায় স্বল্পমেধা ও জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে পশ্চাত্য ও প্রাচ্য মত সমন্বয়ে রোগ পরীক্ষোপযোগী নাড়ীপরীক্ষা বিষয়ক আলোচনা দ্বারা একটি সমাধানের চেষ্টা করা বোধ হয় বর্ত্তমান দেশকাল পাত্রানুসারে অসঙ্গত হইবে না।

হস্তের মণিবন্ধে, অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলভাগে যে একটি গ্রন্থি আছে তাহার নিম্নদেশে অঙ্গুলিস্পর্শ করিলে ধমনীর (radial artery) স্পন্দন অনুভূত হয়। তন্ত্রকারগণ ইহাকে জীবসাক্ষিণী ধমনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই স্পন্দনের তারতম্যানুসারে দৈহিক অবস্থা অবগত হওয়া যায়। এই পর্য্যবেক্ষণই নাড়ী পরীক্ষা।

পুরুষের দক্ষিণ ও স্ত্রীলোকের বাম হস্তের নাড়ী দেখিতে হয়, নচেৎ রোগের সূক্ষ্মবিচার করা যায় না। আর্য্যঋষিগণ এই সূক্ষ্মতত্ত্বের আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বের বিষয় আলোচন করিতে গেলে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

কূর্ম্ম নাড়ীর উর্দ্ধাধোমুখে অবস্থান ব্যতিক্রমে স্ত্রী ও পুরুষের নাড়ীসমূহ বাম ও দক্ষিণদিক আশ্রয় করে। এই নিমিত্ত স্ত্রীলোকের বামহস্তে ও পুরুষের দক্ষিণ হস্তে নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। আগম শাস্ত্রে এই কথাই উক্ত আছে। (১)

---

(১) স্ত্রীণামুর্দ্ধমুখঃ কূর্ম্মঃ পুংসাং পুনরধোমুখঃ
অতঃ কূর্ম্মব্যতিক্রান্তাৎ সর্ব্বত্রৈব ব্যতিক্রমঃ।
লক্ষ্যতে দক্ষিণে পুংসাং যা চ নাড়ী বিচক্ষণৈঃ
কূর্ম্মভেদেন বামানাং বামে চৈবাবলোক্যতে॥

রক্তপ্রবাহিনী নাড়ীপ্রাচীরে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ী ত্রিতয়ের অতি সূক্ষ্মসূত্র ধারাবাহিকরূপে সমাশ্লিষ্ট আছে। তাহারা প্রবল হইয়া নাড়ীপ্রাচীরে স্ব স্ব জাতীয় গুণধর্ম্ম প্রকাশ করাতে নাড়ীপ্রাচীর তত্তদ্ধর্ম্ম প্রকাশ করে। এই হেতু রক্তপ্রবাহিনী নাড়ীই একমাত্র পরীক্ষণীয়া। ইড়াপিঙ্গলা, সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ী সত্ত্বরজস্তমোগুণ বহন করে। বায়ু পিত্ত কফ এই গুণত্রয়ের অবান্তর মাত্র। অতএব রক্তপ্রবাহিনী কূর্ম্মনাড়ীতে দোষত্রয়ের ভাব পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রে আছে—

কূর্ম্মনাড্যাং সমাশ্লিষ্টা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতন্তবঃ
তে জ্ঞাপয়ন্তি বৈ দোষান্ সত্ত্বরজস্তমোগুণৈঃ
অতঃ পরীক্ষ্যতে কূর্ম্মং গত্যা তু লোহিতস্য চ।

উক্ত প্রমাণাদি হইতে বুঝা যায় যে, পুরুষের দক্ষিণ হস্তে যে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়, স্ত্রীলোকের বামহস্তেই সেই স্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত পাদদ্বয়ে ও পদগ্রন্থির নিম্নভাগে এবং কণ্ঠদেশ প্রভৃতি স্থানের নাড়ীর স্পন্দন, রোগবিশেষে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেমন আগন্তুক জ্বর, তৃষ্ণা, আয়াস, মৈথুনক্রম, ভয়, শোক এবং কোপ কণ্ঠনাড়ী (Common carotid artery) দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। মরণ, জীবন, কামোদ্বেগ বা কামজরোগ, কণ্ঠরোগ, শিরোদেশের ব্যাধি বা শিরঃশূল, কর্ণগত রোগ এবং মুখরোগ নাসানাড়ী (Ncsal artery) দ্বারা নির্ণীত হয়। এইরূপ বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্নস্থানের নাড়ী পরীক্ষণীয়।

রোগীর হস্তের পরীক্ষণীয় নাড়ীর উপর পরীক্ষকের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তদ্বারা ঈষৎ সংকোচিত ঐ হস্তের কনুইয়ের মধ্যে যেখানে নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয় সেইস্থানের নাড়ীটি অল্প পীড়িত করিয়া পূর্ব্বোক্ত অঙ্গুলিত্রয়ে নাড়ীর গতি অনুভব করিতে হয়। এই গতি হইতেই দেহের যাবতীয় অবস্থা অবগত হওয়া যায়। এই গতিতেই বায়ুপিত্তকফের অবস্থা বুঝা যায়। সাধারণতঃ নাড়ী পরীক্ষার প্রকৃত সময় প্রাতঃকাল। এই সময়ে দেহ, শারীরিক ও মানসিক অশান্তিতে প্রায়ই ক্লিষ্ট থাকে না। অন্যান্য সময়েও নাড়ী পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু তত্তৎকালে সময়ানুসারে

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকৃতি বিচার করিয়া দোষগুণাদি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়।

সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাকে দিন এবং অস্ত হইতে উদয় পর্য্যন্ত কালকে রাত্রি বলে। দিনমানকে তিন ভাগ করিলে প্রতিভাগে প্রায় দশ দণ্ড কাল সময় পড়ে। দিবার প্রথম ভাগের দশদণ্ড কাল কফের সময়। এ সময় রোগবিবর্জ্জিত ব্যক্তির নাড়ী সাধারণতঃ স্নিগ্ধময়ী থাকে। দিনের মধ্যভাগ বা দ্বিতীয় দশদণ্ডকাল পিত্তের সময়। সুস্থব্যক্তির নাড়ী সাধারণতঃ এইকালে উষ্ণতা প্রভৃতি গুণান্বিত হয়। শেষ দশদণ্ডকাল বায়ুর সময়। এই সময় সাধারণতঃ বায়ুর গতি-শক্তি নিবন্ধন নাড়ী ধাবমানা হয়। রাত্রিরও ঐরূপ তিনভাগে কফ, পিত্ত ও বায়ুর গতি হইয়া থাকে। এই কফ, পিত্ত ও বায়ুর প্রতি দশদণ্ড কালকে আবার তিনভাগ করিলে প্রতিভাগে ৩ দণ্ড ২০ পল হয়। প্রতি ১০ দণ্ডের এক এক ভাগে আবার যথাক্রমে কফ, পিত্ত ও বায়ুর গতি সূচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ দিনের প্রথম ৩ দণ্ড ২০ পল সময়ে শুদ্ধ কফেরই গতি, দ্বিতীয় ৩ দণ্ড ২০ পল কফ ও পিত্তের গতি এবং তৃতীয় ৩ দণ্ড ২০ পল সময় কফ ও বায়ুর গতি পাওয়া যায়। এইরূপ দ্বিতীয় ১০ দণ্ডের ৩ ভাগের প্রথম ভাগ পিত্ত ও কফের, দ্বিতীয় ভাগে শুদ্ধ পিত্তের ও তৃতীয়ভাগে পিত্ত ও বায়ুর গতি সূচিত হয়। দিনের শেষ দশদণ্ডকাল ঐরূপ যথাক্রমে বায়ু ও কফ, বায়ু ও পিত্ত এবং শুদ্ধ বায়ুর গতি হইয়া থাকে। রাত্রি কালকে দিনের মত ঐরূপ ভাগ করিয়া লইয়া সুস্থদেহীর বায়ু, পিত্ত কফের গতি নির্দ্দেশ করিয়া লইতে হয়। এই প্রকৃতাবস্থার প্রতি তীব্র লক্ষ্য না থাকিলে অনেকস্থলেই পরীক্ষককে মোহগ্রস্ত হইতে হয়।

তৈল মর্দ্দনের পর, নিদ্রিতাবস্থায়, ভোজনের অব্যবহিত পরে, ক্ষুত্‌তৃষ্ণাদ্বারা অভিভূত এবং অগ্নি বা রৌদ্রসন্তাপে তপ্ত হইলে, ব্যায়ামাদি শ্রমজনক কার্য্যের পর, অশ্বাদি আরোহণের পর, দ্রুত চলিবার পর ও স্ত্রীসহবাসান্তে নাড়ী পরীক্ষা করা উচিত নহে। যদি মূর্চ্ছাদি রোগে বা ঐরূপ কোনও দুর্ঘটনা বশতঃ সেই সমস্ত সময়ে নাড়ী পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠে, তবে তদবস্থায়, তাৎকালিক নাড়ীপ্রকৃতি বিচার করিয়া রোগ নির্ণয়

করাই কর্ত্তব্য। তৈলাভ্যঙ্গে নাড়ী চঞ্চলা হয়, প্রসুপ্তিতে নাড়ী কফভাব অবলম্বন করে, ভোজন মধ্যে ও ভোজনের অব্যবহিত পরে নাড়ী অতিশয় ধাবমানা হয়, সদ্যঃস্নাত ব্যক্তির নাড়ী স্তিমিতগতি হয়, ক্ষুধার উদ্রেক হইলে চঞ্চলা হয়, আত্যন্তিক ক্ষুধাতুর হইলে নাড়া উষ্ণা ও মৃদুগতি সম্পন্না হয়, আতপসেবী ব্যক্তির নাড়ী উষ্ণা ও বেগবতী হইয়া থাকে; কৃতভোজন, কৃতবমন, নিদ্রাগত, বমনেচ্ছু, কফপীড়িত ও অতিশয় সুখাসক্ত ব্যক্তির নাড়ী স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া শিথিল গমন করে। এই সমস্ত অবস্থায় নাড়ীর গতিবিপর্য্যয় জানা না থাকিলে চিকিৎসককে নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগনির্ণয় করিতে গিয়া বিপথগামী হইতে হয়।

মনুষ্য দেহের প্রাকৃতিক তারতম্যানুসারে নাড়ীর সুস্থাবস্থায় তারতম্য থাকিলেও একটি সাধারণ ভাব সমস্ত ব্যক্তির নাড়ীতেই সমান পরিলক্ষিত হয়। এই সমতা ও সুস্থভাব উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া না রাখিতে পারিলে অসুস্থতার সময়ে নাড়ীর বিপর্য্যয় নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া থাকে। সুস্থাবস্থায় নাড়ীর স্পন্দন প্রতিমিনিটে বয়সভেদে তারতম্য হইয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের এতদ্দেশে সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী প্রতিমিনিটে ১৪০ বার স্পন্দিত হয়। একবৎসর পর্য্যন্ত ১২০ হইতে ১৩০, ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ১১০ হইতে ১২০, ৬ বৎসর পর্য্যন্ত ৯০ হইতে ১১০, ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ৮০ হইতে ৯০, যুবকের ৭৫ হইতে ৮০, প্রৌঢ়ের ৭০ হইতে ৭৫, বৃদ্ধের ৬৫ হইতে ৭০ এবং অতিবৃদ্ধের ৬০ হইতে ৬৫ পর্য্যন্ত নাড়ীর স্পন্দন হইয়া থাকে। ইহার ন্যূনাধিক্যে রোগ সূচিত হয়। বিশেষ বিশেষ লোকের এবং বিশেষ বিশেষ বংশের মধ্যে এই নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যার বিপর্য্যয় দেখা যায়। তত্তৎস্থলে সেই অস্বাভাবিকতা দেখিয়া রোগ বলিয়া অনুমান করিয়া লইলে চিকিৎসককে ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র দাশগুপ্ত ধন্বন্তরী—এইচ, এম, পি।

মুষ্টিযোগতত্ত্ব।

অনেকে হয়ত বলিবেন যাহা জ্ঞান বিজ্ঞানের ধার ধারেনা, যাহা অশিক্ষিত বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত এমন সমস্ত টোট্‌কা টাট্‌কা ঔষধ লিখিয়া আবার আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করা কেন? এ উপলক্ষে কোনও পাশ্চাত্য ভাবমুগ্ধ ব্যক্তি হয়ত প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদের অবৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে এক লম্বা 'লেকচার' দিয়া এই আয়ুর্ব্বেদকে একটা হেতুরে শাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বসিবেন। কেহ বা ইহা লইয়া কবিরাজ-গণের উপরে দুই একটা 'মনের ঝাল মিটান' বাক্যবর্ষণ করিতেও ত্রুটি করিবেন না। এ সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের একটা বিশেষ কৈফিয়ৎ আছে। মুষ্টিযোগ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার দিকটা আমরা আজ এ উপলক্ষে পাঠকবর্গের নিকট তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, জগৎস্রষ্টার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের এক অতি সুন্দর নিয়ম সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইবে। সেই শাশ্বত ধারাবাহিক ব্যবস্থা—"অভাব পূরণ"। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কেবল "অভাব—পূরণ"। এ জগতে যখন যে জিনিষটির অভাব হয়, যখন যে বিষয়টির প্রয়োজন হয়, কোথা হইতে কি ভাবে জানিনা, তাহা অচিরাৎ পূর্ণ হইয়া যায়। এ নিয়ম কি, কোথা হইতে, কি ভাবে, কাহা দ্বারা পরিচালিত—যদিও বুঝিতে ও বুঝাইতে পারা যায় না, তথাপি ইহা উপলব্ধির সীমা বহির্ভূত নহে। এই অপ্রতিহত নিয়ম বশেই জগদ্বাসিগণ এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, উন্মত্ত ছুটাছুটী ও অজ্ঞেয় শক্তি লইয়া কর্ম্ম প্রণোদিত হইয়া থাকে। তাই আজ প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন কলাবিদ্যা, প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতির প্রতি সমগ্র দেশের মনীষিগণের একটা তীব্র দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ সংরক্ষণ-কল্পে চতুর্দ্দিকেই একটা আকুল ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সে হিসাবে একমাত্র ভারতের গৌরবস্থল প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি কোথায়? দৃষ্টি যদিও বা একটু পড়িয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ কল্পে চেষ্টা কি হইতেছে?

মুষ্টিযোগ যদিও এক্ষণে আমাদের মধ্যে অনেকেরই নিকট তুচ্ছ সামগ্রী

হইয়া পড়িয়াছে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতি কিন্তু দেশের লোকের তাচ্ছল্য মোটেই ছিল না। তখন এই টোট্‌কা টাট্‌কা' ঔষধ শিক্ষা ও তাহা সংগ্রহ করা সকলেরই একটা প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইত। ঘরে প্রবীণা স্ত্রীলোকেরা যে সময় ঠাকুরমার স্থান অধিকার করিতেন, সে সময় তাঁহারা নিজ নিজ পারিবারিক চিকিৎসারও অধিকারী হইতেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহাদের "ঠাকুর-মার-ঝুলিও নানা দ্রব্যে পূর্ণ হইত। তন্মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় ঔষধাদি যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত থাকিত। সেকালে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণের শিক্ষা দীক্ষার পরিণতি এই ভাবেই পর্য্যবসিত হইত। অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে,এই কালের গৃহিণীগণ সে শিক্ষা ভুলিয়া,সে দীক্ষায় অবহেলা করিয়া 'লেছ', 'কার্পেট', 'নবেল' বা ঐরূপ পাশ্চাত্য অনুকরণের কার্য্যবিশেষে আপনাদিগকে নিয়োজিত রাখিয়া প্রকৃত গৃহস্থালী ভুলিয়া যাইতেছেন। এখন ছেলের একটু সর্দ্দি বা তৎসঙ্গে একটু গা গরম হইল। আর অমনি গৃহিণীগণ ভাবিয়া আকুল হইলেন, কি করিয়া কি করিবেন, কি করিলে অসুখ সারিবে—একেবারে দিশেহারা। তখনই হয়তো একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নয়তো অগত্যা পক্ষে নেটিভ ডাক্তার সেই মুহূর্ত্তেই চাই! সঙ্গে আবার একজন 'নার্স' হইলে আরও ভাল হয়। আর এদিকে সে সঙ্গে বাড়ীতেও একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে সে কালের গৃহিণী ছেলেদের এমন ভাবের অসুখ বিসুখগুলি পাঁচ কাজের মধ্যে থাকিয়া সামান্য টোট্‌কা টাট্‌কাতেই আরোগ্য করিতেন। ডাক্তার কবিরাজতো দূরের কথা, বাড়ীর কর্ত্তাকেও বোধ হয় অনেক সময় এ সংবাদ জানান প্রয়োজন হইত না। সামান্য অসুখ বিসুখ গুলিতো বাদই দেওয়া যায়, অনেক কঠিন কঠিন ব্যারামও অনেক সময় এই ঠাকুরমারঝুলির ঔষধে তখনকার কালে আরোগ্য হইত। আমাদের বন্ধুবর স্বর্গীয় রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই জন্য বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন "সাবেক কেলে বুড়ো বুড়ীরা জানত এমন টোট্‌কা টাট্‌কা। ষোল টেকে ভিজিট্‌ খেকো সিভিল সার্জ্জন লাগে কোথা।" বস্তুতঃ আমাদের দেশের এই পরিবর্ত্তনের ফলে প্রতি গৃহস্থের ব্যয়ের মাত্রা যে কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা একটু চিন্তা করিলেই পাঠকবর্গ সহজে বুঝিতে পারিবেন। মিতব্যায়িতার হিসাব ছাড়া মুষ্টিযোগের প্রতি আমাদের দৃষ্টি করি-বার আর একটি দিক্‌ আছে। তাহা আমাদের পূর্ব্ব কথিত প্রাচীন কীর্ত্তি

সংরক্ষণের দিক্। মুষ্টিযোগ ঔষধগুলি যদিও আপাততঃ দেখিতে অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে প্রচলিত আরোগ্য বিধানের উপায় বলিয়া বোধ হইবে, তথাপি যদি আমরা এই সমস্ত ঔষধের আশ্চর্য্য ফল অনুধাবন করি, তাহা হইলে, আর ইহার প্রতি অবহেলার ভাব আসিতে পারে না। স্বতই মনে হয়, প্রত্যেকটি ঔষধের মধ্যে এক অতি গভীর বৈজ্ঞানিক সত্য অন্তর্নিহিত আছে, তাহা প্রকটিত হইলে মুষ্টিযোগগুলি আর হেতুড়ে ঔষধ বলিয়া পরিগণিত থাকিবে না। এমন একদিন আসিবে যখন আমরা মুষ্টিযোগ সমূহকে অতিশয় উন্নত বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইব।

এই জন্যই সমগ্র বঙ্গদেশে এমন কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলায় প্রতি গ্রামে গ্রামে প্রচলিত অব্যর্থ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ গুলি ধারাবাহিকরূপে এই পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া রক্ষা করিবার সংকল্প আমাদের মনে আছে। গত বৎসর কিছু কিছ মুষ্টিযোগ এইভাবে আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবাসিগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন, তাঁহারা, যিনি যেখানে এইরূপ মুষ্টিযোগ ঔষধ সমূহ সংগ্রহ করিতে পারেন, আমাদিগকে প্রেরণ করিয়া এই মহৎকার্য্যে সহায়তা করুন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নাম ধাম সহ তাঁহাদের প্রেরিত মুষ্টিযোগগুলি ক্রমিক প্রকাশিত করিয়া আয়ুর্ব্বেদ জগৎকে উপহার দিব।

বেগ-ধারণ।

পুরাকালে শূলপাণি মহাদেব, ভগীরথের আহ্বানে স্বর্গহইতে মহাবেগে অবতীর্ণা সুরধুনীর প্রবল বেগ ধারণ করিয়া বসুমতীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই বেগে বাঁধা দিতে গিয়া মদমত্ত ঐরাবতকে খরস্রোতে অনেক নাকানি চুবোনি খাইতে হইয়াছিল। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় অবলা ললনার বেগ্ সাম্‌লাইতে না পারিয়া কত কত বীরপুরুষকে অকালে পৈত্রিক প্রাণটি বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। রুসো-জাপানি যুদ্ধে জাপানের বেগে শেষে রুষগণকে আত্মসমর্পন করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে হইয়াছিল। সে দিন ঢাকা ময়মন্‌সিংহ রেলওয়ের কাওরাইদ্ ষ্টেসণের নিকটে ঝড়ের বেগে গোটা

ট্রেণখানাকে একেবারে ডিগ্‌বাজি খাইয়া পালোয়ানি রকমের হার মানিতে হইয়াছিল। আমার কিন্তু এ সমস্ত ঝড়্ টড়ের বেগের কথা নয়। দেহের মধ্যে প্রকৃতির বেগের বিষয়টিই আমার এস্থলে আলোচ্য। বাবা, এ বড় শক্ত বেগ। কারণটি ঘটিয়াছে কি তার কার্য্যটি অনিবার্য্য; এ খোঁদার কারসাজি। অতোবড় মহাশক্তিশালি মুনি যে আত্রের তিনিও "ন বেগান্ ধারয়ণীয়ম" ব'লে আরম্ভ ক'রে বেগের কথা বল্‌তে বল্‌তে একটা অধ্যায় শেষ ক'রে ফেলেছেন। তিনি এক জায়গায়, রোগশোকতাপদগ্ধ ভারতবাসিগণের অবস্থা ভাবিয়া বড় জোর ক'রেই বলেছেন—যিনি বুদ্ধিমান্ হবেন তিনি কখনও ক্ষুধা, পিপাসা, বাহ্যে, প্রস্রাব, বাতকর্ম্ম, বমি, হাঁচী, উদ্গার, হাই, চোখের জল, ঘুম আর পরিশ্রমের দরুণ শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগ চেঁপে রাখ্‌বেন না। (১)

যদি কেহ ইহার বিপরীত আচরণ করেন, তিনি যত বড় মহারথীই কেন হউন্ না, তাহাকে ঐরাবতের মত সে বেগের ধাক্কা সাম্‌লাতে গিয়ে অনেক ওলট্‌পালট্ খেতেই হবে।

আমাদের দেশে আজ্‌কাল্ আফিষের চাকরির খাতিরে অনেক হোম্‌রা চোম্‌রা বাবুদিগকে পেণ্ট্‌লেন চাপকান্ এটে সাহেবের কাছে বসে কাজ কর্‌তে হয়। লজ্জার খাতিরে, কাজের ঝঞ্ঝাটে আর অনেক সময় সাহেব কি বলেন সেই ভয়ে বাহ্যে, প্রস্রাব, বাতকর্ম্ম ও হাঁচী প্রভৃতির বেগ নেহায়েৎ চেঁপে চুপে রাখ্‌তে হয়। বড় বড় সমাজের বৈঠকেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে। অনেক ছেলেপিলে আছে যাহারা দৌড়ে সাম্‌লান কঠিন হয় এমনতর বাহ্যের বেগ না হলে আর পাইখানামুখো হতে চায় না। এই জাতীয় ছেলেগুলিকে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় হাত পা কাঁটি কাঁটি, শরীর টিঙ্‌ টিঙে, খায় দায় গায়ে লাগে না। এই সমস্ত অনিয়মী ছেলেগুলি প্রায়ই

(১) ন বেগান্ ধারয়েদ্ধীমান জাতান মূত্র পূরীষয়োঃ। ন রেতসো ন বাতস্য ন বম্যা ক্ষবথোর্ণচ। নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ। ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিশ্বাসস্য শ্রমেন চ।

(চরক সংহিতা সূত্রস্থান ৭ অঃ)

ক্রিমি রোগে ভুগিয়া থাকে। কারণটি না ঠাওরাতে পেরে ছেলের অভিভাবকেরা বোন্‌বোন্ আর সেণ্টনিনের শ্রাদ্ধ করে থাকেন। ফলে ক্রিমি একটু দমন থাকে বটে, কিন্তু রোগ আর সারে না। তার পর যদি ছেলের খাওয়াদাওয়া চলাফেরা প্রভৃতির নিয়মগুলির সঙ্গে সঙ্গে ছেলের পাইখানায় যাওয়ার নিয়মটা ঠিক করে দেওয়া যায়, অমনি ছেলে ধীরে ধীরে সেরে উঠে। শরীরও বেশ ফিরে যায়।

বড় বড় সহরে পাঁচ-আইনের কল্যাণে বাহ্যেপ্রস্রাবের বেগ ধারণ করাটা প্রায় নিত্তনৈমিত্তিক হয়ে পড়েছে। যদি কেহ নিতান্ত দায়ে ঠেকলেন্ আর সাম্‌লাতে পারলেন না, অমনি কোথা হ'তে যমদূতের মত এসে পাঁচ আইনের অনুচরেরাও হাজির হ'লেন। তার পর তাঁদের কাজ তাঁরা করেন। এইতো অবস্থা।

এখন দেখা যাক্, কোন্ কোন্ বেগ ধারণ করলে কি কি অসুখ হ'তে পারে। আর্য্য ঋষিগণ বলেনঃ—

প্রস্রাবের বেগ থামিয়ে রাখ্‌লে মূত্রাশয়ে (তলপেটে যে স্থানে প্রস্রাব জমে; ইংরাজিতে ইহাকে Bladder বলে) আর লিঙ্গে শূলুনির মতন বেদনা হয়। অনেকক্ষণ মূত্র জমিয়া থাকিলে প্রস্রাবের বেগ দেওয়ার যে একটা ক্ষমতা থাকে তাহা অবসাদগ্রস্ত হয়, তজ্জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র (অল্পে অল্পে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব পড়া) রোগ জন্মে। মূত্রাশয়ে ও তলপেটে ব্যথার দরুণ শরীর বেঁকে যায় আর কুঁচকিতে টেনে ধরার মত যন্ত্রণা হয়ে থাকে।

বাহ্যের বেগ চেঁপে রাখ্‌লে পকাশয়ে (পেটের নাড়ীর মধ্যে, ইংরাজিতে ইহাকে intestine বলে) ও মাথায় বেদনা হয়, দাস্ত পরিষ্কার এবং অধোবায়ু নিঃসারিত হয় না। পেটটা ময়লা আর বায়ুতে পূর্ণ হয়ে থেকে, একটা বিষম অশ্বস্তি জন্মিয়ে দেয় এবং পায়ের ডিমে বেদনা প্রভৃতি উৎকট উপসর্গ সকল উপস্থিত হয়ে থাকে।

অনেক সময় এমন রোগী দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ভয়ানক মাথা ধরায় রোগী অস্থির। কারণ কিছুই বল্‌তে পারে না। শেষ্‌টা হয়তো খুজতে খুজতে বোঝা গেল, কোনও একটা বাধা পড়ে সময় মত বাহ্যে যাওয়া হয় নাই, তজ্জন্য ২।৩ দিন মোটেই দাস্ত পরিষ্কার

না হইয়া এই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। একটু ডুস্ দিয়ে বাহ্যে করিয়ে দেওয়া হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে মাথা ব্যথাও সেরে গেল।

শুক্রবেগ ধারণ কর্‌লে লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে শূলের ন্যায় বেদনা, গায়ে চিন্‌চিনে ব্যথা, প্রস্রাব বন্ধ আর বুকেও বেদনা হয়ে থাকে।

অধোবায়ু (বাত্‌কর্ম্ম) রোধ করিলে পেটের মধ্যে বায়ু (Gas) জন্মে, তাহা সহজে বাহির হয় না, প্রস্রাব আর বাহ্যেও বন্ধ হয়ে যায়, শরীরটা নিতান্তই অবসন্ন মনে হয়, পেটে শূলুনি, মোচ্‌রান ও ভেঙ্গেচুড়ে যাওয়ার মতন্ নানাপ্রকারের বেদনা অনুভব হতে থাকে। লজ্জা আর সভ্যতার খাতিরে কিন্তু অনেকেই বাত্‌কর্ম্মের বেগ ধারণ করে এই সব রোগ ডেকে আনেন্।

বমির বেগ থামিয়ে দিলে, চুলকানি, গায়ে চাঁকা চাঁকা মত ফুলে উঠা (যা'কে আমাদের দেশে সাধারণ কথায় নেংরা বাত বা আমবাত বলে, ডাক্তারি মতে ইহাকে Urticaria বলে) অরুচি, মেচেতা (মুখব্রণ), শোথ, পাণ্ডুরোগ, জ্বর, কুষ্ঠ, বমনভাব, এমন কি বিসর্প (Erysipelas) পর্য্যন্ত হ'য়ে থাকে।

হাঁচীর বেগ থামিয়ে দিলে স্কন্ধদেশের স্তম্ভন (ঘার ধরা), মাথা বেদনা, মুখ বেঁকে যাওয়া, আধ্‌কপালে ও ইন্দ্রিয় শৈথিল্য উপস্থিত হয়।

উদ্গারের বেগ রোধ কর্‌লে হিক্কা, কাস, অরুচি, বুক চেপে ধরা প্রভৃতি উপসর্গ এসে কষ্ট দেয়।

হাই উঠা বন্ধ করে দিলে দেহ নুইয়ে পড়া, মুহুর্ম্মুহু হস্তপদাদির বিক্ষেপ, হাত পায়ে ও শরীরের গিড়েগুলি টেনে ধরা, স্পর্শশক্তির হ্রাস, শীতজনিত কম্প, আর বিনা শীতেও হাত পা কাঁপা প্রভৃতি লক্ষণ হ'য়ে থাকে।

ক্ষুধার বেগ দমন কর্‌লে দেহের কৃশতা, দৌর্ব্বল্য ও শরীরের রং ময়লা হয়, আর গায়ে একরকম বেদনা, অরুচি, গা ঘোরা প্রভৃতি উপসর্গ হয়।

পিপাসার সময় জল না খেলে গলা ও মুখ শুঁকিয়ে যাওয়া, কানে কম শুনা, যেন কতই খাটুনি হইয়াছে এরূপ বোধ হওয়া, হাপানি রোগের মত শ্বাসকষ্ট, আর বুকে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

শোকাদি জনিত অশ্রুবেগ থামাইয়া দিলে, নাক মুখ দিয়া সর্দ্দি হইলে,

যেমন জল পড়ে তেমনি জল পড়্‌তে থাকে, চক্ষু লাল হয়, হৃদ্‌রোগ, অরুচি ও গা ঘোরা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ঘুমের বেগ ধারণ কর্‌লে হাই উঠা, গায়ে মন্দা মন্দা বেদনা, তন্দ্রা, মাথার ব্যারাম, চক্ষুভার প্রভৃতি লক্ষণ হয়ে থাকে।

পরিশ্রম করার পর নিশ্বাস বেগ ধারণ কর্‌লে গুল্ম, হৃদ্‌রোগ ও মাতালের ন্যায় মোহাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

নানা কাজের তালে পড়িয়া আমরা এই সনাতন উপদেশগুলি ভুলিয়া যাই আর এই সমস্ত বেগ ধারণ করিয়া অহরহ নানা রোগে আক্রান্ত হই। রোগ হইলে তা'র কারণ খুজিয়া পাই না। শেষে ডাক্তার কবিরাজ ডাকিয়া ঔষধের শ্রাদ্ধ মায় সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত গড়াইয়া দিতে একটুকুও পশ্চাৎপদ হই না। এই সমস্ত বেগ ধারণ করিলে কখন্ কি হয় ইহা যদি সকলে জানিয়া রাখেন তবে সামান্য একটু ক্রিয়াক্রমেই বেগ ধারণ জন্য উপস্থিত রোগ গুলিও সারিয়া যায়। আর অনর্থক খরচান্তও হয় না। সময়ান্তরে এই সমস্ত বেগ ধারণ জন্য উৎপন্ন রোগের চিকিৎসার বিষয় আলোচনা করিব। শ্রীঃ—

চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ।

রোগী বালক, বয়স ২॥ বৎসর, নিবাস ঢাকার অন্তঃপাতি বেড়ানামক গ্রামে। জাতি বৈদ্য, পিতামাতা উভয়ই বর্ত্তমান।

পূর্ব্ব ইতিহাস—১৩১৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে রোগের সূত্রপাত হয়। বালকটির মাতার অন্তঃসত্তা অবস্থার পর হইতে রোগের সূচনা হয় এজন্য এড়েলাগা মনে করিয়া প্রথম প্রথম চিকিৎসায় উপেক্ষা করা হইয়াছিল। রোগ একটু বাড়াবাড়ি হওয়ার পর রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ হয়। ছয়মাস কাল নানাপ্রকার চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু কোনও উপশমই হয় না। গত কার্ত্তিক মাসে আমি রোগীর চিকিৎসার্থে আহুত হইয়া নিম্নলিখিত অবস্থায় বালকটিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

"পেটটি অত্যন্ত বড়। সর্ব্বদাই একটি জলের ভস্ত্রার মত থাকে। দাস্ত দিনে রাত্রে ৩।৪ বার হইতে ১০।১২ বার পর্য্যন্ত হয়। কিরূপ দাস্ত কতবার হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা থাকেনা। মলের স্বভাব প্রায়ই

এলোভস্কা, ঈষৎ আম মিশ্রিত। কোনও সময় ছানাকাটা, কখনও বা পাতলা জলের ন্যায় মল হয়; সঙ্গে ২।৪টা গুট্‌লিও থাকে। মল প্রতিবারেই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হয়। পিপাসা বর্ত্তমান। তদ্ভিন্ন সর্ব্বদাই ছেলেটির মুখে কেবল 'খাই খাই' রব লাগিয়াই থাকে, সাধারণ কথায় ইহাকে রাক্ষসে ক্ষুধা বলে। হাত পা গুলি সরু সরু, গলাটিও সরু। মুখ, পায়ের পাতা ও পেটুটিতে জলভার, শরীর রক্তহীন। সর্ব্বদাই একটু একটু জ্বর বর্ত্তমান, মূত্র ঈষৎ হরিদ্রাভ, চক্ষু কোটরগত, সামান্য একআধটুকু কাসও মাঝে মাঝে হয়।

আমি তাহাকে এই অবস্থায় প্রাতে মহারাজ-নৃপতিবল্লভ লবঙ্গ ও মুথার ক্বাথ এবং মধু, দুইপ্রহরে অগ্নিমুখ-লবণ গরম জল, বিকালে সিদ্ধ প্রাণেশ্বর চেলেনি জল, ও রাত্রে বজ্রক্ষার চূর্ণের জলের সহিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিলাম।

৮ দিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল ইহাতে কোনই উপশম হয় নাই। পুনরায় রোগী দেখিতে গেলাম।

এবার রোগীকে আবার বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলাম। গত ছয়মাসে যে সমস্ত ডাক্তার ও কবিরাজগণ চিকিৎসা করিয়াছেন তাঁহাদের ব্যবস্থাগুলিও সমস্তই আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে গ্রহণী, অজীর্ণ, অম্লপিত্ত অধিকারের অনেক ঔষধই রোগীকে খাওয়ান হইয়াছে। ঐ সমস্ত ঔষধের উপরে নূতন করিয়া ব্যবস্থা করিবার মত আর কিছুই পাইলাম না। অনেক চিন্তার পর একটি নূতন খেয়াল্ আমার মনে আসিল। আমি রোগীর বুকের কড়ার নিকট হইতে তলপেটের শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত পেট ও পিঠ জুড়িয়া (মেরুদণ্ড বাদে) ৩ আঙ্গুল পুরু গমের ভূষির গরম গরম পুল্টিষ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। সেবনের জন্য মহাগন্ধক ½ বটী মাত্রায় কেবল মাত্র প্রাতে ও বিকালে মুথার রসের সহিত দিয়া আসিলাম। বলা বাহুল্য মহাগন্ধক ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েক বারই খাওয়ান হইয়াছিল। ঔষধ একটি না দিলে নয় বলিয়াই মহাগন্ধক দিয়াছিলাম। চারি দিন পুল্টিষ দেওয়ার পরে সংবাদ দিতে বলিয়া আসিলাম।

৬দিন পরে সংবাদ পাইলাম রোগী অনেকটা ভাল। ছয় মাস সে রোগী

কেবল পাতলা ও এলোভস্কা বাহ্যে করিয়াছে,তাহার শেষ দুইদিনের মল অনেকটা আঁটা হইয়াছে। তাঁহারা মাত্র চারি দিন পুল্টিষ দিতে হইবে মনে করিয়া আর পুল্টিষ দেন নাই। যাহা হউক এই ভাবে ১৫।১৬ দিন একাদিক্রমে পুল্টিষ দেওয়াতে তাহার পেটের আকার স্বাভাবিক অবস্থায় আসে। এবং অন্যান্য উপসর্গও কমিয়া যায়। ঔষধ, মহাগন্ধক ভিন্ন আর কিছুই দেই নাই।

মন্তব্য :—এই রোগীটিকে দ্বিতীয় বারে যখন পরীক্ষা করি তখন ইহার পেটের অন্ত্রগুলির প্রদাহ ও শোথ (Chronic enteritis) বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। এই অন্ত্রপ্রদাহ না কমিলে বালকটী নিরাময় হইবে না, ইহা তৎকালে আমার মনে হয়। তজ্জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এ ক্ষেত্রে পুল্টিষ প্রয়োগে অন্ত্রের প্রদাহ ও শোথ বিদূরিত হওয়ায় অজীর্ণ ও অতিসার আরোগ্য হইয়া গেল। কিছুদিন পর্য্যন্ত আহার্য্য দ্রব্য ভাল জীর্ণ না হইলে সেই অজীর্ণ পদার্থ অন্ত্রবদ্ধ থাকিয়া এইরূপ পেটের অসুখ জন্মাইয়া থাকে। তত্তৎস্থলে আমি অন্যান্য ঔষধ সহ পুল্টিশ প্রয়োগে আশাতীত ফল লাভ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান রোগী তাহারই মধ্যে একতম দৃষ্টান্ত স্থল।

চিকিৎসা সংবাদ ও বিবিধ।

গর্ভস্থ শিশুর অতিপুষ্টি—খুলনা জেলার অন্তর্গত হরিখালি নামক গ্রামে একটি রমণী পূর্ণ দ্বাদশ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া, গত ১২ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে একটি কন্যা প্রসব করিয়াছে। কন্যাটির আকার ৫।৬ মাসের শিশুর ন্যায়। প্রসবের ২।৩ ঘণ্টা কাল পরেই শিশু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়াছে।

নূতন রোগ—মান্দ্রাজের অন্তর্গত টেনেভেলি জেলার ইরুবেদী নামক একটি বৃহৎ মুসলমান পল্লীতে এক প্রকার নূতন জ্বর দেখা দিয়াছে। এই জ্বরাক্রান্ত রোগী কয়েক ঘণ্টা মাত্র জ্বর ভোগ করিয়াই প্রাণত্যাগ করে। এই রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবার জন্য কাপ্তেন ব্রড্‌ফিল্ড্‌কে ইরুবেদীতে প্রেরণ করা হইয়াছে। কাপ্তেন এই রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছেন পল্লীসমূহের অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনা এবং পানীয় জলের অভাব হেতু এই বিষম সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব হইয়াছে।

সদনুষ্ঠান—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, রাজসাহি পুটিয়ার রাণী শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী দেবী সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ভারতাগমন উপলক্ষে মানিকগঞ্জ মহকুমায় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ২০০০০ হাজার টাকা দান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে রাণীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। তিনি এই প্রকার সৎকার্য্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে থাকুন। তাঁহার এই সদনুষ্ঠানের উপরে অবশ্যই আমাদের কোনও বক্তব্য নাই। তবে এতদুপলক্ষে আমাদের দুই একটা প্রাণের কথা স্বতঃই বাহির হইয়া পড়ে। আমাদের দেশের রাজা, মহারাজা ও জমিদার প্রভৃতি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ বিদেশীয় চিকিৎসার উন্নতিকল্পে যতটা ঔৎসুক্য ও উদারতার সহিত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই দেশীয় এই প্রাচীন সামগ্রী—আয়ুর্ব্বেদের গৌরব বাড়াইতে যদি এইভাবে ততটা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন তবে আজ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অবস্থা এরূপ থাকিত না। আমরা আশা করি আমাদের দেশের রাজন্যবর্গ ও জমিদার সম্প্রদায় দেশের স্থানে স্থানে পাশ্চাত্য আদর্শে আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করতঃ দেশীয় চিকিৎসার প্রসার বর্দ্ধিত করিতে প্রয়াসী হইয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতের মঙ্গল সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কবিরাজ দ্বারকানাথের স্মৃতিচিহ্ন—পত্রান্তরে প্রকাশ যে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের একটি প্রস্তর মূর্ত্তি তাহার শিষ্য ও অনুরাগী ব্যক্তিগণের সাহায্যে কলিকাতা বিডন্ উদ্যানে শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। মূর্ত্তিদ্বারা উক্ত মহাত্মাকে আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত করা হইবে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে এই পরিচয়ের সহিত উক্ত মহামহোপাধ্যায়ের শিক্ষাগুরু গঙ্গাধর কবিরাজের নাম বিজড়িত থাকিলে এই স্মৃতির ঔজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত; তাহাতে অনেকেই বিশেষ সন্তোষও লাভ করিতেন। যদি তাহাই হয়, তবে উক্ত স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্যগণ এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল হয় না কি?

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা।

শ্রীমন্মাধব নিদানে মনোরমা পঞ্জিকা। (মূল মাধব নিদান এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্-বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত কৃত ব্যখ্যামধুকোষ সমেত)। অশেষ শাস্ত্রজ্ঞানের আধার পণ্ডিতবরেণ্য আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য শ্রীমদ্‌ভগবান চন্দ্র দাশগুপ্ত কবিরত্ন মহাশয় ইহার প্রণেতা। গ্রন্থকার এই পুস্তকের একখণ্ড আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়াছেন।

প্রবাদ কথায় বলে "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়"; আমাদের এই জ্ঞানপূণ্য বহুলা ভারতভূমিতে যুগযুগান্তর হইতে সুধীমণ্ডলী শাস্ত্রের টীকা ও ভাষ্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই দেখি মূল হইতে তাহার টীক ও ভাষ্য দুর্ব্বোধ্য। বুঝিবার জন্য আবার সে টীকার ও টীকা হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মূলকে প্রাঞ্জল করাই টীকা প্রণয়নের উদ্দেশ্য। অনেক স্থলেই কিন্তু তাহার বিপরীত হইয়া থাকে।

সুখের বিষয় মনোরমা পঞ্জিকায় আমরা এ দোষ বড় দেখিলাম না। অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের দুর্ব্বোধ্য না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহা গ্রন্থকারের একটি প্রধান কৃতিত্বের পরিচয়। নিদান খানি বিশেষ পারদর্শীতার সহিত সাজান হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে মূল, তার পর ব্যাখ্যামধুকোষ, সর্ব্বশেষে মনোরমা। মনোরমার আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহা পাঠ করিলে আর বঙ্গানুবাদ দেখিবার প্রয়োজন হয় না। শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপক উভয়ের পক্ষেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পঠন ও পাঠনোপযোগী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইয়াছে। মনোরমায় আর একটি বিশেষত্ব দেখিলাম, কঠিন ও অপ্রচ্ছন্ন শারীর বিজ্ঞান ও শারীর ক্রিয়া তত্ত্বের বিষয়গুলি বিশেষ গুণপনার সহিত স্থলে স্থলে বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ শারীরতত্ত্বজ্ঞানের পরিচায়ক। যাঁহারা বলেন, কবিরাজগণ শারীয়তত্ত্ব বিষয়ে কিছুই জানেন না, কেবল মনোবিজ্ঞানই তাহাদের আলোচনীয়, আমরা তাঁহাদিগকে এই মনোরমাখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠার্থিগণের পক্ষে আরও একটা সুবিধার কথা এই যে ব্যাখ্যামধুকোষে যে সমস্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় মোটেই ধরা হয় নাই বা যে যে স্থল দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে, মনোরমায় তাহা বিশদ ও সহজবোধ্য করা হইয়াছে। আমরা আশা করি প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ ইহাদ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। এতদিনে নিদানের প্রাঞ্জল একখানি টীকার অভাব প্রকৃতই বিদূরিত হইল।

২য় বর্ষ]　　　　　　　　　　　　　[৩য় সংখ্যা ।

আষাঢ়, ১৩১৯।

আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীনলিনী কান্ত দাশ গুপ্ত

বিদ্যাভূষণ, কবিরত্ন ; এল, সি, পি, এস।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী সভার

অনুমোদিত ও

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

ঢাকা, বৈকুণ্ঠনাথ যন্ত্রে

প্রিণ্টার শ্রীবিহারীলাল দত্তদ্বারা মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা]　　　　　[বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ টাকা।

সূচী।

আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়িণী মাসিক পত্রিকা।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।"

২য় বর্ষ } আষাঢ়—১৩১৯। { ৩য় সংখ্যা

আয়ুর্বিজ্ঞানে

বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্থান ও কার্য্যভেদে বায়ু পঞ্চধা বিভক্ত। যথা:—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। সাংখ্যাচার্য্যেরা নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে আরও পাঁচটী বায়ুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। উদ্গীরণকারী বায়ু অর্থাৎ যে বায়ুদ্বারা উদ্গারাদি কার্য্য সাধিত হয় তাহার নাম নাগ, চক্ষু উন্মীলনকারী বায়ুর নাম কূর্ম্ম, ক্ষুধাকর বায়ুকে কৃকর, জৃম্ভনকর বায়ু অর্থাৎ যে বায়ু দ্বারা হাই উঠে তাহাকে দেবদত্ত এবং পোষণকারী ও সর্ব্বদেহব্যাপী বায়ুকে ধনঞ্জয় বলে। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ কেবল প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকেই স্বীকার করিয়াছেন। স্থান ও কার্য্যাদি বিচার করিলে নাগাদি পঞ্চবায়ুকে এই প্রাণাদি পঞ্চকের অন্তর্গত বলিয়াই মনে হইবে। কাযেই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু হইতে সকল বায়ুই সিদ্ধি হইতে পারে।

প্রাণবায়ু:—'প্র' উপসর্গের উত্তর অদাদিগণীয় "অন্" ধাতুর সহিত 'ঘঞ' বিধান করিয়া প্রাণ শব্দ সাধিত হয়। "অন্" ধাতুর অর্থ—বাঁচিয়া থাকা। যাবতীয় শারীরবায়ুই জীবন ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে। তবে সেই জীবন রক্ষাকার্য্যে যে বায়ু প্রধান সহায় হয় তাহাকেই প্রাণবায়ু বলাযায়।

মূর্দ্ধদেশ ও হৃদয়ক্ষেত্রেই প্রাণবায়ুর ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। মূর্দ্ধা বলিতে মস্তিষ্কদেশ (Brain) বুঝায়। ইহা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবহা শিরাসমূহের কেন্দ্রস্থল। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যপদার্থের সংস্পর্শ হইলেই গৃহীত বিষয়ের কম্পন ব্যানবায়ু কর্ত্তৃক শব্দস্পর্শাদি জ্ঞানবহা শিরাপথে (Sensory nerves) মস্তিষ্কে নীত হয়। ডাক্তারি পুস্তকের বঙ্গানুবাদে 'Vein' এর অর্থ করা হইয়াছে 'শিরা'। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে, দেহস্থ শব্দস্পর্শাদিবহা হউক আর রসরক্তাদিবহাই হউক সর্ব্বপ্রকার স্রোতপথই নাড়ী বা শিরা নামে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ Artery, Vein ও Nerve প্রভৃতি সমস্তই শিরা। কাজেই বাঙ্গলা ডাক্তারি পুস্তকগুলিতে যে Vein কে শিরা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট।

মস্তিষ্কাধিষ্ঠিত প্রাণবায়ু ঐ কম্পন অন্তঃকরণে লইয়া যায়। তদ্দ্বারা মনে একটা ভাবের উদয় হয়। সেই ভাবার্থ নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত এই প্রাণবায়ুর সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৃত্তি সক্রিয় হইয়া উঠে। তাহাকে বুদ্ধিবৃত্তি বলে। বুদ্ধিকেন্দ্রেই নিশ্চয়াত্মক বিষয়জ্ঞান জন্মে। প্রাণ বায়ু এই মনোবুদ্ধির নিয়ন্ত্রীশক্তির অধিষ্ঠানভূমি। ষট্চক্র-সাধনে এই প্রাণ বায়ুরই সম্পূর্ণ সাহায্য প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহা অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত।

ঊর্দ্ধে জত্রুদেশ (Clavicular region) নিম্নে শ্বসনেরণা (১) (Diaphram) সম্মুখে বক্ষফলকাস্থি (Sternum) পশ্চাতে মেরুদণ্ড এবং চতুর্দ্দিকে পঞ্জরাস্থি দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে হৃদয়প্রদেশ বলে। ফুস্ফুস, হৃদ্পিণ্ড, এবং নয়টী মর্ম্মস্থান ইহাতে অবস্থিত। ইহা প্রাণবায়ুর অপর অধিষ্ঠান ভূমি। ইহাও অতীন্দ্রিয়ব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়ব্যক্ত ভেদে

(১) বক্ষ ও উদরপ্রদেশ যে পাতলা মাংসপেশী দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে তাহাকে শ্বসনেরণা বলে। ইহা উরোবিভাজিকা বলিয়াও কথিত হয়।

দুই প্রকার। অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত প্রাণবায়ুর শক্তিতে ভূবায়ু শ্বাসদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ফুপ্‌ফুস কোষস্থ হইলে তাহা প্রাণসংজ্ঞা লাভ করে। ইহাকে ইন্দ্রিয়-ব্যক্ত প্রাণবায়ু বলে। অতীন্দ্রিয়-ব্যক্ত প্রাণবায়ুর শক্তিতে শ্বসনেরণা (Diapham) আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইলে শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইহার শক্তিতে হৃদ্‌পিণ্ডের বামকোষ্ঠে আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়া দ্বারা তদভ্যন্তরস্থ শোণিত অনুলোমরক্তবহাশিরা (Artery) পথে ব্যান বায়ুর কর্তৃত্বাধীনে প্রেরিত হয়। ব্যান বায়ু ঐ শোণিত সমস্ত দেহের যাবতীয় কোষাভ্যন্তরে চালিত করিয়া দেহোপযোগী পদার্থ সমূহ প্রদান করতঃ দেহবর্জ্জিত ব্যয়িতসার পদার্থ সহ পুনরায় হৃদ্‌গামী বিলোম-রক্তবহা শিরা (Vein) পথে হৃদকোষ্ঠের দক্ষিণ গহ্বরে আনিয়া দেয়। প্রাণবায়ু তথা হইতে সেই শোণিত ফুপ্‌ফুসে চালিত করে তথায় ইন্দ্রিয়-ব্যক্ত প্রাণবায়ুর সংযোগে ঐ শোণিতমিশ্রিত দেহ-পোষণ-বিরোধী দেহগলিত বাষ্পীভূত পদার্থ (carbonic acid gas) বিযুক্ত করিয়া নাসিকা ও মুখপথে বিনির্গত করে এবং তৎপরিবর্ত্তে বিষ্ণুপদামৃত (১) মিশ্রিত করতঃ রক্তকে বিশুদ্ধ করিয়া হৃদয়ের বামকোষ্ঠে আনয়ন করে এবং তথা হইতে পুনরায় অনুলোম-রক্ত-বহা-শিরাপথে ব্যানবায়ুর কর্ত্তৃত্বাধীনে প্রেরণ করিয়া থাকে। জীবের জীবনধারণ এই শোধন ব্যাপারের সহিত সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট। এই অমৃতসঞ্চার এক মুহূর্ত্তের জন্য রুদ্ধ হইলে জীবের জীবলীলা শেষ হইয়া থাকে।

---

(১) বিষ্ণুপদ অর্থাৎ শূন্য বা আকাশ। আকাশে যে অমৃত বা অমৃতরস পদার্থ থাকে তাহা বিষ্ণুপদামৃত। শার্ঙ্গধরসংহিতায় উক্ত আছে:— "নাভিস্থঃ প্রাণপবনঃ স্পৃষ্টা হৃদ্‌কমলান্তরং। কোষ্ঠাৎ বহির্বিনির্যাতি পাতুং বিষ্ণুপদামৃতং॥ পীত্বা চাম্বরপীযূষং পুনরায়তি বেগতঃ। প্রীণয়ন্দেহমখিলং জীবয়ন্ জঠরানলম্॥" পাশ্চাত্যমতে অক্‌সিজেন্ (Oxygen) এর ক্রিয়া ও গুণের সহিত এই বিষ্ণুপদামৃতের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অক্‌সিজেন (Oxygen) আর আয়ুর্ব্বেদের বিষ্ণুপদামৃত বা অম্বরপীযূষ একই পদার্থ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত সুবিখ্যাত কণ্ডরসেট্ ইহাকে (Vital air) বা জীবন-বায়ু নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রাণ বায়ুর শক্তিতে নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা) ও হাঁচি হয় এবং অন্ন-পানীয় দ্রব্যাদি গলাধঃকৃত হইয়া উদরপ্রদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহা দূষিত হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, হৃল্লাস প্রভৃতি রোগ জন্মে।

উদানবায়ু—উৎ উপসর্গের উত্তর ভ্বাদিগণীয় অন্ ধাতুর সহিত ঘঞ প্রত্যয় বিধান করিয়া উদান শব্দ গঠিত হইয়াছে। এই অন ধাতুর অর্থ—শব্দ করা। এই বায়ুর শক্তিতে শব্দ করা যায় বলিয়া ইহাকে উদান বায়ু বলে। কণ্ঠদেশে (Larynx) অনেকগুলি পেশী সমবায়ে স্বরযন্ত্র গঠিত হইয়াছে। ইহা হইতে স্বর উত্থিত হয়। এই জন্য কণ্ঠদেশকে শব্দের অধিষ্ঠান-ভূমি বলে। অতীন্দ্রিয় ব্যক্ত প্রাণবায়ু দ্বারা উদান বায়ু সক্রিয় হইয়া উক্ত কণ্ঠদেশস্থ স্বরাধিষ্ঠান পেশী সমূহকে কম্পিত করে। কণ্ঠচর ইন্দ্রিয়ব্যক্ত প্রাণবায়ু এই কম্পনে আহত হইয়া বিক্ষোভিত ও উৎক্ষিপ্ত হয়। তাহাতেই শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি এই বায়ু অব্যাহত ভাবে বহির্গমন করে তবে উত্থিত শব্দ অব্যক্ত হয়। আর যদি কণ্ঠ, তালু, জিহ্বামূল, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া সে ধ্বনি নির্গত হয় তাহা হইলে উহা ব্যক্তাক্ষর হইয়া থাকে।

উদান বায়ুর স্থান সম্বন্ধে বাগ্‌ভট্ বলেন, "উরঃস্থানম্ উদানস্য নাসানাভি-গলান্ চরেৎ"। যদি কণ্ঠস্থানের স্বরযন্ত্র (Vocal chord) হইতেই উদান বায়ু কর্তৃক শব্দ সমুত্থিত হইল, তবে বাভটীয় এই বচনের সার্থকতা কি ?

স্বরশাস্ত্রে দেখা যায়, উৎপত্তি স্থলের গভীরতা অনুসারে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত এই তিন প্রকার শব্দ সমুত্থিত হয়। এই তিন প্রকার শব্দ একই কণ্ঠদেশ হইতে বিনির্গত হইলেও ইহা তিনটি বিভিন্ন স্থানকে প্রপীড়িত করিয়া উত্থিত হইয়া থাকে। হ্রস্ব শব্দগুলি নাসামূল, দীর্ঘ শব্দগুলি গলমূল এবং প্লুত ও মহাপ্রাণ শব্দগুলি নাভিমূল হইতে সমুত্থিত হয়। আত্মার ইচ্ছামাত্র প্রাণবায়ু কর্তৃক উক্ত নাসাদি কোনও একস্থানে উদান বায়ু সক্রিয় হইয়া কণ্ঠদেশস্থ স্বরযন্ত্রকে আহত করে। কাযেই ঐ ইচ্ছানুযায়ী স্থানের ও স্থানানুযায়ী উদিত হ্রস্বদীর্ঘাদি ধ্বনির তারতম্য হইয়া থাকে। সঙ্গীতশাস্ত্রে উদারা, মুদারা ও তারা এই তিন গ্রামের শব্দের অধিষ্ঠান এই নাসা, গল ও নাভিমূল। সঙ্গীত মাত্রই এই উদানবায়ুর

শক্তিতে গীত হয় এবং গানের দ্বারা উদানবায়ুর শক্তিসাধনা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবৎ সাধনার যে ক্রম প্রচলিত আছে, সেই তত্ত্বের দিক হইতে অনুধাবন করিলে ইহা উদানবায়ুর মধ্যদিয়া প্রাণ বায়ুকে সক্রিয় করতঃ আত্মাকে বুঝিবার একটি পন্থা বলিয়াই অনুমিত হয়।

স্বরোৎপাদন ভিন্ন, উদানবায়ু আরও কয়েকটি প্রধান শারীরিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। উদানবায়ুর শক্তিতে, কার্য্যে প্রযত্ন বা চেষ্টা জন্মে, পদার্থ প্রভৃতি গ্রহণ বিষয়ে উদ্যম উপস্থিত হয়, শরীরের ত্বগ্‌বিভাগে এবং চক্ষুরাদি শরীরাবয়বে বর্ণক পদার্থ সংগৃহীত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে স্মৃতির সঞ্চার হইয়া থাকে। প্রযত্নাদির সহিত ওজঃ পদার্থের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ওজোধাতুর সঞ্চয় বা ক্ষয়ের সহিত কার্য্যে উৎসাহ ও উদ্যমের বৃদ্ধি ও হ্রাস ঘটিয়া থাকে। ওজস্বী মনুষ্যগণের স্মৃতিশক্তি সমধিক প্রবলা হয়। ওজঃক্ষয়ে, স্মৃতি, মেধা, কান্তি প্রভৃতির ক্ষীণতা জন্মে। উদান বায়ু ওজঃসঞ্চয়ের এবং ওজঃ বিসর্পণের সহায়তা করে। ইহা কুপিত হইলে স্বরভেদ এবং নানা প্রকার কণ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। নিরুৎসাহিতা, অনুদ্যম এবং কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি জন্মায়।

সমান বায়ুঃ—ইহার শক্তিতে অন্নবহা নাড়ীর (আমাশয় ও পক্কাশয়ের) সর্ব্বপ্রকার পাচকরস নিসৃত হইয়া ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সমান বায়ুর শক্তিতে আমাশয় প্রভৃতি অন্নবহা নালীর বিভিন্ন স্থান হইতে, ক্লোমাদি পাচকরস নিসৃত হইয়া ভুক্তদ্রব্য সমূহকে অণুশঃ বিভাগ করতঃ জীর্ণ করে এবং উক্ত পরিপাকপ্রাপ্ত দ্রব্য হইতে ধাতুভূত রস ও মলাদি অসার পদার্থ সমূহকে বিযোজিত করে। ধাতুভূত রসকে পরিপাক করিয়া দুইভাগে বিভক্ত করে। সূক্ষ্মভাগকে রক্তাকারে পরিণত করিবার জন্য ব্যানবায়ুর কর্ত্তৃত্বাধীনে দেয় এবং স্থূলভাগকে দেহের আপ্যায়নী শক্তি রক্ষা করিবার নিমিত্ত রস-বাহি স্রোতে (Lymphatic circulation.) চালিত করে। এক কথায়, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিয়া তাহা হইতে দেহরক্ষণোপযোগী পদার্থ নির্ম্মাণ করাই সমান বায়ুর সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। পাচকাগ্নি এই সমান বায়ুর শক্তিতেই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। সমান বায়ু দূষিত হইলে,

অগ্নিমান্দ্য, বিষমাগ্নি, অতিসার, গুল্ম, পেটফাঁপা, অম্বল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

অপানবায়ু :—যে বায়ু অধোনিঃসারণ ব্যাপার দ্বারা প্রাণিগণকে বাঁচাইয়া রাখে তাহাকে অপানবায়ু কহে। ইহা রক্তের অকর্ম্মণ্য জলীয় অংশ বৃক্কযন্ত্রে (Kidney) সংগ্রহ করিয়া মূত্র বস্তিতে (Bladder) প্রেরণ করে এবং তথা হইতে মেঢ্র পথে মূত্ররূপে নির্গমন করায়। এই বায়ু ভুক্ত দ্রব্যের অসার পদার্থকে বৃহদন্ত্রে সঞ্চিত করিয়া মলরূপে গুহ্যপথে নিঃসারিত করে। প্রসবকালীন জরায়ুর মুখ (os) প্রসারিত করিয়া গর্ভস্থ শিশুকে নির্গমনের সাহায্য করে। নারীদিগের প্রতিমাসে আর্ত্তব নিসৃতি এবং পুরুষের শুক্রক্ষরণ এই অপান-বায়ুর শক্তিতে হইয়া থাকে। ইহা দূষিত হইলে বস্তি, গুহ্য ও জরায়ু প্রভৃতি দেশে অর্শ, প্রমেহ, প্রদর, বহুমূত্র, এবং শুক্রমেহ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ জন্মে।

ব্যানবায়ু :—যে শক্তিদ্বারা মাংসপেশীর উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণাদি কার্য্য (action of the motor nerves) এবং শরীরাবয়বের যাবতীয় গতি সম্পাদিত হয় তাহাকে ব্যান বায়ু বলে। ইহা প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক হৃদ্‌কোষ্ঠ হইতে প্রদত্ত বিশুদ্ধ শোণিত লইয়া সর্ব্বদেহে প্রতি কোষময় তন্তুকে তর্পিত করে এবং শরীর পোষণোপযোগী পদার্থ সমূহকে রক্ত হইতে বিযুক্ত করিয়া দেহের প্রত্যেক কোষের পুষ্টিসাধন করে। এবং দেহবিগলিত অসার পদার্থ সমূহকে রক্তের সহিত মিশাইয়া হৃদ্‌গামী শিরাপথে দক্ষিণ হৃদ্‌কোষ্ঠে প্রাণ বায়ুর কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া দেয়। বাহ্যবিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্পর্শজন্য যে কম্পন জ্ঞানবহা শিরাপথে মস্তিষ্কে নীত হয় তাহা এই ব্যান বায়ু কর্ত্তৃক হইয়া থাকে। সর্ব্বদেহ ব্যাপী রসবহন (lymphatic circulation) ও ইহার দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

ব্যানবায়ু প্রকুপিত হইলে আক্ষেপক বাত, ধনুষ্টঙ্কার, গৃধ্রসী (sciatica) প্রভৃতি বাতব্যাধি (derangement of the motor and sensory nerves) এবং সর্ব্বদেহগত রোগ জন্মে।

বায়ুর কথা বলিতে বলিতে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। এস্থলে আরও ২।১ টী বিষয়ের অবতারণা করিয়াই বায়ু সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

পূর্ব্বে যে বায়ুর কথা বলা হইল, কিসে তাহার প্রকোপ হয় আর কিসেইবা শান্ত হয় তাহা সবিশেষ জানা না থাকিলে বায়ুর স্বরূপ-নির্ণয়-জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে।

শাস্ত্র বলেন, বলবান জীবের সহিত মল্লযুদ্ধ, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধিক মৈথুন, অত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, বেগে গমন, পীড়ন বা বা আঘাত প্রাপ্তি, লঙ্ঘন (উপবাস), সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, পর্য্যটন, অশ্বাদি যানে অতিরিক্ত গমন ; মল, মূত্র, অধোবায়ু, শুক্র, বমি, উদ্গার, হাঁচি ও অশ্রুবেগ ধারণ ; কটু, তিক্ত, কষায়, রুক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্য, শুষ্কশাক শুষ্কমাংস ; বোরো, কোদ, উদ্দালক, শ্যামাক ও নীবার ধান্য ; মুগ, মসুর, অরহর, ছিম, প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন ; বর্ষাঋতু, মেঘাগমকাল, ভুক্তান্নের পরিপাক কাল, অপরাহ্নকাল এবং ভুবায়ুর প্রবল প্রবাহ সময়—এই সকলই বায়ু প্রকোপের কারণ।

ঘৃত তৈলাদি স্নেহপান, স্বেদপ্রয়োগ, অল্প বমন, বিরেচন, অনুবাসন , মধুর, অম্ল, লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তৈলাভ্যঙ্গ, বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশমূল কাথাদির প্রসেক পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্যপান, পরিপুষ্ট মাংসের রস ভোজন এবং সুখসচ্ছন্দতা প্রভৃতি কারণে বায়ুর শান্তি হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, বায়ুর উৎপত্তি হয় কোথা হইতে? তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লীতে লিখিত আছে—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুদ্ভূতঃ (ব্রহ্মানন্দবল্লী ১৷৩)।

অন্যত্র—আকাশাদ্বায়ুঃ।

অর্থাৎ সেই অনন্ত পরমাত্মা হইতে মূর্ত্তিমান পদার্থের অবকাশ স্বরূপ সর্ব্বনামরূপের নির্ব্বাহক শব্দগুণপূর্ণ আকাশের উৎপত্তি এবং আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, বায়ু জন্যপদার্থ অর্থাৎ আকাশই ইহার স্রষ্টা ; আকাশের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে লীন অবস্থা হইতে বায়ুর প্রকাশ হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে। বেদান্ত ও সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে আমরা একরূপ মতই দেখিতে পাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Herbert Spencer তাহার First principle নামক গ্রন্থেও লিখিয়াছেন—

An entire history of any thing must include its appearence out of the imperceptible and its disappearence into the inperceptible.

অব্যক্ত প্রকৃতিতে যাহা নিহিত অবস্থায় সুপ্তশক্তি (Potential energy) রূপে অবস্থিত ছিল, ক্রিয়ার উদ্রেকে উহাই কর্ম্মশক্তিরূপে (Kinetic energy) প্রকাশিত হইল। এই অবস্থায় গতি বা কম্পন বা স্পর্শ বা বায়ুর উৎপত্তি হইল। অনন্ত আকাশে অনন্ত সত্ত্বায় এই গতির অবস্থান বিদ্যমান।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলেন চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন জগতের প্রতি অণুর প্রতি কম্পনে তানের প্রভাব (Rhythm) আছে। তান ক্রমেই এই কম্পনের চিরপ্রবাহ বর্ত্তমান। তাই শ্রুতি বলেন—

"ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি—(শতপথব্রাহ্মণ)" এই বিশ্ব সকলই ছন্দ। এই ছন্দই ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং স্বর্গলোক।

"ছন্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্বিশ্বং ব্যবর্ত্তত, (বাক্যপদীয়)" অর্থাৎ এই বিশ্ব প্রথমে ছন্দ হইতেই বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা তিন প্রকার—"মাচ্ছন্দঃ, প্রমাচ্ছন্দঃ, প্রতিমাচ্ছন্দঃ '(শুক্ল যজুর্ব্বেদ-সংহিতা)'। পরিদৃশ্যমান ভূলোক মিতছন্দঃ, অন্তরীক্ষলোক প্রতিমাছন্দঃ এবং দ্যুলোক প্রতিমিতছন্দঃ। যে গতি তালে তালে নৃত্য করে তাহাই ছন্দঃ। সেই ছন্দই বিশ্ব বিবর্ত্তনের কারণ। হার্বার্ট স্পেন্সার ইহাকে Rhythm of motion নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা বায়ুরই পরিচায়ক।

এই গতিসূত্র যে সর্ব্বজীবে আশ্রিত রহিয়াছে, কঠশ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন—

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্— (৬ বল্লী)

অর্থাৎ এই সমস্ত জগত প্রাণস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত ও কম্পিত হইতেছে। এই কম্পন হইতেই কম্পনের আত্মস্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধি হয় বলিয়া মহর্ষি বাদরায়ন সূত্র করিলেন "কম্পনাৎ"— (বেদান্তদর্শন, ১। ৩। ৩৪)

এই বিশ্ববিসারী বায়ু বা কম্পনই সৃষ্টি (Evolution) এবং বস্তু লয়ের (Involution) হেতু। এই জগৎ আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিত্যপ্রতিমা। এই আবির্ভাব ও তিরোভাব যে দেবতত্ত্ব হইতে সংঘটিত হইতেছে তাহাই বেদের বায়ু-দেবতা। শ্রুতি বলেন—

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টোরূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ।
(কঠ, ৫ম। ১০)

অর্থাৎ যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবস্তুভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন তেমনই একই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে তত্তদ্বস্তুরূপ হইয়াছেন এবং সমুদায় পদার্থের বাহিরেও আছেন। এতদ্দ্বারা বায়ুর বিশ্ববিসারিত্ব সপ্রমান হইতেছে। (ক্রমশঃ)

আহার।

আহরণং আহারঃ। বাহিরের বস্তু আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করার নাম আহার।

চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুরই আহার আছে, আহার ভিন্ন কেহ কখনও জীবন ধারণ করিতে পারে না। তরু লতা তৃণ গুল্ম প্রভৃতি, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকরদ্বারা ভূমির রস আহরণ করিয়া জীবনধারণ ও দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে। *

প্রাণিগণের যেরূপ আহার্য্যবস্তুর সারভাগ শিরাপ্রতান দ্বারা সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে, তরুলতা প্রভৃতিরও সেইরূপ আহার্য্য পার্থিব রস সূক্ষ্ম শিরা দ্বারা কাণ্ড, নাল, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলাদিতে প্রসারিত হইয়া সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন করিতেছে। প্রাণিগণের মধ্যে যেরূপ কেহ পুষ্টিকর আহারের অভাবে জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণকায় দুর্ব্বল হইয়া

---

* উহারা মূলদ্বারা ভূমির রস পান করিয়া বাঁচে, এইজন্য বৃক্ষের একটী নাম "পাদপ"। পাদৈর্মূলেন ভূমিরসং পিবতীতি পাদপঃ।

যায়, আবার কেহ পুষ্টিকর আহার লাভ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া উঠে. উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যেও সেইরূপ ভূমির তারতম্যানুসারে কেহ পুষ্টিকর আহারের অভাবে নিস্তেজ ক্ষীণকায় হইয়া থাকে, কেহবা পুষ্টিকর সারবান আহার পাইয়া শীঘ্রশীঘ্র বৃহৎকায় ও তেজস্বী হইয়া উঠে।

পদার্থমাত্রই ক্ষয়শীল। শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের গতি ও দৈহিক সঞ্চালনাদি দ্বারা প্রতিক্ষণে শারীরিক পরমাণু অলক্ষ্যে ক্ষয় পাইয়া যাইতেছে, আবার আহার দ্বারা তাহার পরিপূরণ হইতেছে। উদ্ভিজ্জগতেও ঐরূপ সূর্য্য সন্তাপাদি দ্বারা প্রতিক্ষণে বৃক্ষাদির রস শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, আবার পার্থিবরসের আহার দ্বারা সর্ব্বক্ষণ তাহা পরিপূর্ণ হইতেছে।

শৈবালক প্রভৃতি কোন কোন বস্তু কেবল জল খাইয়া জীবন ধারণ ও কলেবর বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আবার গুড়ূচী, আলোকলতা প্রভৃতি কেবল বায়ু আহার করিয়াই জীবনধারণ ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে।

প্রাণীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ মাত্র বায়ু আহার করিয়া বহুদিন জীবন ধারণ করিতে পারে। সর্প শীতকালে মাত্র বায়ু আহার করিয়া বহুদিন বাঁচে; এইজন্য সর্পের এক নাম পবনাশন। ভেকগণও শীতকালে বহুদিন বায়ু আহার করিয়া মাটীর নীচে থাকে। অন্য ঋতুতে তাহারা মাত্র বায়ু আহার করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে রক্ত অতিশয় শীতল হইলে কিছুমাত্র ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ থাকে না। সর্প ও ভেক জাতির রক্ত স্বভাবতঃই শীতল, শীতকালে উহা আরও শীতল হয় বলিয়া তৎকালে তাহাদের আহারের প্রয়োজন হয় না।

মানুষের রক্ত স্বভাবতঃ শীতল নয় বলিয়া তাহারা শীতকালে আহারাভাবে বাঁচে না। কিন্তু মানুষ কোনও প্রক্রিয়াদ্বারা যদি রক্ত শীতল করিতে পারে, তবে সেও অনেক দিন আহারাভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা মানুষের রক্ত শীতল হয় সেই প্রক্রিয়ার নাম "প্রাণায়াম"। প্রাণায়ামে কুম্ভকদ্বারা বহুক্ষণ বায়ু রুদ্ধ থাকিলে আপনা হইতেই রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তখন আর ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না, আহারেরও প্রয়োজন হয় না। হৃৎপিণ্ডের গতি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাষ্ঠবৎ কঠিন ও বরফের ন্যায় শীতল হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার দেহে কোন ক্রিয়াই হয় না বলিয়া

দৈহিক পরমাণুরও ক্ষয় হয় না, সুতরাং অনাহারে তাঁহার দেহের ক্ষীণত্ব ঘটে না। এইরূপ প্রক্রিয়ার বলে মহর্ষি বাল্মীকি বহুদিন বল্মীকস্তূপের অভ্যন্তরে অনাহারে থাকিয়াও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন নাই।

বর্ত্তমান যুগেও পঞ্জাবে হরিদাস যোগী এই প্রক্রিয়া বলে বহুদিন মৃত্তিকার নীচে অবস্থান করিয়া ছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই হরিদাসের কথা অবগত আছেন।

অনেক দিন হইল মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে আর একটী যোগী পুরুষ পাওয়া যায়, ভূকৈলাসের রাজবাটীতে তাঁহার যোগভঙ্গ করা হইয়াছিল। অনেকে তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

প্রায় ৫৫ কি ৫৬ বর্ষ হইল বরিশাল জেলার পশ্চিমাংশে জেলেদিগের জালে একটী যোগী পুরুষ উত্তোলিত হয়, তখন তাঁহার শারীরিক ক্রিয়া কিছুমাত্র ছিলনা, অথচ দেহ অবিকৃত। ধীবরগণ ইহাতে ভীত হইয়া ঐ জেলার পাইট্‌কেল্ বাড়ী নামক স্থানে একটী ফকিরের নিকটে তাঁহাকে রাখিয়া যায়। ফকির সাহেব তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগিবর মৌনব্রতাবলম্বনেই থাকিতেন। প্রতিদিন বহু দর্শক সেস্থানে উপস্থিত হইত, আমিও তাঁহাকে একদিন অবলোকন করিয়াছি। কিছুকাল পরে যোগিবর তথা হইতে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহা কেহই জানে না।

আমাদের যোগশাস্ত্রের ভূমিকায় লিখিত আছে—

"নাশ্নান্তি দুর্দ্দুরাঃ শীতে ফণিনঃ পবনাশনাঃ।
কূর্ম্মাশ্চ শ্বাসগোপ্তারো দৃষ্টান্তঃ স তু যোগিনাং॥

ভেকগণ শীতকালে আহার করে না, ফণিগণও শীতে বায়ু আহার করিয়া থাকে, কূর্ম্মগণ মৃত্তিকার নীচে বহুদিন শ্বাস গোপন করিয়া বাঁচে, পূর্ব্বকালে যোগিদিগের ইহা দৃষ্টান্ত হইয়াছিল।

প্রতিভাশালী মনিষিগণের শিক্ষাগুরু প্রকৃতি। তাঁহারা অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব সকল প্রকৃতির নিকট ও ইতর জন্তুর নিকট শিক্ষা করিয়া থাকেন। নিউটন্ যেরূপ আতাফল ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেইরূপ আর্য্য মহর্ষিগণ সর্প ও ভেকের শীতে অনশন ও কূর্ম্মের শ্বাস-গোপন শক্তি দর্শনে তাহার মূল কারণের

অনুসন্ধান করতঃ প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাসরোধ ও রক্ত ঠাণ্ডা করিয়া অবাধে স্থিরচিত্তে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

আমরা আহারের কথাপ্রসঙ্গে অনাহারের পথে অগ্রসর হইতেছি। সুতরাং এদিকে আর অগ্রসর না হইয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। প্রাণীগণের আহার একটী মহা যজ্ঞ স্বরূপ। যজ্ঞে যেরূপ আহুতি প্রদান করিলে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণ যাঁহার যে ভাগ তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ আহার্য্য বস্তু উদরস্থ হইলে রক্ত, মাংস, মেদঃ, মজ্জা, অস্থি, শুক্র প্রভৃতি শারীরিক পদার্থ সকল এই আহার্য্যবস্তুর সার হইতে যাহার যে অংশ সে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। মহামতি সুশ্রুত বলেন—

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে আহারঃ পাঞ্চভৌতিকঃ।
বিপক্কঃ পঞ্চধা সম্যক্ স্বান্ গুণানভিবর্দ্ধয়েৎ॥

আহার্য্য বস্তু মাত্রই পাঞ্চভৌতিক, আমাদের এই দেহও পাঞ্চভৌতিক; সুতরাং আহার্য্য বস্তুর সারভাগ পঞ্চভূতের পঞ্চপ্রকার তেজদ্বারা পঞ্চধা বিপক্ক হইয়া ঐ সকল ভূতের স্বীয় গুণ বৃদ্ধি করে।

আমাদের দেহও পঞ্চভূতে নির্ম্মিত, আর আমরা যাহা খাই তাহা পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। কথাটা কিছু খটমট হইল বলিয়া একটু স্পষ্ট করিয়া বলার দরকার।

দেহস্থ পঞ্চভূতের প্রত্যেক ভূতেই এক একটি উষ্মা (উষ্ণতা) আছে। এই উষ্ণতাকে আয়ুর্ব্বেদে ভূতাগ্নি বলে *। আহার্য্য বস্তু জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপক্ক হইলে অসারভাগ মলমূত্ররূপে নিক্ষিপ্ত হয়, সারভাগ ভাত কচলান জলের ন্যায় একপ্রকার শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থে পরিণত হয়। ঐ তরল পদার্থের নাম রস। পাঞ্চভৌতিক পদার্থে উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ রসও পাঞ্চভৌতিক। দেহের পার্থিবাংশের উষ্মা ঐ রসের পার্থিবাংশকে পরিপক্ক (শোধন) করিয়া স্বীয় কলেবরের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইরূপে দেহের জলীয়াংশগত উষ্মা ঐ রসের জলীয়াংশকে বিশুদ্ধ করিয়া নিজে গ্রহণ করতঃ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। দেহস্থ তেজঃবায়ু আকাশে যে উষ্মা আছে তাহারাও উক্তরূপে রসের তেজঃবায়ু আকাশভাগকে বিশুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ অঙ্গের পুষ্টিসাধন করে।

* ভৌমাপ্যাগ্নেয় বায়ব্যা পঞ্চোষ্মানঃ সনাতনাঃ। ইতি চরক।

মহর্ষি চরক বলেন—

রসাদ্রক্তং ততোমাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে।
মেদসোঽস্থি ততোমজ্জা মজ্জ্ঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ॥

আহার্য্যবস্তুর সারভাগ রসরূপে পরিণত হয়। এইরস বিবিধ শিরাদ্বারা বিবিধ পথে পরিচালিত হইয়া সমস্ত ধাতুর পোষণ করিয়া থাকে। কিয়দংশ রসবাহী শিরাদ্বারা শরীরস্থ রসের পোষণ করে; কিয়দংশ রক্তের পথে গমন করিয়া একটু বিলম্বে রক্তের পোষণ করে, কিয়দংশ মাংসরূপে পরিণত হইয়া মাংসের পুষ্টি করে। এইরূপে একরসেরই অংশবিশেষদ্বারা মেদঃ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্রের পুষ্টি হইয়া থাকে। রস রক্তরূপে পরিণত হইতে যে সময় অতিবাহিত হয়, মাংসরূপে পরিণত হইতে তদপেক্ষা অধিক সময়ের দরকার। আবার রসের মেদঃরূপে পরিণতি হইতে আরও একটু অধিক সময়ের আবশ্যক। এইরূপে অস্থিমজ্জাশুক্ররূপে রসের পরিণতি হইতে ক্রমেই কিছু কিছু অধিক সময়ের দরকার।

এই জন্যই চরক বলিয়াছেন—

রসাদ্রক্তং—ইত্যাদি। অর্থাৎ রস পোষণের পর ঐ রস রক্তরূপে পরিণত হয়। তারপর ঐ রস মাংসরূপে পরিণত হয়, তৎপর মেদরূপে পরিণত হয়। এইরূপে বচনের প্রত্যেক পদে পরযোগলক্ষণা, পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা পরপরবর্ত্তী ধাতুরূপে রসের পরিণতি হইতে সময়ের আধিক্য দেখাইয়াছেন।

উক্তরূপে আমাদের শরীর রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইলেও আহার্য্য বস্তুর পার্থক্য বশতঃ সকল বস্তুতে সকল ধাতুর সমান পুষ্টি হয় না। এক এক বস্তু এক এক অংশের বিশেষ পুষ্টিকর।

রক্তের দ্বারা রক্তের, মাংসের দ্বারা কিংবা মাংসের গুণ যে পদার্থে আছে তাহাদ্বারা মাংসের, মেদঃ কিংবা তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা মেদের, অস্থিদ্বারা অস্থির, শুক্র কিংবা শুক্রের উপাদান ঘৃতদুগ্ধাদি যে যে পদার্থে আছে তদ্দ্বারা শুক্রের, মস্তিষ্ক কিংবা মস্তিষ্কজনক পদার্থ দ্বারা মস্তিষ্কের বিশেষরূপে পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

আবার অস্থিতে চূণ আছে বলিয়া চূর্ণদ্বারা অস্থির পোষণ হয়। রক্তে লৌহ আছে, তাই লৌহ দ্বারা রক্তের বিশেষ পুষ্টি হয়। জলদ্বারা শরীরের

জলীয় ভাগের পোষণ হয়, উষ্ণ-গুণ বস্তুদ্বারা উত্তাপ রক্ষা হয়, শীতলবস্তু দ্বারা পিত্তের দমন ও কফের পুষ্টি হয়। এইরূপে নানাবিধ খাদ্যের অংশবিশেষ দ্বারা নানাবিধ ধাতুর পোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিসাধন করিতে হইলে এক-রস কিংবা একপ্রকার বস্তু সর্ব্বদা ব্যবহার না করিয়া নানারসের নানাবিধ বস্তু আহার করা উচিত। ইহাতে যুগপৎ সমস্ত ধাতুর পুষ্টিলাভ হইয়া থাকে।

আজকাল আমাদের দেশে আহারের কাল-দেশ-পাত্র-পরিমাণ বিচার অতি অল্প। সময় সময় কেহ কেহ বাজি ধরিয়া আহার করিয়া থাকেন। বাজি ধরিয়া অপরিমিত আহার করা আর জেদ করিয়া আত্মঘাতী হওয়া প্রায় তুল্য কথা।

অনেকে আবার উদরকে একটা স্থাবর কিংবা জঙ্গম সম্পত্তি মনে করিয়া থাকেন। উদরের যত পূর্ত্তি হয়, যত কিছু পেটে ঢুকান যায় ততই যেন সম্পত্তির আয় বৃদ্ধি হইতেছে বলিয়া মনে করেন। এই সকল কুরীতির পরিহারের জন্য আয়ুর্ব্বেদ মতে কি ভাবে কি অবস্থায় আহার করা উচিত, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

সুস্থশরীরে দিবসে একপ্রহরের পর দুইপ্রহরের মধ্যে নিম্নলিখিত নিয়মে ভোজন করিবে এবং রাত্রি একপ্রহরের মধ্যে লঘুপাক বস্তু কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া খাইবে।*

১। মহর্ষি চরক বলেন, ভোজ্য বস্তু ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে ভোজন করিবে। তাহাতে অগ্নিবৃদ্ধি ও সহজে পরিপাক হয়, শরীরের গ্লানি উপস্থিত হয় না, সুতরাং আহার্য্য বস্তু শীতল হইলে ভোজন করিবে না।

২। স্নিগ্ধবস্তু ভোজন করিবে। স্নিগ্ধবস্তু অগ্নিবৃদ্ধিকরে, শীঘ্র জীর্ণ হয়, শরীরের পুষ্টি ও দার্ঢ্য সম্পাদন করে, বর্ণ পরিষ্কার করে। অতএব স্নিগ্ধ ভোজন করিবে, ছাতু, মুড়ি, চাউল ভাজা প্রভৃতি সতত ভোজন করিবে না।

---

* যামমধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যামমধ্যে রসোৎপত্তির্যামযুগ্মাদ্বলক্ষয়ং॥ (ভাবপ্রকাশ)
রাত্রৌচ ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রথমপ্রহরান্তরে।
কিঞ্চিদূনং সমশ্নীয়াৎ দুর্জ্জরং তত্র বর্জয়েৎ। (বাগ্ভট)

৩। পরিমাণক্রমে আহার করিবে। পরিমিত-ভোক্তার অজীর্ণাদি রোগ হইতে পারে না, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় না, শারীরিক ও মানসিক গ্লানি এবং আলস্য উপস্থিত হয় না। অতএব প্রতিদিন পরিমিত আহার করিবে; কদাপি অপরিমিত ভোজনে জীবন নষ্ট করিবে না।

৪। পূর্ব্বের আহার্য্য বস্তু উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে ভোজন করিবে। অজীর্ণে ভোজন করিলে ঐ ভোজ্যবস্তু বিষতুল্য হইয়া তৎক্ষণাৎ কিংবা কালক্রমে নানারোগ দ্বারা জীবন নষ্ট করে।

৫। বিরুদ্ধ বস্তু ভোজন করিবে না।

এই বিরুদ্ধ বস্তু, দেশ, কাল ও সংযোগ ভেদে ত্রিবিধ।

শীত প্রধান দেশীয় লোকের আহার চা, কাফি, মদ্য, মাংস, চর্ব্বি প্রভৃতি; তাহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে অপকারী। ইহাকে দেশ-বিরুদ্ধ বলে।

শীতকালের ব্যবহারোপযোগী উষ্ণবীর্য্য বস্তু গ্রীষ্মকালে অপকারী, আবার গ্রীষ্মকালের ব্যবহার্য্য বরফ প্রভৃতি ঠাণ্ডা বস্তু শীত কালে অপকারী, ইহাদিগকে কাল-বিরুদ্ধ বলে।

কতকগুলি বস্তু পৃথক্ অবস্থায় উপকারী কিন্তু মিলিত হইলে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অপকারী হয়। যথা—দুগ্ধ মৎস্যের সংযোগ এবং সমপরিমাণে ঘৃত মধুর সংযোগ। ইহাদিগকে সংযোগ-বিরুদ্ধ বলে। এই সংযোগবিরুদ্ধ বস্তু আহারে অজীর্ণ ও কুষ্ঠাদি রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব বিরুদ্ধ বস্তু কখনও ভোজন করিবে না।

৬। পবিত্রভাবে উপবিষ্ট হইয়া ভোজন করিবে।

কখনও হাটে-ঘাটে-মাঠে অনাবৃত অপবিত্র স্থানে আহার করিবে না। অপবিত্র স্থানে আহার করিলে মনের তৃপ্তি হয় না, আহার্য্য বস্তুও উত্তমরূপে জীর্ণ হয় না, বমি কিংবা বিবমিষা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ মলিন স্থানের দুষ্ট কীটাণু প্রভৃতি বাত-সঞ্চালনে ভুক্ত বস্তুর সহিত উদরস্থ হইয়া বহুবিধ উৎকট রোগোৎপাদন করিতে পারে। অতএব অপবিত্র স্থানে কখনও আহার করিবে না।

৭। অতিদ্রুত ভোজন করিবে না।

দ্রুত ভোজনে বমি হয় এবং আহার্য্য বস্তু উত্তমরূপে জীর্ণ হয় না। ধীরেধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া ভোজন করিবে। চর্ব্বণকালে দাঁতের গোড়া হইতে একপ্রকার লালা নির্গত হইয়া পরিপাকক্রিয়ার সাহায্য করিয়া থাকে।

৮। ভোজনকালে উচ্চহাস্য ও গল্পগুজব্ করিবে না।

আপনার হিতাহিতবস্তু বিচার করিয়া তন্মনা হইয়া মৌনাবলম্বনে আহার করিবে।

৯। বিষম আহার করিবে না।

কোনও দিন অল্প, কোনও দিন অধিক, কোনদিন এক প্রহরের সময় কোনদিন একপ্রহর বেলা থাকিতে, এইরূপে আহার করিবে না। প্রত্যহ একসময় এক পরিমাণে আহার করিবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীগিরিশ চন্দ্র সেন কবিরত্ন।

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে—ষটযোগ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বারিসার ধৌতি—আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জল মুখে লইয়া তাহা ধীরে ধীরে পান করতঃ উদর মধ্যে চালিত করিয়া অধোপথে রেচন করার নাম বারিসার ধৌতি। এইরূপ জলপান ক্রমশঃ অভ্যাস করিলে অন্ত্রমধ্যে (intestine) যতটুকু মল থাকে সমস্ত অপান পথে বাহির হয়। মলভাণ্ড পরিষ্কার রাখিবার জন্তই এই বারিসার যোগের ব্যবস্থা। শাস্ত্রে আছে, ইহাতে শরীর নির্ম্মল হইয়া দেবদেহ লাভ হয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে অনেক রোগের কারণই কোষ্ঠ অপরিষ্কার থাকা। মলভাণ্ড হইতে প্রত্যহ সঞ্চিত সমস্ত মল নির্গত না হইলে (যাহাকে সাধারণতঃ পেট্‌খোলাসা দাস্ত না হওয়া বলে) শরীরের সচ্ছন্দতা জন্মে না। তজ্জন্য জ্ঞান ও কর্ম্মবহা শিরাপথগুলি

পরিষ্কার থাকেনা। কাযেই কার্য্যে অমুদাম, শরীরের জড়তা, মাথাতার বিপর্য্যস্ত চিন্তা প্রভৃতি জন্মে, আর একটা অনির্ব্বচনীয় অস্বস্তিবোধ লাগিয়াই থাকে। বারিসার ধৌতিযোগে এসমস্ত রোগ বিদূরিত হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, এতদ্দ্বারা শরীর নির্ম্মল হয়।

বহিঃসার ধৌতি—শ্বাস বন্ধ করিয়া নাভি-গ্রন্থি মেরুপৃষ্ঠে একশতবার সংযুক্ত করিতে হয়। ইহাকে বহিঃসার ধৌতি বলে। ইহাদ্বারা উদরাময় বিদূরিত হইয়া জঠরাগ্নি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। বহিঃসার-ধৌতি যোগে সমানবায়ু ক্রিয়াশীল ও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সমানবায়ু সাম্যাবস্থায় থাকিলে পরিপাক যন্ত্রের কোনও ক্রিয়াবিকার ঘটিতে পারে না। উদরাময়াদিও বিদূরিত হয়।

দন্ত হইতে ক্লেদাদি নিষ্কাষণ এবং দন্তমূল দৃঢ়ীকরণার্থ দন্তমূল ধৌতির ব্যবস্থা। দন্তমূলে ক্লেদ সঞ্চিত থাকিলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, দন্তমূলের ক্রিয়া ভালরূপে হইতে পারেনা, তজ্জন্য দাঁত শীঘ্র নড়িয়া যায়। হঠযোগ শাস্ত্রে খদিরকাষ্ঠ, বিশুদ্ধ এটেল মাটি ও নিম্বের শাখাগ্র দ্বারা দন্ত ও দন্তমূল মার্জ্জনা করিতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি একত্র সন্নিবিষ্ট ও লম্বিত করিয়া গলার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া জিহ্বার মূলদেশ শনৈঃশনৈঃ মার্জ্জনা করিলেই জিহ্বামূল ধৌতিযোগ হইয়া থাকে। তৎপরে জিহ্বার উপরিভাগে জিব-আচড়া দ্বারা কর্ষণ করিয়া জিহ্বামল দুর করিতে হয়। ইহাতে অরুচি নষ্ট হয়, স্বাদ গ্রহণের শক্তি বৃদ্ধি হয়, জিহ্বার দীর্ঘতা ও বিশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ নিদ্রা হইতে উঠিয়া, ভোজন সমাপন করিয়া ও দিবাবসানে কপালরন্ধ্র ধৌতিযোগ হয়। এতদ্দ্বারা কফদোষ নষ্ট, নাড়ি বিশুদ্ধি ও দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

কলার মাইজ, হরিদ্রার মাইজ বা বেতের মাইজ গলদেশ দ্বারা অন্নবহা নালীপথে মুহুর্মুহুঃ প্রবেশ করাইয়া বাহির করিতে হয়। ইহাকে দণ্ডধৌতি বলে। ইহাদ্বারা শ্লেষ্মা, পিত্ত, ক্লেদ, প্রভৃতি নিষ্ক্রান্ত হয়, এবং হৃদ্রোগের বিনাশ হয়।

ভোজনান্তে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া জল পান করিবে। তৎপর কিয়ৎক্ষণ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে থাকিয়া সেই জল বমন করিয়া ফেলিতে হয়। ইহাই বমন

ধৌতিযোগ। কফপিত্ত জনিত দোষ ইহাদ্বারা নিবারিত হয়। অম্লপিত্ত শূলে এই যোগটি বড়ই উপকারী। যে সমস্ত অম্লপিত্ত-রোগীর আহারের পর শূল বেদনা আরম্ভ হয় তাহারাই এই বমন-ধৌতির দ্বারা বিশেষ উপকার লাভ করিয়া থাকেন। কিছুদিন এই বমন-ধৌতি অভ্যাস করিলে কেবল কতকগুলি শ্লেষ্মা সহ জলই উঠিয়া যাইবে, অন্নাদি ভুক্তদ্রব্য উঠিবে না। চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত খুব লম্বা চিক্কণ ও পরিষ্কার ১৫ হাত লম্বা বস্ত্রখণ্ড ধীরে ধীরে গিলিবে. এবং ধীরে ধীরে তাহা টানিয়া বাহির করিবে ইহাকে বাস-ধৌতি বলে। এই ধৌতি দ্বারা গুল্ম, জ্বর, প্লীহা, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা অসম্ভব ও কষ্টসাধ্য মনে হইলেও অভ্যাসের দ্বারা ইহা অতি সহজ হইয়া পড়ে।

বমনধৌতি, বাসধৌতি ও দণ্ডধৌতি এই তিন প্রকার ধৌতিদ্বারা হৃদ্‌প্রদেশস্থ শ্লেষ্মধরা কলা (Mucous membrane) সমূহ শোধিত হইয়া বায়ুপথ (Passage of the vital electricity) পরিষ্কার করিয়া দেয়, তজ্জন্য বায়ু অপ্রতিহতভাবে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে।

এইবার মূলশোধন বিষয়ে আলোচনা করিলেই ধৌতিযোগ সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ হয়।

প্রক্রিয়া (process) বিশেষ দ্বারা গুহ্যদ্বারদেশ (Anus) প্রক্ষালন করার নাম মূলশোধন। এতদ্দ্বারা অপান বায়ুর ক্রূরতা বিদূরিত হয়।

নেতিযোগ।—আধহাত পরিমাণ সূক্ষ্ম সূত্র নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং ধীরে ধীরে উহা মুখবিবর দিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে ইহাই নেতিযোগ। এতদ্দ্বারা শ্লেষ্মাদোষ নিবারণ ও দিব্য দৃষ্টি লাভ হয়। ঊর্দ্ধ-শ্লেষ্মার দোষে অনেক সময় নাসারোগ সকল উৎপন্ন হয়। নেতিযোগ দ্বারা সেই সমস্ত নাসারোগ (Nasal diseases) আরোগ্য হয়।

লৌলিকি যোগ।— বেগসহকারে উদরকে উভয়পার্শ্বে চালিত করার নাম লোলকি যোগ ইহা দেহাগ্নি বৃদ্ধি করে। দেহের অগ্নি বৃদ্ধি হইলে যে সর্ব্বরোগ নাশ হয় তাহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ ভূয়োভূয়ঃ বলিয়া গিয়াছেন। হঠযোগশাস্ত্রে ইহাকে সর্ব্বরোগনিহন্ত্রি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন।

ত্রাটক যোগ।— যতক্ষণ নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রুপাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্নিমেষনয়নে কোন একটি সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতে হয়। ইহাই ত্রাটকযোগ। ইহা অভ্যাস দ্বারা চক্ষুর পীড়া বিনষ্ট হয়, নিদ্রা তন্দ্রাদি বশীভূত হয় এবং চক্ষুরশ্মি নির্গমপ্রণালী প্রভৃতি বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

কপালভাতি তিন প্রকার—বাতক্রম কপালভাতি, ব্যুৎক্রম কপালভাতি ও শীৎক্রম কপালভাতি।

বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরণ করতঃ দক্ষিণ নাসায় সেই বায়ু টানিয়া বাম নাসায় তাহা রেচন করিতে হয়; ইহাই বাতক্রম কপালভাতি। ইহা অভ্যাসে কফদোষ নিবারিত হয়।

নাসিকারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা জল টানিয়া মুখ দিয়া সেই জল বাহির করিয়া দিবে, আবার মুখ দিয়া জল টানিয়া নাসিকা রন্ধ্রদ্বয়ে তাহা নির্গমন করাইয়া দিবে, ইহাকেই ব্যুৎক্রম কপালভাতি বলে।

শীৎক্রম কপালভাতিও প্রায়ই ব্যুৎক্রম কপালভাতির ন্যায়। শেষোক্ত দুইপ্রকার কপালভাতিই কফদোষ-নাশক। শেষোক্তটী অভ্যাসের দ্বারা দেহ কামতুল্য হয় এবং জরা ও বার্দ্ধক্য বিদূরিত হয়।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য চিকিৎসা শাস্ত্রে বস্তিপ্রয়োগ দ্বারা (Enema syringe) অন্ত্র হইতে সঞ্চিত মল বহিষ্করণ, ষ্টমাক পাম্প (Stomach pump অর্থাৎ আমাশয় ধৌত করিবার নিমিত্ত যন্ত্রবিশেষ) দ্বারা আমাশয় (stomach) বিশোধন করা, নস্যাদি প্রয়োগের দ্বারা উর্দ্ধগত বদ্ধ শ্লেষ্মা নির্গমন করা, গুল্ প্রভৃতি দ্বারা শরীরের দূষিত রস রক্তাদি বাহির করিয়া দেহ নির্ম্মল করা, কবল (gargle) প্রভৃতি দ্বারা গলদেশস্থ স্রোতপথ-সমূহ হইতে রুদ্ধ দূষিত শ্লেষ্মা বিদূরিত করা, ভাপ্‌ড়া প্রয়োগের দ্বারা ঘর্ম্ম নির্গমন, বমনাদি দ্বারা আমাশয়স্থ দূষিত পিত্ত, শ্লেষ্মা ও ভুক্ত দ্রব্যাদি বাহির করা এবং নেত্র কণিনীকা গত রোগ (disease of the Lachrymal apparatus) বিশেষে শলাকা দ্বারা ঐ কোণগত স্রোতপথ পরিষ্কার করা প্রভৃতি যে সমস্ত ক্রিয়াক্রমগুলির ব্যবস্থা আছে, তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিতে গেলে, প্রকারান্তরে, ধৌতিযোগ ভিন্ন আর কিছু বলিয়া মনে হইবে না। আমাদের দেশে কিন্তু হঠযোগের যাহা কিছু ক্রিয়া, সমস্তই অতি গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। কেবল "ঢাক্‌ঢাক্ গুড়্‌গুড়্"

ভাব। এই গোপন রাখার একটা দিক্ ভাল হইলেও মন্দের দিকটা এত বেশী যে, ফলে মূল বিষয়টাই একেবারে লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রচলন না থাকায় ইহার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এতটা বিকৃত হইয়াছে যে, যে সমস্ত স্থলে কচিৎ এই হঠযোগ ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বড়ই বিকৃতভাবে সাধিত হইয়া থাকে। অজ্ঞতা নিবন্ধন বিষমভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায়, প্রায়শঃই তদ্দ্বারা কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আজকাল ষটযোগের দ্বারা দেহ শোধন ব্যাপারটা একটা কিম্ভুত কিমাকার, সাধারণের দুর্ব্বোধ্য, অনাচরণীয়, শক্যাতীত অপার্থিব ব্যাপার বলিয়া ধারণা করা হইয়া থাকে। প্রাচীন ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রাচ্য যে কোনও বিষয়ের কথাই ভাবিনা কেন, তাহার প্রকৃত প্রাণ (life) টুকু দেখিতে পাই না। তত্তৎস্থলে কেবল আমাদের অনবুমেয় কোনও অজ্ঞেয় শক্তি ভিন্ন আর কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহাই আমাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের একতম কারণ।

উপরি উক্ত ষট্‌কর্ম্মের সমস্তগুলিই যে সর্ব্বদা অনুষ্ঠেয় তাহা নহে। যখন যেটি দরকার তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখা যাউক—অন্নবহা নালীর মধ্যে শ্লেষ্মধরা কলাগুলি দূষিত শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহা জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; তজ্জন্য আহারে অনিচ্ছা, অরুচি, বুকে ভারবোধ, অন্নপানাদি দ্রব্য গিলিতে বুকে বেদনা, হিক্কা, প্রভৃতি উপসর্গ জন্মিয়াছে। এস্থলে অন্নবহা নালীর অভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মধরা কলাগুলিকে সক্রিয় করিয়া জড়তা বিদূরিত করা প্রয়োজন। তজ্জন্য দণ্ডধৌতি করিলে অন্নবহা নালীর গাত্রে যে সমস্ত দূষিত শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা উঠিয়া যাইবে এবং দণ্ড সংস্পর্শে উহা বেশ স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হওয়ায় স্রোতপথগুলি নির্ম্মল হইবে। সুতরাং, শরীরস্থ বায়ু অপ্রতিহতভাবে বিচরণ করিতে সমর্থ হইবে। কাজেই বুকভার প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া দেহের কার্য্য এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের কার্য্যও সুষ্ঠু সম্পাদিত হইবে।

সকলেই ইহা বুঝিয়া থাকেন যে সমস্ত রাত্রি নিদ্রার পর যখন নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন মুখের অভ্যন্তর ভাগ জড়াবস্থায় থাকে। যে পর্য্যন্ত না দন্ত, দন্তমূল, জিহ্বা, জিহ্বামূল প্রভৃতি মুখাভ্যন্তরস্থ সমস্ত অংশ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা হয়, সে পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরটাই জড়ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। একমাত্র মুখ

প্রক্ষালন দ্বারাই যখন শরীরের ও মনের এতটা স্বচ্ছন্দতা জন্মিতে পারে, তখন ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা সমগ্র দেহ শোধিত হইলে শরীর ও মনের অবস্থা যে কি হয়, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

সংক্ষেপতঃ, আমরা শোধনাঙ্গ সমস্তই বিবৃত করিলাম। এই অঙ্গ শোধনের যোগ আলোচনায় আমরা ইহা দেখিলাম যে শরীরের যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শোধন করতঃ দেহকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহা এই ষট্‌কর্ম্মের দ্বারাই সংসাধিত হইতে পারে।

অতঃপর ক্রমশঃ ষটযোগে আসন ও প্রাণায়ামাদি বিষয়ের আলোচনা করিব।

শ্রীঃ—

পুনর্জ্জীবন।

আমরা "জীয়ন্তে মরার মত" হইতে শুনিতে পাই, তাহা আশ্চর্য্য জনক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মানুষ মৃত বলিয়া প্রতীত হইবার পর পুনর্জ্জীবন লাভ করিলে তাহা অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া মনে হয়। তথাচ এইরূপ ঘটনার কথা আমরা কখন কখন শুনিতে পাই। প্রাচ্য জগতে মহাকবি সেক্ষপিয়রও এইরূপ ঘটনার কথা স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জীবন লাভ সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকেই অনেক প্রকার গল্প শুনিয়া থাকিবেন, আমরাও অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া এই সম্বন্ধে নানা প্রকার গল্প শুনিয়াছি। সময় সময় তাহা অসম্ভব ও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইয়াছে; আবার সময়ে তাহা ভৌতিক ঘটনা বলিয়াও প্রতীত হইয়াছে। গল্প বলিতে বসিলে আমরা প্রায়ই ভাহার ভাবাবেশে দুই চারিটি মিথ্যা কিম্বা কাল্পনিক কথার ফোড়ন্ দিয়া গল্পটিকে বেশ সালঙ্কৃত করতঃ মনের মত সাজাইয়া গুছাইয়া বলিয়া থাকি। আবার যিনি শ্রোতা, তিনিও সময়ান্তরে অপরকে বলিবার সময় স্বকপোল-কল্পিত দুই চারিটি বুক্‌নি তৎসঙ্গে যোগ দান করিতে ছাড়েন্ না। এইরূপে সামান্য ঘটনাও নানা মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়ই অতি ভয়ঙ্কর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপারে পরিণত হয়। কিন্তু

বহুস্থলে ইহা অতিরঞ্জিত না হইয়াও প্রকৃত ঘটনাই প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ একটি প্রকৃত ঘটনার কথা এস্থলে উল্লেখ করিয়া এতৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উত্তরপাড়ার উত্তরে একটি গ্রামে চন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক এক যুবকের বাস। জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতা, ভগিনী, ভগিনীপতি, দুইটি ভাগিনেয় লইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার। জ্যেষ্ঠ সূর্য্যকুমার, গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক জমীদারের কাছারীতে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। চন্দ্রকুমার কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং তথায় থাকিয়া কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রদ্বয়ের শিক্ষকতা দ্বারা, এবং যে যৎসামান্য বৃত্তি পাইতেন তাহাতেই অতিকষ্টে তাঁহাদের সংসার চলিত।

একসময় তাঁহাদের গ্রামে অত্যন্ত ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই চন্দ্রকুমারের দুইটী ভাগিনেয় ও ভগিনী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এবং পরিশেষে চন্দ্রকুমারের ভগিনীপতি উক্ত পীড়াক্রান্ত হইলে চন্দ্রকুমারের নিকট সে সংবাদ পৌছিল। তিনি উক্ত সংবাদ পাওয়া মাত্র কয়েকটী ঔষধ সংগ্রহপূর্ব্বক গৃহে যাত্রা করিলেন। সূর্য্যকুমার সে সময় স্বীয় মুনিবের কোনও কার্য্যে ঢাকা গিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমারের অন্য আত্মীয় মধ্যে পৃথক অবস্থিত এক প্রাচীন জ্যেষ্ঠতাত ও তাহার পুত্র ব্যতীত 'মাথাধরা' পুরুষ আর কেহই ছিলেন না। তাহারা থাকিয়াও না থাকার সামিলে ছিলেন। মরার পূর্ব্বে কাহারও খোঁজখবর লওয়া তাহারা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিতেন না। বলা বাহুল্য তাহারা একান্নভুক্ত না থাকায় একটা বিশেষ পৃথক ভাব তাহাদের মনে সর্ব্বদা বিরাজিত ছিল। অধিকন্তু চন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা ঘোরতর মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত গুণ্ডা বলিয়া গ্রামে বিখ্যাত ছিলেন।

চন্দ্রকুমার বাটী আগমনপূর্ব্বক ভগিনীপতির যথারীতি চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত পরদিবস প্রত্যূষে তাহার ভগিনীপতি ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। তাহাকে দাহ করিয়া আসিয়া চন্দ্রকুমার স্বয়ং সেইরাত্রে উক্ত পীড়াক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। এবং সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে চন্দ্রকুমারের অবস্থা যাহা দাড়াইল তাহাতে সকলেই তাহাকে

মৃত বলিয়া স্থির করিলেন। চন্দ্রকুমারের সেই জ্যেষ্ঠতাতভ্রাতা ও কতিপয় প্রতিবেশী যুবক চন্দ্রকুমারকে মৃতবোধে তাহার শোকসন্তপ্তা মাতার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দাহ করিবার জন্য শ্মশানে লইয়া গেলেন। ঐ দিবস আকাশ অতিশয় মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। শবদেহ শ্মশানস্থ করা মাত্র প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইল। শববাহিগণের মধ্যে কেহই চন্দ্রকুমারের জন্য বিজন শ্মশানে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে থাকিবার মত আত্মীয় ছিলেন না। তাহারা দুর্য্যোগ দেখিয়া চন্দ্রকুমারকে শ্মশানে ফেলিয়া নিকটস্থ এক শৌণ্ডিকালয়ে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

এদিকে চন্দ্রকুমারের মৃতকল্প দেহ শ্মশানের মধ্যে বৃষ্টিতে পড়িয়া ভিজিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে অকস্মাৎ চন্দ্রকুমারের জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি ঐ ভাবে শ্মশানে নিজকে অবস্থিত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। যদিও তাহার জীবনীশক্তি নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পরিয়াছিল, তথাপি উত্তান ভাবে শয়ন করিয়া খরতর বৃষ্টিবারিধারার আঘাত সহ্য করা কষ্টকর হওয়ায় অতিকষ্টে ধীরে ধীরে শ্মশান শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন এবং নিজ ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে করিতে সভয়ে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে বৃষ্টিবর্ষণ কমিয়া আসিল। তিনি দেখিলেন, শ্মশানের একপ্রান্ত হইতে প্রজ্বলিত মশাল হস্তে একব্যক্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। চন্দ্রকুমার শারীরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত উঠিয়া পলায়ন করিতে পারিলেন না। কাযেই তিনি অতিক্ষীণ কাতরকণ্ঠে বলিলেন "আপনারা আমাকে মৃত মনে করিয়া শ্মশানে আনিয়াছেন বটে কিন্তু এখন ও আমার জীবন আছে। আমাকে পিশাচ বা দানোতে পায় নাই; তাহা মনে করিয়া আপনারা আমাকে বধ করিবেন না"। সভয়ে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তিনি দেখিলেন যে মশালধারী ব্যক্তি একজন জটাজূটযুক্ত সন্ন্যাসী। তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্রকুমার প্রণাম করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন, কেবল জীবন লাভাশায় "আমায় রক্ষা করুন" বলিয়া তাহার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী চন্দ্রকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক তাহার সকল অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। যোগিবর কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিয়া 'কিছু ভয় নাই' বলিয়া চন্দ্রকুমারকে অতি সাবধানে স্কন্ধোপরি উঠাইয়া লইয়া নদীর ধার দিয়া

বরাবর উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে যে মশাল ছিল তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল এবং তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মশাল নিবিয়া গেল এবং সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন রজনীর ঘোরান্ধকারে সন্ন্যাসীর পথ চলা কষ্টকর হইতে লাগিল। এইরূপ কষ্টে চলিতে চলিতে হঠাৎ সন্ন্যাসী এক জলপূর্ণ বৃহৎ গহ্বরে পতিত হইলেন।

এদিকে যাঁহারা শ্মশানে শবদেহ ফেলিয়া শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সুরাপান আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎকাল মধ্যে তাঁহাদের কেহ কেহ অবশ হইয়া সেখানেই শুইয়া পড়িলেন, কেহ বৃষ্টি থামিলে 'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' বিবেচনায় গৃহাভিমুখী হইবার উদ্যোগ করিলেন। পরিশেষে অনেক যুক্তি পরামর্শের পর শ্মশানে গমন করিয়া শব দেহটা গঙ্গায় টান মারিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় প্রস্তাব স্থিরীকৃত হওয়ায় তাহারা শ্মশানে গমন করিলেন। তথায় শূন্যখট্টা দেখিয়া সভয়ে সকলে একে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ ত্বরিতপদে চন্দ্রকুমারের বাটীতে যাইয়া 'বলহরি হরিবোল' বলিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অগ্নিস্পর্শ ও মুখে নিমপাতা কাটিয়া আপনাপন গৃহে গমন করিলেন। চন্দ্রকুমারের বৃদ্ধা জননী পুত্র শোকে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।

অপর দিকে সন্ন্যাসী চন্দ্রকুমারকে সহ বহুকষ্টে জলপূর্ণ গহ্বর হইতে উঠিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। এই পতনে চন্দ্রকুমারের মস্তিষ্কে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল এবং তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী একখানি পুরাতন বাটীতে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রকুমারের সংজ্ঞাহীন দেহ একটি গৃহে রক্ষা করিলেন, পরে তাহার সিক্ত বস্ত্রাদি অপসারিত করিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করাইলেন। এবং উত্তাপ ও ঘর্ষণাদি দ্বারা বহু কষ্টে ২৪ ঘণ্টার চেষ্টায় তাহার চৈতন্য সম্পাদন করাইলেন। পরে নিকটস্থ গৃহ হইতে উপযুক্ত পথ্য প্রদান করিয়া ও অনেক ব্যক্তির প্রতি তথায় পরিচর্য্যার ভার দিলেন এবং স্বয়ং চিকিৎসোপযোগী ঔষধাদি আহরণার্থ প্রস্থান করিলেন। বহু অনুসন্ধানে সেই দিবস সন্ধ্যার সময় ঔষধাদি আনয়ন করিয়া যথানিয়মে সেবন করাইলেন। এক সপ্তাহকাল চিকিৎসা করতঃ চন্দ্রকুমারকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করাইয়া সেই শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী কোনও লোকের সঙ্গে চন্দ্রকুমারকে

তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। মৃতপুত্রকে পাইয়া শোকসন্তপ্তা জননীর যে কি পর্য্যন্ত আনন্দানুভব হইয়াছিল তাহা লিখিয়া বর্ণন করা অসম্ভব।

আমরা অনেক সময় এইরূপ অদ্ভুত জীবনলাভ সমাচার শ্রবণ করিয়া থাকি। এমনও শুনিয়াছি যে, মরা কান্ধে করিয়া লইয়া যাইবার সময় সে কখনও কখনও বাহকের চুলের মুঠি ধরিয়া থাকে, কখনও চিতার উপর হইতে মরা উঠিয়া পড়িতে দেখা যায়, কচিৎ বা শবদেহ রাখিয়া শ্মশানবন্ধুগণ অন্যমনস্ক হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিলে মরা খাট হইতে উঠিয়া ইতস্ততঃ গমন করে। এমন কি কখন কখন মরা, গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া থাকে বলিয়াও শুনিয়াছি। এরূপ স্থলে শববাহিগণ প্রকৃত বিবরণ কি, না বুঝিয়া, মরা দানো পাইয়াছে মনে করিয়া অস্ত্রাঘাতের দ্বারা প্রায়ই তাহার বিনাশ সাধন করিয়া থাকেন। পরন্তু, আমাদের বিশ্বাস, যে আমরা যখন মানুষের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে করি, হয়তো অনেক সময় তাহা ঠিক মৃত্যু নহে। পুনর্জ্জীবনলাভ ব্যাপার অসম্ভব মনে না করিয়া দানোপ্রাপ্ত দেহের সুস্থতা সম্পাদন সম্ভবপর কিনা ইহা সকলেরই একবার পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য; অথবা মরদেহসর্ব্বস্ব মোহান্ধ মানব যদি অগত্যাপক্ষে শবদেহের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া দেহের উপর কোন অত্যাচার না করিয়া শ্মশানত্যাগ করতঃ চলিয়াও আসেন, তাহা হইলে হয়ত এইভাবে জীবহত্যা হয় না। ভ্রমান্ধ মানব মাত্রেরই ভ্রম ধারণা হইয়া থাকে। এই ভ্রম ধারণাই দানবপ্রকৃতি মানবকে দানো করিয়া রুগ্নরহত্যা ব্যাপারে প্রবৃত্ত করাইয়া থাকে। যাহা 'দানো' পাওয়া বলিয়া উক্ত হয়, তাহা চিকিৎসা শাস্ত্রের বা সাধারণ মনোবুদ্ধি ও জ্ঞানের অতীত কোনও অবস্থা হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া এই দানো পাওয়া রোগীর মাথায় কুঠারাঘাত করা উহার চিকিৎসা হইতে পারে না।

ভরসা করি, পাঠক মহোদয়গণ দানো পাওয়ারূপ ভ্রম ধারণাকে মন হইতে একেবারে বিদূরিত করিয়া এবং এইরূপ ক্ষেত্র উপস্থিত হইলে একদিন মরিতে হইবে ইহা ভাবিয়া সাহসপূর্ব্বক দানোপ্রাপ্ত দেহে জীবন সঞ্চারের চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে একদিন একটী মহামূল্য জীবন রক্ষা করিয়া মৃতকল্পব্যক্তি ও তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট কৃতজ্ঞতা ও অক্ষয় যশোলাভে সমর্থ হইবেন।

শ্রী :—

যক্ষ্মা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

যক্ষ্মা রোগীদের কথনও কাশি দমন করা উচিত নহে। কাশি দ্বারা কফ উত্থিত হয় বলিয়া উহা দমন না করিয়া বরং উহার বৃদ্ধির চেষ্টা করা উচিত।

নৌকাযোগে নদীবক্ষে বিচরণ কি বাস এবং স্থান পরিবর্ত্তন ও পারিপার্শ্বিক যাবতীয় দ্রব্যাদির সংস্রব ত্যাগ, প্রত্যেক রোগীর পক্ষেই বিশেষ হিতকর।

রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা, মানসিক উদ্বেগ, মাদক দ্রব্য সেবন, অধিক ধূমপান ইত্যাদি যাহা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিজনক তাহা যক্ষ্মা-রোগীদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। যক্ষ্মা রোগীদের কথনও থিয়েটার কি সভাসমিতি ইত্যাদি জনাকির্ণ স্থানে যাওয়া উচিত নয়। উহাদের পক্ষে বিশ্রাম বিশেষ দরকার। যে কোনও উপায়ে হউক রোগীর শক্তি সংরক্ষণ ও বর্দ্ধন করা আবশ্যক। রোগীর দেহের ভার বৃদ্ধি হইলে এবং নিজকে সবল বোধ করিলে, সে আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে বুঝিতে হইবে।

বিশুদ্ধ বায়ু, পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যায়াম, বিশ্রাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি যাহা দ্বারা যক্ষ্মারোগে আরোগ্য লাভ সম্ভব, একমাত্র খাদ্য ব্যতীত তৎসমুদয়ই দরিদ্র ব্যক্তিগণেরও অতি সহজলভ্য। যে সমস্ত ব্যক্তি দিবসে অধিকাংশ সময় বিষয়কর্ম্মের জন্য নিতান্তই বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ইত্যাদি করিতে অক্ষম তাহাদেরও দিবসের অবশিষ্ট সময় এবং রাত্রিকালে ঐ সমস্ত করিতে কোন বাধা নাই।

"নিউমেটিক চেম্বার" (pneumatic chambers) নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে। উক্ত যন্ত্রসাহায্যে ঘনীভূত (Compressed) বায়ুর নিশ্বাস গ্রহণ এবং প্রয়োজনানুসারে তরলীকৃত (Rarified) অথবা ঘনীভূত বায়ুতে প্রশ্বাস ত্যাগ করা যায়। ঘনীভূত বায়ুর অত্যধিক চাপ বশতঃ নিশ্বাস গ্রহণ কালে ফুসফুসের যাবতীয় বায়ু. কোষগুলির মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিয়া

উহাকে সম্পূর্ণভাবে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া থাকে এবং তরলীকৃত বায়ুতে প্রশ্বাস ত্যাগকালে ফুসফুস মধ্যস্থিত সমস্ত বায়ু বহির্গত হইয়া ফুসফুসটাকে সম্পূর্ণভাবে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। ইহাতে ফুসফুসের মধ্যে কোন প্রকারেও স্থির বায়ু থাকিতে পারেনা এবং শ্লেষ্মাদি বহির্গত হইয়া থাকে। ঘনীভূত বায়ুতে প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে প্রশ্বাস দীর্ঘ হয়। যেহেতু প্রশ্বাস সহজে বহে না, শ্বাস এবং প্রশ্বাসের মধ্যে বিরামকাল দীর্ঘ হয়, সুতরাং মিনিটে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কম হয়। বিশুদ্ধ বায়ুতে থাকিয়া এই যন্ত্র ব্যবহার করিলে অপর্য্যাপ্ত বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের সমস্ত উপকারিতাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দারা একস্থানে বসিয়া অল্প সময়ে খুব সুন্দর ভাবে ফুসফুসের ব্যায়ামের (Lung gymnastic,) কার্য্য সাধিত হয়। হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটীস, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে অতি যোগ্যতার সহিত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাধির অত্যুৎকট অবস্থায়ও ইহা ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

য়ুরোপে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন আছে। তথায় অনেক স্থলে নিউমেটিক চিকিৎসালয়ও প্রতিষ্ঠিত আছে। আবশ্যক হইলে এই যন্ত্রে ক্রিয়জোট ইত্যাদি রাখিয়া তাহার আঘ্রাণও নেওয়া যায়। এতদ্বিষয়ক আকাশ বহনযোগ্য বিবিধ যন্ত্রও উদ্ভাবিত হইয়াছে। "Translation of Octe's Respiratory Therapeutics" (By I. Burney yeo M. D, F. R. C. P.) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। উক্ত গ্রন্থকারের লিখিত A manual of Medical Treatment V. I. P. 556, 580, 692) নামক পুস্তকেও ইহার বিবরণ আছে। মূল্যাধিক্য বশতঃ এই যন্ত্রলাভ দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে অসম্ভব। মুক্ত বায়ুতে উত্তমরূপে প্রাণায়াম করিলেও ইহার সমস্ত উপকারিতাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের উত্তমরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করা ভাল।

যক্ষ্মারোগে আরোগ্য বিষয়ে যে সমস্ত ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা গেল, কেবল তৎসমুদয় যথাযথরূপে পালন করিলেই ইহা হইতে আরোগ্য লাভ সম্ভবপর। এই সমস্ত ব্যবস্থা কাহারও কাহারও নিকট অতি কঠোর বলিয়া বোধ হইবে বটে, কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যতিরেকে যক্ষ্মারোগ হইতে আরোগ্য লাভের জন্য

কোনও উপায় নাই। অন্ততঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আজ পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই। ঔষধ পত্র দ্বারা অথবা অন্য কোনও উপায়ে যাহারা এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভের আশা করেন তাহাদের আশা দুরাশা মাত্র।

দুই তিন মাস বয়স হইতে চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে কোন সময়েই মানুষ এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। তবে বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক এই ব্যাধি কর্ত্তৃক অনেক কম আক্রান্ত হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশবাসিগণের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ খুব কম। গর্দ্দভ এবং ছাগলের মধ্যে এই ব্যাধি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগ আরোগ্যার্থে যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করা গেল, কোন সুস্থ ব্যক্তি তৎসমুদয় প্রতিপালন করিয়া চলিলে স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিতে পারে। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে ঐ সমস্ত নিয়মাদি পালন করিয়া চলা আবশ্যক।

প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বাড়িয়া যায় বলিয়া ইহা এখানে শেষ করা গেল। প্রাণায়াম, অন্তর্দ্ধৌতি, ইত্যাদি বিষয়ে বারান্তরে যৎকিঞ্চিৎ বলিবার বাসনা রহিল।

উপসংহারে, যে তিনটী বিষয়ের উপর প্রধানতঃ যক্ষ্মারোগীর স্বাস্থ্যলাভ নির্ভর করে তাহা পুনরায় সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। দিবা রাত্রি সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা এবং পুনঃ পুনঃ গভীর শ্বাস গ্রহণ করিয়া ফুসফুসের বলবৃদ্ধি করা।

২। প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা দৈনন্দিন শারীরিক ক্ষয়পূরণ করিয়া শক্তি সঞ্চয় করা।

৩। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা এবং সর্ব্বাঙ্গীণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগীদিগের জন্য বহু স্বাস্থ্যনিবাস (Sanitorium) স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। স্বাস্থ্যনিবাসে রোগীদিগের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হইতে হয় বলিয়া তথায় থাকিয়া তাহারা অতি অল্পসময়ে আরোগ্যলাভ করিতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়।

পলাণ্ডু।

জাতি—লিলিয়েসী জাতীয় য়্যালিয়াম সিপা (Allium cepa) নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের স্থূল মূলকে পলাণ্ডু বা পেঁয়াজ বলে।

উৎপত্তি—পিঁয়াজ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই জন্মে। ভারতে সাধারণতঃ দুই প্রকার পেঁয়াজ দেখিতে পাওয়া যায়। একপ্রকার বোম্বাই ও জিপ্সিয়া জাত পিঁয়াজ নামে অভিহিত। ইহা দেখিতে ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ। অপর প্রকারকে পাটনাই পেঁয়াজ বলে। ইহার আকৃতি আলুর ন্যায় বড়। ইহার ভিতরের আইসের বর্ণ সাদা, কিন্তু উপরের গাত্রের ছাল পাংশু লোহিতবর্ণ হয়। হিমালয় পর্ব্বতে এক জাতীয় (Allium leptophyllam) পেঁয়াজ জন্মে তাহা সাধারণ পেঁয়াজ অপেক্ষা বেশী ঝাল। সাইবেরিয়া রাজ্যে একজাতীয় পলাণ্ডু উৎপন্ন হয় তাহার নাম (Stone leek or rock onion—Allium fistulosum) পাহাড়ে পেঁয়াজ। য়ুরোপে এই জাতীয় পেঁয়াজের ব্যবহারই অধিক। পরু নামক একপ্রকার পলাণ্ডু (Allium Porum) ইজিপ্ট দেশে জন্মে। আরবে ইহাকে কিরাথ বলে। উত্তর পশ্চিম হিমালয় খণ্ডে লাহোল পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে জঙ্গলি পেঁয়াজ (Allium Rubilium) নামে এক প্রকার পেঁয়াজ জন্মে, ইহার পত্রগুলি অপেক্ষাকৃত সরু। এতদ্ভিন্ন স্থানবিশেষে বারুণি পিঁয়াজ ও চিরি পিঁয়াজ নামে আরও দুই প্রকার পিঁয়াজের নাম শুনা যায়। এতদ্দেশে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পিঁয়াজের চাষ হয় এবং ফাল্গুন ও চৈত্রমাসে ইহা পরিপুষ্ট হয়।

পর্য্যায়—মুকন্দক, লোহিতকন্দ, তীক্ষ্ণকন্দ, উষ্ণ, মুখদূষণ, শূদ্রপ্রিয়, কৃমিঘ্ন, দীপন, যবনেষ্ট, মুখগন্ধক, বহুপত্র, বিশ্বগন্ধ, রোচন, সুকুন্দক এইগুলি সমস্তই পলাণ্ডুবোধক।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—ফারক্রয় ও ভকেলিন্ (Fourcroy and Vanquelin) নামক ডাক্তারদ্বয় কিমিয়া বিদ্যার (Chemistry) সাহায্যে পিঁয়াজের বিশ্লেষণ (Analysis) করিয়া দেখিতে পান যে ইহাতে গন্ধক, অণ্ডলাল (Albumen) চিনি, ফস্ফরিক এসিড্, সাইট্রেট অব লাইম্ ও লিগ্‌নিন্ পদার্থ আছে। মদিরার ন্যায় পিঁয়াজের রসও গাজিয়া উঠে। ইহার

তৈলে অ্যালিল্ সালফাইড (Allyl Sulphide) (১) আছে। পিঁয়াজের মূল বা কন্দ হইতে কটু আস্বাদযুক্ত তৈল পাওয়া যায়।

দেশভেদে নাম—বাঙ্গলা—পিঁয়াজ, পেঁয়াজ ; হিন্দি—পিঁয়াজ ; আরবি—জল্ ; পারসি—পীয়াজ ; সিন্ধু ও গুজরাত্তি—ডুঙ্গরী, বোম্বাই—পিঁয়াজ, কন্দ ; মহারাষ্ট্র ও কচ্—কান্দা ; তামিল—বেল্ল বেঙ্গায়েম, ইরুল্লি, ইরবেঙ্গায়ম ; তেলেগু—বুল্লিগড্ডলু, নিরুল্লি ; কনাড়ি—বেঙ্গায়ম, নিরুল্লি, কম্বলী ; মলয়দেশ—বাবঙ্গ ; সিঙ্গাপুর—লূন্থ ; ইংরাজী—অনিয়ন্ ; ফরাসি—অয়েগ্নন্ এবং জার্ম্মেনিতে জ্যুরিবেল্ক বলে।

গুণ—আয়ুর্ব্বেদ মতে পলাণ্ডু কটুমধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রোচন, বলকর, মাংস ও শুক্রবর্দ্ধক, সারক, পাচক, ভগ্নসন্ধানকর, কণ্ঠশোধক, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বায়ু ও কফনাশক, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক চক্ষুর হিতকর, কামোদ্দীপক, বমনদোষ নাশক, এবং রসায়ন (Tonic) গুণযুক্ত। পাশ্চাত্যমতে ইহার তৈল শ্লেষ্মা নিঃসারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও চেতনাজনক। কাঁচা পিঁয়াজ খাইলে রজোনির্গম ও মূত্রোদ্গম হয়। কাঁচা পিঁয়াজের রস নিদ্রাকারক, পাথরে পিঁয়াজ (Stone Leek) দর্পকারক।

আময়িক প্রয়োগ—পিঁয়াজ আয়ুর্ব্বেদ মতে হৃদ্‌রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফরোগ নাশক। জ্বর, উদরী, সর্দ্দি (catarrh) কাস (chonic Bronchitis) বায়ুশূল (Neuralgia) ও রক্ত পিত্ত রোগে সচরাচর ব্যবহার হয়। উদরাধ্মান রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

বৃশ্চিক বোলতা প্রভৃতির দংশনে পেঁয়াজ ঘসিয়া রস লাগাইলে জ্বালা উপশমিত হয়।

পিয়াজের কোয়া উত্তপ্ত করিয়া কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়। পেয়াজ ছেঁচিয়া তাহার রস গরম করতঃ কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিলে বেদনার উপশম হয়।

মূর্চ্ছারোগে (fainting and hysterical fits) ইহার উগ্রগন্ধ smelling salt এর কার্য্য করে। ইহাতে অন্ত্রস্থ পেশী সমূহের ক্রিয়া বলবান রাখে এবং কখনও তাহাতে অবসাদ জন্মিতে দেয় না।

(১) $(C_3H_5)_2S$

কামলা (Jaundice) অর্শ, গুদভ্রংশ ও অলর্ক (Hydrophobia) রোগে ইহা বিশেষ ফল প্রদান করে।

ইহা ব্যবহারে পালাজ্বর নিবারিত হয়। সামান্য সর্দ্দিতে পিঁয়াজের কাথ ও গলক্ষত রোগে ভিনিগারের সহিত ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।

পিঁয়াজের রস ও সরিসার তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনকরিলে গেটেবাত আরোগ্য হয়।

পাগলা কুকুরে কামড়াইলে ক্ষতস্থানে টাটকা পিঁয়াজের রস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হয়। আভ্যান্তরিক প্রয়োগে শীঘ্র শীঘ্র ক্ষত আরোগ্যের সম্ভাবনা।

ডাঃ এল, কেমিরন্ সাহেব বলেন, যাহারা পিঁয়াজ খায় তাহাদের শীতাদ (Scurvy) রোগ জন্মে না।

পিঁয়াজের রস ৪ হইতে ৮ ড্রাম ২ ড্রাম চিনির সহিত মিশাইয়া রক্ত-ক্ষরণশীল অর্শরোগীকে সেবন করাইলে আশুফল দর্শে। মাত্রা অর্দ্ধ আউন্স। দিনে দুইবার সেবনীয়।

দুইবেলা এক একটি করিয়া দুইটি পিঁয়াজ কাল মরিচের বীজের সহিত সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জনিত জ্বর আরোগ্য হয়।

কোনও একটি পাত্রে পিঁয়াজ কিছুদিন বন্ধ রাখিয়া পরে সেই পিঁয়াজপূর্ণ পাত্র গোময়রক্ষিত জমির নিম্নে চারিমাস কাল পুতিয়া রাখিলে পিয়াজের কামোদ্দীপক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১ গ্রেণ বা ½ রতি অহিফেন পিঁয়াজের কোষের মধ্যে পুরিয়া উত্তপ্ত ছাই সংযুক্ত অগ্নিতে অর্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া রোগিকে সেবন করাইলে কঠিন আমরক্তের উপশম হয়।

তিনটি পিঁয়াজের কোয়া একমুঠা তেঁতুল পাতার সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার রস সেবন করিলে বিরেচনের কার্য্য করে। আমবদ্ধ অবস্থায় এই বিরেচক প্রযোজ্য।

পিঁয়াজের টাটকা রস সূর্য্যাবাত বা সর্দ্দিগর্ম্মীগ্রস্থ রোগীর গাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আমাশয়ের (Stomach) হজমশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য পশ্চিমদেশে বালক বালিকাগণকে পিঁয়াজ পুড়িয়া খাওয়ান হয়। উত্তর ভারতবাসিগণ

গ্রীষ্মকালে আপনাপন পুত্রকন্যাদিগকে উত্তপ্ত লু বায়ু হইতে রক্ষা করিবার জন্য গলায় পিয়াজ বাঁধিয়া দেয়।

নোয়াখালী অঞ্চলে বিসূচিকা রোগে পিয়াজের মালা গাঁথিয়া গলায় পরাইয়া দেয় অথবা দ্বারদেশে ঝুলাইয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস, পিঁয়াজে ওলাউঠা প্রতিষেধকগুণ আছে। বাস্তবিকপক্ষে পিঁয়াজ দুর্গন্ধহারক, বাতাসে দুর্গন্ধ জনিত অস্বাস্থ্যকরগুণসমষ্টি ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের উৎপত্তির কারণ এবং শরীরের হানিজনক। পিঁয়াজ ঐরূপ দূষিত বায়ু বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম।

ভিনেগারের সহিত পিয়াজ সেবনে প্লীহা ও অজীর্ণ রোগের উপশম হয়। ইহার গন্ধ অত্যন্ত তীব্র, পেঁয়াজসেবীর গাত্র হইতে সর্ব্বদা পেঁয়াজের গন্ধ পাওয়া যায়। একদিন পিঁয়াজ খাইলে পরদিন মলমূত্র হইতেও তাহার গন্ধ পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে পলাণ্ডুসেবন দ্বিজাতিগণের পক্ষে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রমাণ যথা—পলাণ্ডুং বিট্‌বরাহঞ্চ ছত্রাকং গ্রামাকুক্কুটং।

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব জগ্ধাচান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥ (স্মৃতি)

মনুও লিখিয়াছেন—

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানিচ।

অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবানিচ। (মনু—৫।৫)

পিঁয়াজের এতগুলি গুণ বর্ত্তমান থাকিতেও শাস্ত্রে এইরূপ নিষেধের কারণ কি? অনুসন্ধানে বোধ হয়, পিঁয়াজের কামোদ্দীপক ও তমোগুণবর্দ্ধক শক্তি অত্যন্ত বেশী বলিয়া তাহা আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে বাধাজনক এইরূপ বোধেই নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হইয়াছে।

যাহাই হউক, প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে পিঁয়াজের যে সমস্ত গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রয়োজন স্থলে ইহা যে ব্যবহার করা একেবারে অনুচিত তাহা মনে হয় না। এসম্বন্ধে বিচার বিতর্ক ধর্ম্মসংস্কারকগণ করিবেন। আমাদের ঐ বিষয়ে কিছু আলোচনা, বর্ত্তমান প্রবন্ধের গণ্ডীর বাহিরে। আমরা কেবলমাত্র পেঁয়াজের গুণাগুণ লইয়াই এস্থলে আলোচনা করিলাম।

শ্রীচন্দ্রকান্ত দাশগুপ্ত, ডাক্তার।

মুষ্টিযোগ।

(গর্ভপাত জনক বেদনায়)

ললনাগণের অন্তঃসত্ত্বাবস্থা কাল বড়ই ভয়াবহ। এই সময় আহার বিহারাদি নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রমে নানাপ্রকার প্রাণান্তকর রোগের আক্রমণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে গর্ভপাত একটি প্রধান রোগ। এই রোগের সূচনা মাত্র বিশেষ চেষ্টা না হওয়ায় কত গৃহ গৃহিনী শূন্য, কত বালক-বালিকা মাতৃহীন এবং কত জীবন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে ?

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অগাধ জলধি বিশেষ। ইহাতে অতি কষ্টসাধ্য দুষ্প্রাপ্য ঔষধ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য মুষ্টিযোগ ঔষধ পর্য্যন্ত সমস্তই বর্ত্তমান আছে। কোনটিই অসার বা নিষ্ফল নহে। আবার আমাদের গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা এমন অনেক মুষ্টিযোগ জানেন, তাহা কোন্ সময়ে কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়া কতকাল যাবৎ প্রতিগ্রামে স্ত্রীলোক ও নিরক্ষর চাষাভুষাদের মুখে মুখে পুরুষ পরম্পরায় প্রচলিত রহিয়াছে বুঝা যায় না। আজ গর্ভপাতসম্ভব গর্ভশূলে প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এইরূপ কয়েকটী মুষ্টিযোগ পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

গর্ভশূলে।

১ম মাসে—(ক) রক্তচন্দন, শুলফা, কাঠমল্লিকা ফুল ও চিনি প্রত্যেক ।॰ সিকি তোলা আতপ চাউল কচ্‌লান জলের সহিত বাটিয়া অর্দ্ধ পোয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। (খ) কৃষ্ণতিল, পদ্মমূল, চিনি, মধু ও দুগ্ধ প্রত্যেক ॥ তোলা মাত্রায় একত্রে বাটিয়া ৮ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সেব্য।

২য় মাসে—(ক) শ্বেতপদ্মের মূল, পানিফল (সিঙ্গারা), ও পদ্মকেশর প্রত্যেক ১ তোলা মাত্রায় বাটিয়া ১২ তোলা আতপ চাউলের জল সহ মিশাইয়া সেবনীয়। (খ) নীলোৎপলের (নীলপদ্মের) মূল, পানিফল, পদ্মকেশর প্রত্যেক ১ তোলা বাটিয়া, ১২ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেব্য।

৩য় মাসে—(ক) রক্তোৎপলমূল, শ্বেতপদ্ম ও কুড় প্রত্যেক ॥ অর্দ্ধ তোলা একত্রে বাটিয়া ৮ তোলা দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। (খ) কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী ও পুরাতন তেঁতুল প্রত্যেক ॥ অর্দ্ধ তোলা উষ্ণজল সহ মর্দ্দন করিয়া শীতল জলের সহিত সেব্য। এই ঔষধ জীর্ণ হইলে রোগীকে পথ্য দিবে।

চতুর্থ মাসে—(ক) নীলোৎপলের মূল ॥ তোলা, কণ্টকারী ॥ তোলা গোক্ষুর ॥ তোলা একত্রে বাটীয়া ৮ তোলা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেব্য।

পঞ্চম মাসে—(ক) পদ্মমূল ॥ তোলা, নীলোৎপল ॥ তোলা, যষ্টিমধু ॥ তোলা, চিনি ॥ তোলা ও কৃষ্ণতিল ॥ তোলা একত্রে বাটীয়া ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ঔষধ এক ছটাক শীতলজলের সহিত সেব্য। (খ) কুম্ভকার, চক্র ঘুরাইবার কালে তাহার হাতে যে মৃত্তিকালগ্ন হয়, সেই মৃত্তিকা ১ তোলা, ছাগদুগ্ধ ৪ তোলা ও মধু ১ তোলা একত্রে পান করিবে।

ষষ্ঠ মাসে—(ক) টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ॥ তোলা একত্রে বাটিয়া ৮ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। (খ) কাশ (কেশে), কুশ, ভেরেণ্ডার মূল এবং গোক্ষুর প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা উত্তমরূপে থেতলাইয়া /১ সের জল ও একপোয়া দুগ্ধসহ জাল দিয়া একপোয়া থাকিতে ছাকিয়া তৎসহ একতোলা চিনি মিশ্রিত করতঃ পান করিলে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায়।

সপ্তম মাসে—(ক) শতমুলী ১॥ তোলা, পদ্মমৃণাল ১॥ তোলা একত্রে বাটীয়া ১২ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সেবনীয়। (খ) কয়েতবেলের মুলের ছাল, শুপারির কঁচি শিকড়, লালধানের খৈ ও চিনি প্রত্যেক ॥ তোলা একত্রে উত্তমরূপে বাটিয়া তাহা ৮ তোলা দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সেব্য।

অষ্টম মাসে—(ক) আতপচাউল ২ তোলা, চাউলেরজল ১ তোলা সহ একত্র ভক্ষণ করিতে হইবে। (খ) পলাশবৃক্ষের সুপক্কপত্র ১॥ তোলা, শীতলজল ৬ তোলাসহ বাটিয়া সেব্য।

নবম মাসে—(ক) ভেরেণ্ডারমূল ॥ তোলা ও কাকোলী ॥ তোলা, শীতলজল চারিতোলাসহ বাটিয়া সেব্য। (খ) পলাশবীজ ॥ তোলা, লবঙ্গ ॥ তোলা ও কাকোলী ॥ তোলা একত্রে ৮ তোলা কাঁজীর সহিত বাটিয়া সেব্য।

দশম মাসে—নীলোৎপল, যষ্টিমধু ও চিনি প্রত্যেক ২ তোলা জলের সহিত বাটিয়া ৮ তোলা সুখোষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনীয়।

উপরোক্ত ঔষধগুলি ব্যবহারে কোনটীই নিষ্ফল হয় নাই। ইহা আমাদের বিশেষ পরীক্ষিত।

ইতি — শ্রী—

পৃষ্ঠাঘাতে—মান্‌কাকড়া।

(একটি রোগিণীর বিবরণ।)

রোগিণী বিধবা, বয়স ৩৫। ৩৬ বৎসর গত ১৩১৭ সালের বর্ষার সময় রোগিণীর মেরুদণ্ডের বামোর্দ্ধাংশভাগে প্রায় মেরুদণ্ডের উপরে একটি ক্ষুদ্র স্ফোটক দেখা দেয়। উহা ৫। ৬ দিনে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া একটি হংসডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট বিদ্রধির আকারে পরিণত হয়। রোগিণী বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন।

প্রথমতঃ ঐস্থানে পুল্টিস্, স্বেদ এবং প্রলেপাদি প্রয়োগ করা হয়। যখন দেখাগেল যে উহাতে অস্ত্রপ্রয়োগ না করিলে আর আরোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই তখন একজন এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন ও দুইজন নেটিভ্ ডাক্তার ডাকা হয়। তাঁহারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া উহা পৃষ্ঠাঘাত (carbuncle) বলিয়া অনুমান করেন। অধিকন্তু, অবিলম্বে অস্ত্রপ্রয়োগ না করিলে ইহা প্রাণনাশক হইবে এইরূপ মতও প্রকাশ করেন। তদনুসারে তৎপরদিবস প্রাতে অস্ত্রপ্রয়োগোপ-যোগী সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়। ডাক্তার বাবুরা আসিয়া সিকিইঞ্চি গভীর আড়া আড়ি (crucial) অস্ত্রকর্ম্ম (operation) করেন। ইহার পরেই তাঁহারা বুঝিলেন যে এখনও অস্ত্রপ্রয়োগের মত অবস্থা হয় নাই: সুতরাং পুল্টিসের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহরা প্রস্থান করিলেন। বিকালে রোগিণীর যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। এমন সময় পরম্পর অবগত হওয়া গেল যে নিকটেই কোনও গ্রামে পৃষ্ঠাঘাতের চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত একটি বৃদ্ধ নাপিত বাস করে। সে বিনা অস্ত্রপ্রয়োগে আশ্চর্য্যরূপে এই রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ। অবিলম্বে তাহাকে ডাকা হইল। সে ব্যক্তি নিরক্ষর হইলেও তাহার চিকিৎসা-প্রণালী বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

উক্ত চিকিৎসক আসিয়া প্রথমতঃ পৃষ্ঠাঘাতের সমস্ত অংশ নিমপাতা সিদ্ধ জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ফেলিল। পরে বেদনাস্থানে বহুছিদ্র বিশিষ্ট একখানি কচি কলারপাতা বসাইয়া দিল। তদুপরি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি মূলের ন্যায় পদার্থ, জলে ভিজাইয়া তদুপরি সাতভাজ (পরল্)

বস্ত্রখণ্ড দিয়া বান্ধিয়া দিল, এবং অনবরতঃ জলদিয়া ঐ বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা দিয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে ঐ বন্ধন খুলিয়া ফেলিলে পর দেখাগেল প্রায় ¼ ইঞ্চি গভীর হংসডিম্বাকৃতি স্থানের চর্ম্ম ও মাংস সমস্ত নরম হইয়া খসিয়া ঐ পাতার সহিত উঠিয়া আসিয়াছে। নিমপাতার জলে ক্ষতস্থান উত্তমরূপে ধৌত করতঃ পুনরায় পূর্ব্বোক্তমত কলারপাতা, সূক্ষ্মমূলের ন্যায় পদার্থ এবং বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বান্ধিয়া দেওয়া হইল এবং পূর্ব্বমত তদুপরি জল দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইল। ৬। ৭ দিন এই ভাবে প্রত্যহ প্রাতে ধৌত (dress) করার পর দেখা গেল ক্ষতের মধ্যে আর পচ্‌লা (Slough) অংশ একটুকুও নাই। ক্ষত প্রায় দেড়ইঞ্চির কিঞ্চিদধিক গভীর হইয়াছে এবং তাহার সমস্ত অংশেই আঁকুর বা অঙ্কুর বান্ধিতে (Granulation) আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় ঐ মূল দ্বারা বন্ধন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করা হয় ; এবং খুব সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত শ্বেতধুনার চূর্ণ গব্য নবনীতে মিশাইয়া মলম প্রস্তুত করতঃ তাহা উক্ত ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিয়া যথারীতি বন্ধনি (ব্যাণ্ডেজ, Bandage) বান্ধা হয়। ৭।৮ দিন এই মলম প্রয়োগেই ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেল।

আমাদের দেশে এইরূপ আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ক্ষত চিকিৎসা পদ্ধতি অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয় তাহারা এই প্রকার আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ গুলিকে আজীবন গোপন করিয়া রাখে। ফলে তাহাদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধের ব্যবহারও লোপ পায়। এই ভাবে আমাদের দেশের কত কত অমূল্য রত্ন যে বিলোপের অনন্ত অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

বর্ণিতস্থলে উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ ঔষধটী এক বৎসরব্যাপী অনেক সাধ্য সাধনা ও অর্থব্যয়ের পরে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। আজ পাঠকবর্গকে তাহা উপহার দিতেছি। পৃষ্ঠাঘাত চিকিৎসায় ইহার আশ্চর্য্য শক্তি আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যদি কেহ ইহা ব্যবহার করেন দয়া করিয়া ফলাফল আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণীতে প্রকাশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ জগতের মঙ্গল সাধন করিতে যেন ক্রটী না করেন ইহাই প্রার্থনা। একজনও যদি ইহা ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করেন, তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিব।

ঔষধটি এই— যে সমস্তস্থানে মুথা ও দূর্ব্বা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে তন্মধ্যে একপ্রকার গুল্ম জন্মে তাহা দেখিতে অনেকটা ঝোপের মত হয়। প্রত্যেক ঝোপ হইতে ৪।৫টী শীষ উঠে। শীষের অগ্রভাগেও ত্রিশূলাকৃতি তিনটি শীষ হয়। পাতাগুলি অনেকটা মুথাঘাসের পাতার মত কিঞ্চিৎ প্রশস্ত ও গাঢ় সবুজ বর্ণ। বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাকে মাল্‌কাটাকাটি গাছ, কলিকাতা অঞ্চলে মন্‌কাকড়া এবং পূর্ব্ববঙ্গে কেঁচলা ঘাস বলে। ছেলেরা ইহার শীষগুলি লইয়া ঘুড়ির সূতার ন্যায় কাটাকাটি খেলে। এই মানকাকড়ার মূলই উক্ত পৃষ্ঠাঘাত রোগে ব্যবহৃত হইয়াছিল। পৃষ্ঠাঘাতরোগে দূষিত বিধান তন্তুকোষ সমূহকে (Tissue cells) পচাইয়া উঠাইতে ইহার শক্তি অদ্ভুত।

শ্রী :—

মন্তব্য।

জগৎস্রষ্টার সৃষ্টিকৌশল আগাগোড়া পর্য্যালোচনা করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। জগৎব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কত গুল্ম, লতা, ওষধি, বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি রহিয়াছে। কোন্ কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে সৃষ্টিকর্ত্তা কাহাকে সৃজন করিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? আর আমরা তাহারই কতটুকুই বা জানি?

হায়, মোহান্ধ মানব! সেই অসীমের কণামাত্র অবগত হইয়া আজ তুমি আত্মজ্ঞানের অহঙ্কারে ধরাখানাকে সরার মত মনে করিয়া কত পাপ না অহরহ অর্জ্জন করিতেছ! পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ মাত্র আলোকে আলোকিত হইয়া যাহারা মনে করেন যে, আমাদের ন্যায় জ্ঞানী ও সবজান্তা বুঝি আর নাই, তাহারা কখনও প্রকৃতির লীলানিকেতনের সন্ধান করিয়াছেন কি? দেশের মধ্যে এইরূপ কত শত অমূল্য রত্ন বিরাজিত থাকিয়া প্রকৃতির শক্তির পরিচয় ও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহার কোনও খোঁজ খবর লইয়া থাকেন কি? একবার মুদ্রিতনয়নে সৃষ্টির বিশালত্ব এক মুহূর্ত্তের জন্যও উপলব্ধি করিয়াছেন কি? যদি বুঝিয়া থাকেন তবে আসুন। মনে প্রাণে বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন! আমাদের এই অধঃপতিত দেশে কোথায় কোন অমূল্য দ্রব্য কোন্ শক্তি লইয়া

বর্ত্তমান রহিয়াছে সন্ধান করুন,আর জগতে তাহা প্রচার করিয়া স্বীয় কীর্ত্তি অক্ষয় করিয়া অমরতা লাভ করুন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই যোগদৃষ্টি বর্দ্ধনের জন্য সচেষ্ট হউন, দ্রব্যের প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করুন। তদ্ভিন্ন এই অধঃপতনের অবস্থা হইতে উন্নীত হওয়ায় আমাদের আর কোনই উপায় নাই। ইহাই স্বাধীনতা, ইহাই সুখ, ইহাই স্বর্গ। আর এই কর্ম্ম সাধনার মধ্য দিয়াই সিদ্ধ মুক্ত অবস্থায় উপনীত হওয়ার প্রকৃত পথ পাওয়া যাইবে।

সম্পাদক।

চিকিৎসা সংবাদ ও বিবিধ।

১। দ্রাক্ষাপাণক বা রেজীনটী :—কিসমিস ক্ষেতলইয়া উহা দ্বিগুণ আয়তনের স্ফুটিত জলে মিশ্রিত করতঃ ২ ঘণ্টাকাল মৃদু সন্তাপে সিদ্ধ করিতে হইবে। অনন্তর ছাঁকিয়া ক্বাথটি পৃথক করিয়া লইতে হইবে। অল্প পরিমাণে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হয়। এই ক্বাথ অতিশয় পরিপোষক এবং ইহা সহজে জীর্ণ হয় ও ইহাতে অসার ভাগ খুবই কম। ব্রথ (সুপ) দুগ্ধ পথ্য অপেক্ষা ইহার প্রকৃতি বলকারক ও পোষক শক্তি বেশী।

সন্নিপাতিক বিকার (Typhoid) জ্বরে যে কালে অন্ত্রের অবস্থা বিপর্য্যস্ত থাকার দরুন পথ্যার্থ প্রযুক্ত দ্রব্যের অধিকাংশই উৎসারিত হইয়া থাকে। সে কালে এইরূপ পথ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার প্রয়োজন যাহাতে অত্যল্প পরিমাণ পথ্যে অধিক পরিমাণে পুষ্টিকর উপাদান বর্ত্তমান থাকে; অতি সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয় এবং অসার ভাগ অল্পই থাকে। এই জাতীয় পথ্যের মধ্যে রেজিনটি একটি প্রধান ঔষধ।

কুইনাইনের কুফল ঃ— পাশ্চাত্য বহু বৈজ্ঞানিক ডাক্তারই মেলেরিয়া প্রতিষেধে কুইনাইনের অত্যন্ত পক্ষপাতী ; কিন্তু কুইনাইনের কুফলও যে বিস্তর তাহা ইদানীং বহু পাশ্চাত্য ডাক্তারের মুখেই কীর্ত্তিত হইতেছে। "হেরাল্ড অব হেথ" নামক ইংরাজী ডাক্তারি পত্রিকায় ১৯১০ সালের জানুয়ারী

সংখ্যায় এ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞ ডাক্তারেরই অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। প্রফেসার কক্ বলিয়াছেন,—"The drugs eriously weakens the action of the heart, when taken regularly, in excessive doses" অর্থাৎ কুইনাইনের নিয়মিতভাবে অতিপ্রয়োগে হৃদপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। প্রফেসার ম্যাকনিন্ বলিয়াছেন, — "Even Quinine is a poison for the white blood cells" অর্থাৎ এমন যে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক সেই কুইনাইনও তাহার শ্বেত রক্তকণিকা সমূহের বিষস্বরূপ হইয়াথাকে। হেয়াল্ডের-এই প্রবন্ধলেখক আরও বলিতেছেন,—But recent investigations leave no room for doubts that it also has a detrimental effect on the white blood cell thus lowering the defences of the body anb laying it subject to renewed attack from the malarial germ" অর্থাৎ ইদানীন্তন পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে, কুইনাইন শ্বেত রক্তাধার সমূহের অনিষ্ট করিয়া থাকে, ফলে শরীরের রোগ প্রতিষেধক শক্তি কমিয়া যায়, শরীর নূতন ম্যালেরিয়া বিষে আক্রান্ত হইতে পারে। অপিচ আরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে, নূতন নূতন ম্যালেরিয়া জ্বর কুইনাইনে যেমন প্রতিষেধ করিতে পারে, পুরাতন অনিয়মিত এবং জীর্ণ মেলেরিয়া রোগে সেরূপ সুফল ফলে না। হেয়াল্ডের এ প্রবন্ধে এ দেশীয় ডাক্তারগণের এবং সাধারণ লোকেরও দৃষ্টিপাত বিশেষ বাঞ্ছনীয়। (চিকিৎসা প্রকাশ)

মৃতের জীবন সঞ্চার—আমেরিকায় নিউইয়র্কের উরকয়ফলা ইন্‌ষ্টিটিউটে মেডিকেল রিসার্চ্চের শারীরতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ডাক্তার ম্যামুয়েল জেমস্ মেলিজাব একজন সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি মৃত খরগোসের দেহে অনেকবার নিম্নলিখিত প্রণালীতে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। প্রণালীটি এই — মৃতদেহের শ্বাসনালীর মধ্যদিয়া ভস্ত্রা (হাঁপর) সংযুক্ত একটি ক্যাথিটার চালাইয়া দিতে হইবে। পরে জিহ্বা একটু টানিয়া বাহির করিয়া চিবুকের (থুথ্‌নির) নিম্নে ঠাসিয়া ধরিয়া উহার কিয়দংশ তালু সংলগ্ন করিতে হইবে সেইসঙ্গে উদরের উপর একটা চাপ দিতে হইবে যেন বায়ু কোনক্রমে পাকস্থলীতে প্রবেশ করিতে না পারে। তৎপরে ভাস্ত্রাদিয়া ফুসফুসে বায়ু চালাইতে থাকিলেই মৃতদেহে

জীবনসঞ্চার হইতে থাকে। অবশ্য মৃত্যু ঘটিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে ফল হইবার সম্ভাবনা। উক্ত ডাক্তারের বিশ্বাস যে সদ্যো মৃত মানুষের দেহেও চেষ্টা করিলে এই প্রকার জীবন সঞ্চার করা যাইতে পারে।

অদ্ভুত সাধনা—ফ্রান্সের রোকিফেলার ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডাক্তার ফারেন মানব দেহ হইতে অংশ বিশেষ পৃথক করিয়া লইয়া তাহাদিগকে অনেকদিন সজীব অবস্থায় রক্ষা করিয়াছেন। যকৃৎ কিম্বা মূত্রাশয় পৃথক করিয়া দিয়া ৫০ দিন পর্য্যন্ত সজীব রাখিয়াছেন তাহাতে স্পন্দন পর্য্যন্ত হইয়াছে। তিনি একটি মুরগীর বাচ্চার হৃদ্‌ যন্ত্রের অংশ কাটিয়া লইয়া রক্তের তরল অংশে রক্ষা করিয়া ছিলেন; পরে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ নাশক সলিউসনে ধৌত করিয়া নূতন রক্তের তরলাংশে তাহা রাখিয়াছেন। এই তরলাংশ উক্ত ভাবে ৩।৪ দিন অন্তর পরিবর্ত্তন করিতেন। ১২০ দিন ঐ হৃদযন্ত্র সজীব ছিল ইহার তৃতীয় মাসে ৬০ ঘণ্টার মধ্যে উহার একাংশে কতকগুলি কোষ জন্মিল, তাহা পরিমাণে যন্ত্রটির ৩০ গুণ হইল। চতুর্থ মাসের শেষ ও পঞ্চম মাসের প্রথম আয়তন আরও বৃদ্ধি হইল। সকল সময়ই উহার স্পন্দন হইয়াছিল। এইরূপ অনেক পরীক্ষা করা হইয়াছে। কোন অংশ মিনিটে ৯২ বার কোন অংশ ১২০ বার স্পন্দিত হইয়াছে কোন অংশ ১০৫ দিন সজীব রহিয়াছে বস্তুতঃ আজ কাল সাধনার প্রাণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সে সাধনা ও উদ্যম কিছুই নাই। আমাদের প্রাণহীন সম্প্রদায়ের হস্তে আজ তাই আয়ুর্ব্বেদ নির্জ্জীব হইয়াছে। আমরা আয়ুর্ব্বেদের জন্য যদি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় কায়োমনবাক্যে আত্মদান করিতে পারিতাম তাহা হইলে প্রাচ্য আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তিসূত্র জগতে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইত। আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের করণীয় এত কর্ত্তব্য রহিয়াছে, অথচ আমরা একেবারে নিশ্চেষ্ট। ইহা হইতে অধিক দুর্ভাগ্য আমাদের এই জাতির পক্ষে আর কি হইতে পারে?

২য় বর্ষ] [৪র্থ সংখ্যা।

শ্রাবণ, ১৩১৯।

আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীনলিনী কান্ত দাশ গুপ্ত

বিদ্যাভূষণ, কবিরত্ন; এল, সি, পি, এস।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী সভার

অনুমোদিত ও

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে

প্রকাশিত।

ঢাকা, বৈকুণ্ঠনাথ যন্ত্রে

প্রিণ্টার শ্রীবিহারীলাল দত্তদ্বারা মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা] [বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২ টাকা।

সূচী।

মানব শরীরের অভ্যন্তরে যে তৈজস তত্ত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা অনায়াস-বোধগম্য করিয়া লইবার জন্য আয়ুর্ব্বেদকারগণ একটি সিদ্ধান্ত (Theory) করিয়াছেন "পিত্ত"।

তপ্—সন্তাপে, এই সন্তাপার্থক তপ্ ধাতু লইয়া পিত্ত শব্দ গঠিত হইয়াছে, পিত্ত শব্দের একটি পর্য্যায় 'মায়ু'। মি ধাতুর অর্থ বিক্ষেপণ। শরীরের মধ্যে উষ্মা বিক্ষেপ করে এই অর্থে মি ধাতুর উত্তর উণাদি উণ প্রত্যয় করিয়া মায়ু শব্দ গঠিত হইয়াছে। পিত্ত ও মায়ু শব্দের নিরুক্তি হইতে আমরা সহজেই অনুধাবণ করিতে পারি যে, শরীরাভ্যন্তরস্থ আগ্নবর্দ্ধক পদার্থের নাম 'পিত্ত'! এমন অনেকগুলি ভক্ষ্য দ্রব্য আছে যাহা সেবনে তাপোদ্ভব হয়, আয়ুর্ব্বেদ মতে সেগুলি পিত্তকর। রৌদ্রের তাপ, অগ্নিসন্তাপ প্রভৃতি তাপ-বর্দ্ধক সুতরাং পিত্তকর। আবার এমন কতকগুলি আহার বিহার আছে যাহাতে শারীরিক উত্তাপের সমতা হয়, সেগুলি পিত্ত প্রশমক। আহার বিহারাদি বাহ্য বিষয় কারণ হইলেও মূলে সেই শক্তিরই বিকাশ। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তৈজসশক্তি বা তেজঃস্বরূপ পিত্ত শরীরের নানাস্থানে থাকিয়া স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ শরীরের সাচ্ছন্দ্য বিধান করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বায়ুর ন্যায় পিত্তও ইন্দ্রিয়ব্যক্ত এবং অতীন্দ্রিয়ব্যক্ত ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। ইহাকেই আবার উৎপত্তি ভেদে মলভূত, ধাতুভূত এবং প্রসাদভূত এই তিন ভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। মলভূত পিত্ত ইন্দ্রিয়ব্যক্ত, এবং ধাতুভূত ও প্রসাদভূত পিত্ত অতীন্দ্রিয়ব্যক্ত বলা যায়। আয়ুর্ব্বেদকারগণ স্থান ও কার্য্যভেদে ইহাকে পঞ্চধা বিভাগ করিয়াছেন। তাহারা যথাক্রমে রঞ্জক, পাচক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক, এই পঞ্চনামে অভিহিত। উৎপত্তি অবস্থান ও কার্য্য এবং ব্যক্তাব্যক্ততা ভেদে নানা বিভাগে বিভক্ত হইলেও শেষোক্ত পঞ্চপিত্তের আলোচনায় উক্ত প্রতি বিভাগের বিশদ বর্ণনা বিবৃত করিবার প্রয়াস পাইব।

রঞ্জক পিত্ত—যে দ্রব (তরল), নীল বা পীতবর্ণ, তীক্ষ্ণগুণ ও পুতিগন্ধ বিশিষ্ট পদার্থ যকৃৎ কোষ্ঠে স্বীয় বস্তিতে সঞ্চিত হইয়া অবস্থান করে তাহাকে রঞ্জক পিত্ত বলে। শোণিতের ও মাংসের, কাহারও মতে

কেবল মাত্র শোণিতের মল হইতে এই রঞ্জক পিত্তের উদ্ভব হইয়া থাকে। উক্ত মল হইতে ইহার উৎপত্তি হয় এই জন্য ইহাকে মলভূত পিত্ত বলে। ইহা ইন্দ্রিয়ব্যক্ত, পাঞ্চভৌতিক ও ত্রিগুণাত্মক পদার্থ। তন্নিষ্ঠ সত্ত্ব ও রজোগুণ তমোগুণকে অভিভব করিয়া এই রঞ্জক পিত্তকে প্রকটিত করিয়া থাকে। এই জন্য মলভূত রঞ্জক পিত্ত বিদ্রুত, চঞ্চল, এবং তৈজসগুণ সম্পন্ন। এই পিত্ত নিরামাবস্থায় আতাম্র পীতবর্ণ এবং আমাবস্থায় হরিত ও শ্যাববর্ণ হইয়া থাকে।

আহার্য্য দ্রব্য সম্যক্ বিপাচিত হইলে তাহা হইতে যে রস উৎপন্ন হয় তাহা পুনরায় পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়। একভাগকে মলভূত রস, অপর ভাগকে প্রসাদভূত রস কহে। রসবাহী স্রোতপথে এই শেষোক্ত রস সমানবায়ুকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া যকৃৎ ও প্লীহাভ্যন্তরে নীত হইলে রঞ্জক পিত্তের তৈজস শক্তির স্ফুরণে বিশিষ্ট পাক প্রাপ্ত হয়। তন্নিবন্ধন শোণিকা (Red corpuscle) (১) সৃষ্ট হইয়া রস ধাতুকে রক্তাকারে পরিণত করে।

পাচক পিত্ত ঃ—পচতীতি (পচ + ণ্বুল্) পিত্তরসেন ভুক্তদ্রব্য পচনাদস্য তথাত্বং। যাহা দ্বারা ভুক্তান্ন পরিপাক হয় তাহাকে পাচক পিত্ত কহে। ভাবমিশ্র বলেন—পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নি বলবর্দ্ধনং।

রসমূত্র পুরীষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ॥

পাচক পিত্ত ভুক্তান্ন পরিপাক করে এবং শ্লেষ্মাগ্নিবলবৃদ্ধি ও রসমূত্র পুরীষ বিরেচন করিয়া থাকে। এই অগ্নি সম্বন্ধে আমরা অতঃপর আলোচনা করিব। এক্ষণে দেখা যাউক পাচক পিত্ত কি ভাবে ভুক্তান্ন পরিপাক করিয়া থাকে। আহার করিবা মাত্র ভুক্তদ্রব্য সমূহ অন্নবহা নালীপথে আমাশয় গত হইলে তথায় ক্লেদক (Gastric juice) নামক শ্লেষ্মযোগে মাধুর্য্য ও ফেনভাবাপন্ন (Fermented) হইয়া আমাশয় চ্যুত হইতে থাকে। সেই চাবমান জীর্ণাজীর্ণ পদার্থ আমাশয় হইতে এইভাবে গ্রহণী নাড়ীতে

(১) শোণ শব্দের অর্থ লাল রং। শোণ গুণ বিশিষ্ট বলিয়া রক্তকণাকে শোণিকা বলা যায়। রক্তের অপর নাম শোণিত। শোণিকা দ্বারা নির্মিত এই অর্থে শোণিত শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে।

(Duodenum) চালিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত যকৃৎ কোষাভ্যন্তরস্থ পিত্তবস্তি নিঃসৃত পিত্তরসের দ্বারা অভিষিক্ত হয়। এই পিত্তরস পিত্তবস্তি হইতে পিত্তনালী বাহিয়া গ্রহণী নাড়ীতে আগত হয়। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্লিষ্ট ভুক্তদ্রব্য সমূহ মিশ্রিত হইয়া বিদগ্ধ ও অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পিত্ত উষ্ণ হইলে ভুক্ত দ্রব্য কটুত্বপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু পাচন কার্য্যে স্বভাবতঃ বিদগ্ধ ও অম্লত্ব হওয়াই প্রয়োজন বিধায় এই কটুত্বের অবস্থাকে বিকৃতাবস্থা বলা হয়। বিদাহ জন্য ভুক্তদ্রব্যের সংহতি (Consolidity) বিমোক্ষণ ঘটে অর্থাৎ স্থূলদ্রব্য অনুশঃ বিভক্ত হইয়া থাকে। পিত্তান্তর্গত শক্তি বা পাচকাগ্নি দ্বারাই এই বিমোক্ষণ কার্য্য সম্পাদিত হয়। যকৃন্নিসৃত পিত্তের সহিত মিশ্রিত হইলে ভুক্তদ্রব্য পীতবর্ণ ধারণ করে। তদবস্থায় তাহা সহজে পচিতে পারে না।

সুশ্রুত সংহিতায় লিখিত আছে, পাচকাগ্নি আহার পরিপাক করে। আহারাভাবে দোষ, দোষক্ষয় হইলে ধাতু এবং ধাতুক্ষয়ে প্রাণ পরিপাক করে। সুতরাং পাচকাগ্নি সংশমনার্থ ইন্ধনরূপে আহার্য্য বস্তু যোগাইতে হয়, নতুবা শরীর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া শরীর বিনাশ করে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে এই পাচকাগ্নি ও পাচক পিত্তের মধ্যে প্রভেদ কি? এই উভয়ের ক্রিয়া পরম্পরা চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা জন্য পিত্তবস্তি হইতে নিসৃত পিত্তের দ্বারা গ্রহণী নাড়ীতে এক প্রকার কার্য্য সম্পাদিত হয়। এবং পিত্তনিষ্ঠ ধর্ম্মের দ্বারা সেই পরিপাক ক্রিয়ার উপযোগী দহন পচনাদি অন্যান্য কার্য্য ঘটিয়া থাকে। এই দহন পচনাদি কার্য্যের মূলে যে শক্তি বর্ত্তমান অর্থাৎ যে শক্তি দ্বারা এই দহন পচনাদি কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহাকে পাচকাগ্নি কহে।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, দ্বিবিধ রঞ্জক ও পাচক পিত্ত একই বস্তু। কেবল ইহাদের বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন কার্য্য অনুসারে দুইটি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রঞ্জকপিত্ত ও পাচক পিত্ত উভয়ই ইন্দ্রিয় ব্যক্ত আর তদন্তর্গত রঞ্জকাগ্নি ও পাচকাগ্নি তন্নিষ্ঠধর্ম্ম ও অতিন্দ্রিয়ব্যক্ত। এই অগ্নিকে ধাতুভূতপিত্ত বলা যাইতে পারে। প্রকটিত রজোগুণ তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বানুগৃহীত হইলে ধাতুভূত পিত্ত বা অগ্নির অস্তিত্ব প্রকাশ হয়।

সত্ত্বগুণ বিশিষ্টরূপে প্রকটিত হইয়া ধাতুভূত পিত্তনিষ্ঠ রজোগুণকে অভিভব করিয়া পিত্তান্তরে পরিণত হয়। এই বিপরিণাম প্রাপ্ত পিত্তকে প্রসাদভূত পিত্ত বলে। ইহা শুদ্ধ সত্বগুণোত্তর পদার্থ, সুতরাং প্রকাশ-ভূয়িষ্ঠ। ইহা হৃদয়, চক্ষুর্দ্বয় এবং সর্ব্বদেহের ত্বক্‌মণ্ডলে অধিষ্ঠান করে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারগণ এই তিনস্থানগত পিত্তকে যথাক্রমে সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সাধক পিত্ত—শুদ্ধ সত্ত্বগুণোত্তর এই সাধক সংজ্ঞক পিত্ত মনুষ্য হৃদয়ে অবস্থান করিয়া বুদ্ধি, মেধা ও অভিমানাদি এবং স্মরণাদিরূপ অভিপ্রেতার্থ সাধন করে বলিয়া ইহার নাম সাধকপিত্ত। ইহা দ্বারা মনের সকল অভিলাষ সাধিত হয়। অব্যাহত প্রকৃতিস্থ সাধক পিত্ত অতি নির্ম্মল। তজ্জন্য হৃদ্‌গত তমোগুণ এবং কফধাতুকে অভিভব করিয়া মনোবুদ্ধিকে প্রসন্ন করতঃ ধর্ম্মার্থকামলক্ষণ পুরুষার্থ সাধন করে।

সাধকপিত্ত হৃদয়ের বৈদ্যুতিক শক্তি। এই শক্তি, একের হৃদয় হইতে অপরের হৃদয়ে সংক্রমিত হইয়া পরস্পরের প্রীতি সঞ্চার করে।

কাহারও কাহারও মতে এই সাধক পিত্তের স্থান মস্তিস্ক; মস্তিস্কে থাকিয়া সাধক পিত্ত উক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রকৃতঃ প্রস্তাবে প্রথমোক্ত মতটিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ যোগশাস্ত্র এবং প্রাচ্য ও পাশ্চত্য দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়বহা স্রোতসমূহের কেন্দ্রস্থান মস্তিস্ক প্রদেশ (Brain) হইলেও বাহ্য বস্তুসম্বন্ধীয় অনুভূতি মনেই হইয়া থাকে। শাস্ত্রে কামমন ও শুদ্ধমন ভেদে মনকে দুইভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। আত্মা ও বুদ্ধির বিষয় গ্রহণ করে শুদ্ধমন, আর বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে কামমন। মনের দুইটি দিক, একটি দিক বহির্ম্মুখী তাহাকে কামমন ও অপর দিক অন্তর্ম্মুখী তাহাকে শুদ্ধমন বলে। আয়ুর্ব্বেদকারগণ ও পাতঞ্জল প্রভৃতি যোগশাস্ত্রকারগণ নানাযুক্তি দ্বারা হৃদয়কেই এই উভয়মুখী মনের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আলোচক পিত্ত—প্রসাদ ভূত এই পিত্ত তেজঃ স্বরূপ। ইহা নেত্রযুগলে অবস্থান করে। চক্ষুর চতুর্থ পটল (Vitrious humour) দৃষ্টি (Crystcline lens) এবং দৃক্ বিতান (Retina) প্রভৃতি আলোচক

পিত্তের তেজে তেজোময় হইয়া প্রতিবিম্ব পাতন কার্য্যের শক্তি প্রদান করে ; তজ্জন্য দৃষ্টি বিতত্তায় প্রতিবিম্ব গৃহীত হইয়া রূপদর্শনাদি হইয়া থাকে।

ভ্রাজক পিত্ত—মনুষ্য দেহের ত্বক্ সপ্ততর। তন্মধ্যে অবভাসিনী নামক ত্বকাশ্রয় করিয়া ভ্রাজক পিত্ত অবস্থান করে। ইহার রজোগুণানুগ সত্ত্বভূয়িষ্ঠ পদার্থ সত্ত্ববাহুল্য হেতু শরীরের ছায়া ও প্রভার প্রকাশক। রজোগুণানুগত্ব নিবন্ধন তৈজস শক্তি সম্পন্ন। তৈলমর্দ্দন, অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি দ্বারা তৈলাদি দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হইলে ভ্রাজক পিত্তের তৈজস শক্তির সাহায্যে তাহা শোষিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত এই পঞ্চ প্রকার পিত্তের কার্য্য-পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, শরীরস্থ তেজঃ পদার্থের যে কার্য্য, ইহাদেরও সেই কার্য্য। ইহার বৈষম্য ঘটিলে অপরিপাক, অদর্শন, উষ্মার বিকৃতি, ভয়, ক্রোধ, মোহ প্রভৃতি জন্মায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যে সকল আহার বিহার শরীরের তাপোৎপাদক তাহাই পিত্তকর। অতিরিক্ত তাপজনক আহারাদি দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হয়। কটু, লবণ ও অম্ল রস এবং তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী গুণসম্পন্ন দ্রব্য এবং তিল, তিসি, দধি, সুরা, শুক্ত কাঁজি, কুলত্থ কলাই, সরিষা, মসিনাশাক, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, উপবাস রৌদ্রতাপ, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বেগধারণ, ব্যায়াম প্রভৃতি কারণে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে। যেহেতু উপবাসাদি দ্বারা শরীরের আণবিক সঞ্চলনাধিক্য বশতঃ তাপোদ্ভব হয়। আর মধ্যাহ্ন কাল, অর্দ্ধরাত্রিকাল, অন্নের পচ্যমানাবস্থায় এবং শরৎ ও গ্রীষ্মকালে মনুষ্যদেহে নানাবিধ রাসায়নিক কার্য্য এবং সৌরতাপ প্রভৃতি হেতু তাপাধিক্য হয় সুতরাং তাহাও পিত্ত প্রকোপের কারণ।

পিত্ত প্রকোপের ফল—পিত্ত প্রকুপিত হইলে শরীরের উষ্ণতা, সর্ব্বাঙ্গদাহ, ধূমোদ্গার, মল, মূত্র, নেত্র ও শরীর পীতবর্ণ, ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা, শীতাভিলাষ ও মূত্রের অল্পতা হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বিস্ফোট, প্রলাপ, স্বেদ, মূর্চ্ছা মত্ততা, ভ্রম, গ্লানি, ত্বকবিদীর্ণতা, দাহ, তৃষ্ণা, তৃপ্তি, আহারে অনভিলাষ, মুখের কটু তিক্ততা, এবং অম্লাস্বাদ, নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধত, মুখপাক, রেচন এবং অন্ধকার প্রবেশবোধ প্রভৃতি বিকার সমূহ উৎপন্ন করে।

পিত্ত প্রশমনের উপায়—নিম্নলিখিত কারণে পিত্ত প্রশমিত হয়। তিক্ত, মধুর ও কষায় রস সেবন : শীতল বায়ু, ছায়া, রাত্রি, ব্যজন, চন্দ্র কিরণ, ভূমিগৃহ, ফোয়ারার জল, পত্র, শ্যামাঙ্গস্পর্শ, ঘৃত, দুগ্ধ, বিরেচন, পরিষেক, রক্তমোক্ষণ এবং প্রদেহ প্রভৃতি দ্বারা পিত্ত প্রশমিত হয়।

পিত্ত ক্ষীণ হইলে—অগ্নির উষ্ণতা মন্দ হয়। ইহাতে শরীর প্রভাহীন হইয়া পড়ে, ওজঃ, বা তেজঃ মেধা, স্মৃতি, কার্য্যতৎপরতা, বাগ্মিতা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হয়, মনের বল কমিয়া যায়, এবং বুদ্ধিভ্রংশতা জন্মে। পিত্ত ক্ষীণ রোগীর পক্ষে তিল, মাষ ও কুলথ কলায়, পিষ্টকাদি, দধিমস্ত (দধির মাত) অম্ল শাক, তক্র, কাঁজি কটু অম্ল ও লবণ রস, উষ্ণ দ্রব্য, তীক্ষ্ণ ও বিদাহী দ্রব্য, উষ্ণ কাল ও উষ্ণ দেশ প্রভৃতি উপকারী। পিত্ত ক্ষীণ হইলে পিত্ত বর্দ্ধক বস্তু সেবনে পিত্তের সমতা হইয়া থাকে।

পিত্ত প্রাকৃতিক ব্যক্তি সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে —

অকালপলিতঃ গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান্।
বহুভুক্ তাম্রনেত্রশ্চ স্বপ্নে জ্যোতীংষি পশ্যতি ।
এবংবিধো ভবেদ্ যস্তু পিত্তপ্রকৃতিকো নরঃ ॥

পিত্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির কেশ অকালে শুক্লবর্ণ হয়, সর্ব্বদা স্বেদ নির্গম ও চক্ষু তাম্রবর্ণ, ক্রোধশীল, বুদ্ধিমান, অধিক ভোজনশক্তি সম্পন্ন স্বপ্নাবস্থায় নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দর্শন এবং গৌরকান্তি বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, পিত্ত স্বয়ং অগ্নিস্বরূপ, অগ্নি হইতে উৎপন্ন। পিত্তাধিক্য বশতঃ ব্যক্তিমাত্রই তীব্র তৃষ্ণা ও তীব্র ক্ষুধাবিশিষ্ট হয়। তাহার স্পর্শে উষ্ণবোধ হয় এবং কেশ পিঙ্গলবর্ণ ও দেহ অল্প রোমবিশিষ্ট দেখায়। সে ব্যক্তি স্ত্রীলোক ও পুষ্পমাল্যাদি ধারণ এবং সুগন্ধি দ্রব্য অনুলেপন করিতে সর্ব্বদা অভিলাষী হয়। আর সচ্চরিত্র, পবিত্র হৃদয়, আশ্রিত প্রতিপালক, সম্পত্তিবিশিষ্ট, সাহসী, বুদ্ধিমান ও বলবান হইয়া থাকে। ভীত শত্রুগণকে সহায়তা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সে ব্যক্তি মেধাবী হয় এবং তাহার সন্ধির বন্ধন সকল ও গাত্রমাংস অত্যন্ত শিথিল ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ লোক প্রায়ই স্ত্রীলোকের প্রিয় হয় না। অল্প শুক্রবিশিষ্ট ও অল্পরমণেচ্ছু হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি উত্তাপ মোটেই সহ্য করিতে পারে না। স্বপ্নে কর্ণিকার

ফুল, পলাশফুল এবং অগ্নি দর্শন করিয়া থাকে। তাহার চক্ষু পাতলা, চঞ্চল, সূক্ষ্ম ও অল্প লোমবিশিষ্ট হয়। চক্ষুতে ঠাণ্ডা লাগিলে সুখবোধ করে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে, মদ্যপান করিলে ও সূর্য্যের কিরণ লাগিলে চক্ষু তৎক্ষণাৎ রক্তবর্ণ হয়। পিত্ত প্রাকৃতিক ব্যক্তিসকল মধ্যম পরমায়ু-বিশিষ্ট এবং মধ্যম বলযুক্ত হয়। শাস্ত্রাদিতে পণ্ডিত এবং ক্লেশভীরু, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, বিড়াল এবং ভূতাদি পিত্তপ্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পিত্তপ্রকৃতি বিশিষ্টগণের দেহে পিপ্লু, ব্যঙ্গ, তিলক, পীড়কা প্রভৃতি প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। ক্রমশঃ

দেশীয় পথ্য।

পথ শব্দ হইতে পথ্য। পথ শব্দের সাধারণ অর্থ উপায়। অতএব শরীর রক্ষণার্থে যে কোন প্রকারের আহার বা পানীয় ব্যবহার করা হয় তাহাই পথ্য সংজ্ঞার অন্তর্গত। কিন্তু সচরাচর চিকিৎসকগণ রুগ্নব্যক্তির রোগমুক্তি কল্পনায় যে সকল হিতকর দ্রব্যাদি যোজনা করেন তাহাকেই পথ্য বলা হয়। আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ রোগমুক্তি বিষয়ে সুপথ্যকে ঔষধাদি অপেক্ষাও অধিকতর উপকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা :—

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্যবিহিনানাং ভেষজানাং শতৈরপি ॥ (চরকসংহিতা।)

কেবল সুপথ্যাশী হইয়া ঔষধের সাহায্য ভিন্নও রোগমুক্ত হইতে পারা যায়। কিন্তু সুপথ্যাশী না হইলে শত সহস্র ঔষধ প্রয়োগেও রোগারোগ্য অসম্ভব।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের রুগ্ন ব্যক্তিদের জন্য জীবনীশক্তিবর্দ্ধক লঘুপাক বিদেশী মাংসরস ও দুগ্ধ এবং দুগ্ধের সমান গুণবিশিষ্ট অন্যান্য পথ্যের অভাব নাই। এতদ্ভিন্ন সাধারণ অবস্থায় সাগু, বার্লি প্রভৃতি বিলাতী পথ্যই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পথ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ কি উপায় অবলম্বন করিতেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রাচীন পণ্ডিতদিগের অনুমোদিত পথ্যাদি, প্রচলিত সাগু বার্লি প্রভৃতি পথ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ, হীন কি উৎকৃষ্ট তৎসম্বন্ধে আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জর,সকল রোগাপেক্ষা অধিকতর প্রাণক্ষয়কারী এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোগ্য। প্রাণিগণের উৎপত্তি এবং নিধনকালে অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ জ্বরের উৎপত্তির হেতু, চিকিৎসা ও পথ্যাদি সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করিয়াছেন। তরুণ জ্বরে যে পর্য্যন্ত জ্বরের উত্তাপাধিক্য, মুখ হইতে লালা নিঃসরণ, বিবমিষা, বমি, শরীর ও হৃদয়ের গুরুতা, মাথাধরা, তন্দ্রা, আলস্য, নিদ্রাধিক্য, উদরে অপাক, ক্ষুধার অভাব বর্ত্তমান থাকিবে সেই পর্য্যন্ত জ্বরের গুরুত্ব বিবেচনায় দুই হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত উপবাস থাকা কর্ত্তব্য। এই উপবাস শব্দে একেবারে পথ্য না করা বুঝাইবে না। অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহারই এই উপবাস শব্দের দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা :—

প্রাণাঃ বিরোধিনা চৈব লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ॥
এতচ্চ লঙ্ঘনং কার্য্যং যথা ন তদ্ বলহানিঃ।

অর্থাৎ এইরূপভাবে উপবাস করিবে যাহাতে শরীরের বলহানি না হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বরিত ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনায় এই লঘুপথ্যের, বিলেপী, মণ্ড, যুষ প্রভৃতি কতিপয় প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত তরুণ জ্বরের সকল অবস্থাতেই বিলেপী, মণ্ড ও যুষ ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে তরুণ জ্বরের আদি অবস্থায় বিলেপী প্রাথমিক পথ্য।

১। **বিলেপী**—যবের চাউল, মুগ কিংবা মুসুর ডাইল—ইহাদের যে কোনও একটি দ্রব্য গ্রহণ করতঃ তাহার চতুর্গুণ জলসহ মাটির হাঁড়িতে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিয়া জলের এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কাপড়ে ছাকিয়া জলীয় ভাগ গ্রহণ করিলেই বিলেপী প্রস্তুত হয়। যেমন যব ৫ তোলা ও জল ২০ তোলা একত্রে সিদ্ধ করতঃ ৫ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইলেই যবের বিলেপী প্রস্তুত হয়; এই বিলেপী পথ্যে যবাদির সারভাগ অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে গৃহীত হয়। কাযেই জ্বরিত ব্যক্তির প্রবল উদরাময় প্রভৃতির উপসর্গ বর্ত্তমান থাকিলে যে অবস্থায় অন্য কোনরূপ পথ্য জীর্ণ হওয়ার সম্ভব থাকে না; তদবস্থায় অথবা বালক বৃদ্ধ ও পথ্যাদিতে একান্ত বীতস্পৃহ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী পথ্য। এখন সকলেই মনে মনে চিন্তা করিতে পারেন যে, দীর্ঘকালোৎপন্ন যব প্রভৃতি দ্রব্যের

শ্বেতসার—যাহা বার্লি প্রভৃতি রূপে বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে তাহা, আর পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত যব প্রভৃতি স্থূল দ্রব্য হইতে কেবল জল ও অগ্নির সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে গৃহীত সারভাগ, এই দুইটির মধ্যে কোনটি লঘুপাক ও অধিকতর হিতকারী হইবে।

মণ্ড প্রস্তুত পদ্ধতি—যবের চাউল, খৈ, মুগ ও মুসূরীর ডাইল প্রভৃতির মধ্যে কোনও একটি গ্রহণ করতঃ তাহার চৌদ্দগুণ জলের সহিত জ্বাল দিয়া এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, পরে তাহা চট্‌কাইয়া দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করতঃ ছাকিলেই গাঢ় মণ্ড প্রস্তুত হয়। পথ্যাদি প্রস্তুত করিতে সর্ব্বদাই মাটির হাড়ি অথবা কালাই করা এনোমেলের পাত্রে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিতে হইবে। খৈ বা যবমণ্ড প্রস্তুত করিয়া রোগীর প্রবৃত্তি অনুসারে মিশ্রি, লেবুর রস অথবা শুধুই লবণ ও লেবুর রস সংযোগে সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। এই মণ্ড দাহ, পিপাসা ও বমন নিবারক এবং রোগীর জীবনীশক্তি রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উপযোগী। মুসূরী, মুগ প্রভৃতির যুষ প্রস্তুত করিতে হইলে এই নিয়মেই প্রস্তুত করিতে হয়। কেবল যুষ প্রস্তুত কালে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ লবণ দেওয়া আবশ্যক এবং ডাইলের দুর্গন্ধ অপনোদন জন্য আদা ও তেজপাতার সম্ভার দিতে পারা যায়।

মুগ ও মুসূরীর যুষের প্রতি আয়ুর্ব্বেদীয় পণ্ডিতগণ বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। যে অবস্থায় রোগীর দুগ্ধ সেবন প্রয়োজন অথচ উপসর্গাদির হিসাবে দুগ্ধ সহ্য হওয়ার ভরসা করা যায় না, সেই ক্ষেত্রে মুগ কিংবা মুসূরীর যুষ ব্যবহার করিবে। বর্ত্তমান যুগে খইর মণ্ডকে রোগীর পথ্য শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয় না, অনেকেই খৈর মণ্ডকে বিরেচক ও আমকারক বলিয়া মনে করেন। এমন কি, অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি খৈকে ময়দা ও আটার রুটি অপেক্ষা গুরুপাক মনে করিয়া রাত্রিতে দুধ খৈ ব্যবহার না করিয়া দুধ রুটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাসের কোনও অনুকূল যুক্তি বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে বিজ্ঞানানুমোদিত স্বীকার করিলে খৈ ও খৈর মণ্ডকে লঘু ও সুপথ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

যথা—যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষানি চ।
ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহু লাজামিতি মনীষিণঃ॥ (ভাবপ্রকাশ)

যে ধান হইতে তণ্ডুল প্রস্তুত হয় সেই সতুষ ধান্য ভাজিয়া ফুটাইয়া গ্রহণ করিলে তাহাকে খৈ কহে।

লাজাঃ স্যুঃ মধুরা শীতা লাঘবো দীপনাশ্চ তে।
স্বল্পমলমূত্ররুক্ষা বল্যা পিত্ত কফচ্ছিদঃ॥
ছর্দ্দ্যাতিসার দাহশ্চ মেহ মেদস্তৃষাপহা॥　　(ভাবপ্রকাশ)

শাস্ত্রীয় প্রমাণে পাওয়া গেল খৈ মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিদীপক, অল্প মলমূত্রকারী ; বমি,অতিসার,দাহ, পিপাসা, মেহ, মেদ ও পিত্তশ্লেষ্মা নাশক।

এক্ষণে যাঁহারা শাস্ত্রীয় প্রমাণ বিশ্বাস করিতে সম্মত নহেন তাঁহারা খৈ অথবা খৈর মণ্ডের প্রস্তুত পদ্ধতি চিন্তা করিয়া, দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে খৈ, রুটি ও বিস্কুট হইতে অনেক লঘু ; এবং খৈর মণ্ড বর্ত্তমান প্রচলিত সাগু বার্লি হইতে অনেকাংশে হিতকারী ও লঘুপাক পথ্য। যব অপেক্ষাও হৈমন্তিক ধান্য শীঘ্রপাকী। বৎসরাতীত হৈমন্তিক ধান্য অধিকতর লঘু। সেই বর্ষাতীত হৈমন্তিক ধান্যের এক মুষ্টি ধান্য ভাজিলে আয়তনে চারিমুষ্টি খৈ হয়। সেই খৈ চুর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিলে গম চূর্ণ (ময়দা) অপেক্ষা কতদূর লঘু হইল একটু চিন্তা করিলেই তাহা সহজে সকলেরই বোধগম্য হইবে।　　ক্রমশঃ

শ্রীবিপিন বিহারি সেনগুপ্ত
কবিরাজ।

মল-পরীক্ষা।

রোগীর মল পরীক্ষা করা চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই বিষয়ে আমরা অল্পই লক্ষ্য করিয়া থাকি। উদরাময় পীড়ায় যদিও মল পরীক্ষা করার প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু সকল স্থানে যথাযথভাবে তাহা পরীক্ষা করা হয় কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। অথচ ইহা চিকিৎসার এক প্রকার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাযেই এ সম্বন্ধে কিছু তত্ত্বসংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে জানান কর্ত্তব্য বোধে ইহা লিখিত হইল। *

মল পরীক্ষা করার পদ্ধতি অনেকের জানা নাই। অথবা জানা থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তদ্রূপ পরীক্ষা করার অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে আনুবীক্ষণিক এবং রাসায়নিক পরীক্ষার আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের অনেকেরই তদ্রূপ সরঞ্জাম নাই। তজ্জন্য তাহা হয় না।

খাদ্য দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী মলের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। কোন্ খাদ্যে কিরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা না থাকিলে মলপরীক্ষা কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। এই স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন হইতে পীড়িত অবস্থার পরিবর্ত্তন পৃথক্ করিতে হইলে বিশেষ প্রকৃতির খাদ্যের স্বাভাবিক এবং পীড়া জনিত পরিবর্ত্তন অবগত হওয়া আবশ্যক। ডাক্তার রবার্ট এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু আমাদিগের এবং সাহেবদিগের স্বাভাবিক প্রচলিত খাদ্য দ্রব্যের প্রকৃতি এবং পরিমাণের এত পার্থক্য যে তাহা উদ্ধৃত করা নিরর্থক।

প্রথম দিবস প্রথম বার নির্দ্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে ৫গ্রেণ কারমিন্ বা চারকোল ট্যাবলেট্ সেবন করাইয়া তাহার এক দিবস পরেও ঐরূপ ভাবে সেবন করাইলে কত সময় পর্য্যন্ত মল উদর মধ্যে থাকে তাহা স্থির করা যাইতে পারে। কারণ উহা দ্বারা মল রঞ্জিত হইয়া নিসৃত হয়। তদ্দৃষ্টে ইহা অনুমান করিয়া লওয়া অতি সহজ হইয়া থাকে।

চাক্ষুষ পরীক্ষা।

মল প্রথমে সাধারণভাবে চক্ষু দ্বারা দেখিয়াই পরীক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থার মলের পরিমাণ স্থির করিয়া বিশেষ কোনও স্থির মীমাংসায় সমাগত হওয়া যায় না। কারণ যে পরিমাণ মল দেখিতে পাওয়া যায় তাহার একতৃতীয়াংশ পরিমাণ কোন জীবাণু দ্বারা, এক চতুর্থাংশ অন্ত্রের শ্লেষ্মা এবং স্রাবের অসার অংশ দ্বারা এবং অপর এক তৃতীয়াংশ ভুক্ত দ্রব্যর পরিপাকাবশিষ্ট অংশের দ্বারা গঠিত হয়। এই কারণ জন্য খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস হইলেও হয়তো মলের পরিমাণ হ্রাস নাও হইতে পারে।

মলের প্রকৃতির বিষয় পরীক্ষা করিতে হইলে, স্বাভাবিক অবস্থায় কোন্ কোন্ খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা মলের কিরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহা জানা আবশ্যক।

অৰ্দ্ধ তরল মল।—অধিক পরিমাণ মেদময় খাদ্য, টাট্কা শাক-সব্জী, তরকারী ও ফলাদি এবং অধিক পরিমাণ পানীয় সেবন করিলে মল স্বভাবতঃ অৰ্দ্ধ তরলাবস্থায় বহির্গত হয়। তদ্ভিন্ন অৰ্দ্ধ তরল মল নিস্কৃতি পীড়াদ্যোতক। তবে ব্যক্তিগত স্বভাব জনিত ঐরূপ হইলে তাহা স্বভাবজ বলিয়া রোগ মধ্যে পরিগণিত হইবে না।

তরল মল।—খাদ্যের জলীয় অংশ শোষণ করার শক্তি, অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি সমূহে হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, অন্ত্রের ক্রিমি গতির প্রাবল্যে এবং অন্ত্র প্রাচীর হইতে অন্ত্রের জলীয় অংশের (রস, পূয, শ্লেষ্মা এবং রক্তাদি) স্রাব ইত্যাদি যে কোনও কারণ জন্য মল তরলাবস্থায় নির্গত হয়।

অতি তরল মল—অন্ত্রে জলীয় পদার্থ শোষণ শক্তির সম্পূর্ণ অভাব এবং অতিরিক্ত পরিমাণ রক্ত ও রস স্রাব জন্য মল অত্যন্ত তরলভাবে নির্গত হইতে পারে।

অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনায়ও ক্ষণস্থায়ী অতিসার হইতে দেখা যায়। এ অবস্থায় মলের প্রকৃতির কিছু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে মলের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প এবং কচিৎ দুর্গন্ধ যুক্ত হয়।

অত্যধিক রক্ত ও রস মিশ্রিত থাকার জন্য মল তরল হইলেও তাহার কিছু বিশেষত্ব থাকে। তরুণ রসস্রাবক কোলাইটিস্ পীড়ায় এইরূপ হয়। ইহাতে মল পরিমাণে অধিক, সাদা বর্ণ ফেণাযুক্ত হয় এবং অতি সামান্য মাত্র গন্ধ থাকে।

অত্যন্ত কঠিন মল—তরল পদার্থ গ্রহণের পরিমাণ অত্যল্প হইলে কিম্বা অধিক সময় অন্ত্র মধ্যে আবদ্ধ থাকার জন্য মল অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় নির্গত হয়।

কঠিন মলের আকার নানা প্রকারের হইতে পারে। মল সরু হইয়া বহির্গত হইলে বুঝিতে হইবে যে সিকম্ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত স্থানের কোথাও আক্ষেপ বা যান্ত্রিক কোন বিপর্য্যয় জন্য আংশিক অবরোধ হইয়াছে। অবরোধ অত্যধিক হইলে সরু নলের আকারে কঠিন মল বহির্গত হওয়ার পর অল্প পরিমাণে কোমল মল বহির্গত হইয়া থাকে। মলদ্বারের অবরোধ জনিত হইলে মল ফিতার আকৃতিতে বহির্গত হয়।

ছোট ছোট গুঁটলির আকৃতিতে মল বহির্গত হইলে বুঝিতে হইবে যে অন্ত্রের প্রাচীরের দুর্ব্বলতা বা আক্ষেপ বর্ত্তমান আছে। বড় বড় গুঁটলির আকারে বহির্গত হইলে বুঝিতে হইবে যে, কোলনের এবং সরলান্ত্রের প্রসারণাবস্থা বর্ত্তমান আছে।

বর্ণ।—মলের বর্ণ কিয়দংশ খাদ্য দ্রব্যের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। শর্করা ইত্যাদি খাদ্যের দ্বারা মলের বর্ণ হাল্‌কা হয়, মাংস খাদ্যের দ্বারা মলের বর্ণ কাল হয়। মল অধিকক্ষণ আবদ্ধ থাকিলে কিম্বা তাহাতে পচন উপস্থিত হইলে ঐ বর্ণ আরও গাঢ় হইতে পারে। মল বহির্গত হইয়া বহির্বায়ুতে অধিক্ষণ থাকিলেও উক্ত বর্ণ অধিক গাঢ় হয়। বাঁধা নলাকারের মলের বহির্ভাগের বর্ণ একটু কাল। কিন্তু তাহার আভ্যন্তরিক বর্ণ তদপেক্ষা কিছু হাল্‌কা থাকিলে বুঝিতে হইবে, সম্ভবতঃ উক্ত মল সিগ্‌মাইড্‌ বা সরলান্ত্র মধ্যে অধিকক্ষণ আবদ্ধাবস্থায় অবস্থিত ছিল।

টাটকা রক্ত সাধারণতঃ সিগ্‌মাইড্‌ বা সরলান্ত্র হইতে আসে। অন্ত্রের উর্দ্ধাংশ হইতে যদি অধিক রক্তস্রাব হয় এবং তৎসহ যদি অন্ত্রের ক্রিমিগতি প্রবল থাকে, তাহা হইলে সেই রক্ত সাধারণ রক্তের বর্ণে মলদ্বার হইতে বহির্গত হয়।

মেদোময় খাদ্য অধিক হইলে যকৃতের কার্য্য ভাল থাকিলেও মল কর্দ্দমের বর্ণ হওয়া স্বাভাবিক। কখন কখন এমন হয় যে, পিত্ত অন্ত্রে আসিয়া বর্ণ-বিহীন পৈত্তিক লবণ বিশিষ্ট হয়। এই অবস্থায় রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে হয় যে মলের স্বাভাবিক বর্ণহীনতার কারণ পিত্তের অভাব জন্য হইয়াছে কিনা।

শিশুদিগের মলের বর্ণ সবুজ হওয়া কখন কখন ক্রোমজেনিক্‌ জীবাণুর উৎপত্তি জনিত হইয়া থাকে। অন্ত্রের ক্রিমি গতির আধিক্য হইলেও মল সবুজ বর্ণ হইতে পারে। কারণ শিশুর এক বৎসর বয়সের মধ্যে মল সিকম্‌ পর্য্যন্ত আসিবার সময় মধ্যে পিত্তের বিলিরুবিন্‌ এবং বিলিভারডিন্‌, উরুবিনিনে পরিবর্ত্তিত হইতে সময় পায় না। এই বয়সের পর শিশুদিগের মল বহির্বায়ুতে অবস্থিত হওয়ায় সবুজ বর্ণ হওয়া স্বাভাবিক।

সাধারণ চক্ষে মল সহ যদি শ্লেষ্মা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে অন্ত্রের কোনও স্থানে প্রদাহ বর্ত্তমান আছে। কেবল মাত্র দুই স্থানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, গোলাকার কঠিন মলের গাত্র উজ্জ্বল পাতলা শ্লেষ্মা স্তর দ্বারা আবৃত দেখিলে বুঝিতে হইবে যে উক্ত মল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সরলান্ত্রমধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু মল কোমল হইলে উক্ত অবস্থায়ও শ্লেষ্মা দ্বারা আবৃত থাকে না। দ্বিতীয় মেম্‌ব্রেনাস কোলাইটিস পীড়ায় মলে শ্লেষ্মা থাকে কিন্তু সে অবস্থায় বাস্তবিক অন্ত্রপ্রদাহ থাকে না। এই অবস্থা ব্যতীত অপর সকল স্থানে শ্লেষ্মা দেখিলে বুঝিতে হইবে যে অন্ত্রে প্রদাহ বর্ত্তমান আছে।

মলদ্বার হইতে পরিষ্কার শ্লেষ্মা অবিমিশ্রিত অবস্থায় বহির্গত হইলে বুঝায় যে নিম্নগামী কোলন্ সিগ্‌মাইডে্ কিম্বা সরলান্ত্রের অন্য কোনও স্থানে শ্লেষ্ম-ধরা কলার প্রদাহ আছে। এইরূপ শ্লেষ্মা অতি অল্পসময় পরে পরেই এত শীঘ্র বহির্গত হইয়া আইসে যে উর্দ্ধ হইতে মল আসিয়া শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিত হওয়ার যথোপযুক্ত সময় প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু প্রদাহের বেগ অন্তর্হিত হইলে তৎপরে শ্লেষ্মার সহিত মল হালকাভাবে মিশ্রিত হইয়া বহির্গত হয়। বিশেষরূপে মিশ্রিত হয় না।

যখন পাতলা মল অল্প পরিমাণ চাপ্ চাপ্ দলা দলা কিম্বা স্তরবৎ শ্লেষ্মার সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত হইয়া বহির্গত হয় তখন কোলনের উর্দ্ধ ও নিম্নাংশে প্রদাহ বর্ত্তমান আছে বুঝিতে হইবে। প্রদাহ যত উর্দ্ধে হয় শ্লেষ্মাও তত সূক্ষ্ম ভাবে বিভক্ত হইয়া বহির্গত হয় এবং তত অধিক পরিমাণে মলের সহিত মিশ্রিত থাকে। এইরূপ শ্লেষ্মা বিশেষভাবে স্থির করিতে হইলে দুইখণ্ড কাঁচ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, নতুবা তাহা স্থির করা যায় না।

একটু শ্লেষ্মা মিশ্রিত মল লইয়া তাহা অল্প পরিমাণ জল সংযোগে ঘর্ষণ করিতে হয়। ইহার এক ফোঁটা একখণ্ড উপযুক্ত কাঁচফলকে স্থাপন করিয়া অপর একখণ্ড কাঁচফলক দ্বারা ঢাকিয়া দিয়া আলোকের দিকে রাখিয়া দিতে হইবে। এই ভাবে পরীক্ষা করিলে তাহাতে অতি সূক্ষ্ম শ্লেষ্মাখণ্ডও দেখিতে পাওয়া যায়। কোলনের উর্দ্ধ অংশের শ্লেষ্মা এবং ক্ষুদ্র অন্ত্রের শ্লেষ্মা এই

উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল মাত্র চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিমাত্র নিরূপণ করা যাইতে পারে না।

কোলনের নিম্ন অংশের তরুণ শ্লেষ্মবিতানের প্রদাহ থাকিলে একটু একটু পাতলা রক্ত দেখা যাইতে পারে। কিন্তু যখন লম্বা লম্বা রেখার আকৃতিতে শোণিত শ্লেষ্মার সহিত বিশেষ রূপে মিশ্রিত হইয়া বহির্গত হয় তখন বুঝিতে হইবে যে অন্ত্রমধ্যে ক্ষত হইয়াছে।

শ্লেষ্মার সহিত পূয মিশ্রিত হইয়া বহির্গত হইলে ইহাই বুঝায় যে গভীর স্তরের বিধান বিনষ্ট হইতেছে।

কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে সরের ন্যায় দ্রব্য স্তরে স্তরে বহির্গত হইতেছে, অথচ তাহা প্রকৃত শ্লেষ্মা নহে। দেখিতে ডিপ্থেরিয়ার ঝিল্লির ন্যায় দেখায়। ইহা প্রকৃত প্রদাহজ স্রাব নহে। অন্ত্রের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা জনিত স্রাব। অন্ত্রের শূলবং বেদনার লক্ষণ না থাকিলেও এইরূপ স্রাব হইতে পারে।

মলের সাধারণ চাক্ষুষ পরীক্ষার পর তাহার অল্প অংশ লইয়া আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করার জন্য রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট অংশ জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। এইরূপভাবে ধৌত করিতে হইবে যে তাহার অদ্রবনীয় এবং গন্ধ বিহীন অংশ অবশিষ্ট থাকে।

নির্দ্দিষ্ট খাদ্য আহারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, যে মল নির্গত হয়, তাহার সমস্ত অংশ ধৌত করিলে এইরূপ অদ্রবনীয় অংশ এক ড্রামের অধিক হয় না। কিন্তু ইহা আমাদের সাধারন খাদ্যের কথা নহে, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। ঐরূপ ধৌত করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা অনুসন্ধান করিলে যদি অতি সূক্ষ্ম পাতলা একটু শ্লেষ্মা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ক্ষুদ্র অন্ত্রের শ্লেষ্মবিতানে প্রদাহ আছে। কোলনের ঊর্দ্ধ অংশের সর্দ্দিযুক্ত প্রদাহেও ঐরূপ শ্লেষ্মা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি তাহা সবুজাভ হয় তাহা হইলে ক্ষুদ্র অন্ত্রে শ্লেষ্মবিতানের প্রদাহই নিশ্চিত বুঝিতে হইবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় মলে অতি অল্প সংখ্যক সংযোগ-তন্তুর সূত্র বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু যদি ইহার সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে পাকস্থলীর পরিপাক কার্য্যে বিঘ্ন হইতেছে—বুঝিতে হইবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় পৈশিক সূত্র সরল ভাবে থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহার সংখ্যা অতি অল্প, উক্ত সংখ্যা যদি অধিক হয়, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অংশে অধিক সংখ্যক থাকে তাহা হইলে ক্লোমগ্রন্থির ক্রিয়ার অভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় সংযোগ তন্তু এবং পৈশিক তন্তু যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

মলে মেদময় পদার্থের পরিমাণ স্থির করিতে হইলে অল্প কয়েক ফোঁটা এসিটিক এসিডের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করতঃ মেদাম্লের উজ্জ্বল দানার সংখ্যা স্থির করিতে হয় সামান্য পরিমাণ দানার সংখ্যা থাকিলে তাহাতে কোনও পীড়া বুঝায় না। কিন্তু উক্ত পদার্থ শ্লাইড্ ও কভার গ্লাসের মধ্যে বিস্তৃত করিলে যদি মেদময় দেখায় এবং বিন্দু বিন্দু মেদ ও অসংখ্য দানা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মল সহ অধিক মেদ নির্গত হইতেছে। খাদ্য সহ অধিক পরিমাণ মেদময় পদার্থ থাকিলে অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষয় জনিত পরিবর্ত্তন, অন্ত্রে পিত্তের অভাব এবং ক্লোম গ্রন্থির স্রাবের অল্পতা ঘটে। তজ্জন্য মেদময় পদার্থ শোষিত হইতে না পারায় মেদময় মল নির্গত হয়।

মলে অতিরিক্ত মেদ ও পিত্তের অভাব সহজে স্থির করা যাইতে পারে। অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষয় অতি বিরল ঘটনা। তৎসহ অপরাপর যন্ত্রের মেদাপকর্ষতা বর্ত্তমান থাকে। তাহা সহজে স্থির হইতে পারে। উল্লিখিত তিনটি অবস্থা জনিত না হইয়া অপর কারণ জন্য হইলেও সেই কারণ, ক্লোম গ্রন্থির স্রাবের অভাব জন্য হইয়াছে কিনা, তাহাও সহজে স্থির করা যাইতে পারে। পরন্তু ক্লোমগ্রন্থির স্রাবের অল্পতা প্রযুক্ত হইলে, যেমন মলে মেদের পরিমান অধিক হয় তেমনি তৎসহ পৈশিক সূত্র যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে কখন কখন মধুমেহ পীড়া হইলেও মলে মেদ এবং পৈশিক সূত্র অত্যধিক পরিমাণে বহির্গত হয়।

অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইলে সব্‌লাইমেট্ পরীক্ষা দ্বারা বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়। এই পরীক্ষা করিতে হইলে ৫ (সি, সি,) পরিমাণ মল একটি কাচনলে (test tube) রাখিয়া তাহার সমপরিমান ক্লোরাইড্ অব্ মারকুরির গাঢ় দ্রব মিশ্রিত করত ২৪ ঘণ্টাকাল স্থির ভাবে

রাখিয়া দিতে হইবে। মলের সহিত অন্ত্রে পিত্ত না থাকিলে ইহার বর্ণ লাল আভাযুক্ত হয় না। পিত্ত স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় থাকিলে উক্ত বর্ণ লাল আভাযুক্ত হয়। মলের অংশের সহিত বিলিরুবিণ মিশ্রিত থাকিলে সবুজ বর্ণ হয় এইরূপ প্রতিক্রিয়ায় ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে আসিবার কালীন উরুবিলিনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন ব্যতীতই তাহা আসিয়াছে।

মলে অদৃশ্য রক্ত পরীক্ষা করা অনেক সময় বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে। পিত্তস্থলীর পীড়া এবং পক্কাশয় বা ডিওডিনমের (গ্রহণী নাড়ীর) ক্ষতের পার্থক্য এই উপায়ে নির্ণীত হইতে পারে। প্রবল বমন হইলে বান্ত পদার্থে সামান্য পরিমাণ রক্ত থাকিতে পারে। কিন্তু পুনঃ পুনঃ তাহা পরীক্ষা করিয়া যদি তাহাতে রক্ত না পাওয়া যায় তাহা হইলে ক্ষত থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু বান্ত পদার্থে অতি সামান্য পরিমাণ অদৃশ্য রক্ত থাকিলেও ক্ষত থাকারই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তৎসহ যদি বিবমিষা প্রবল থাকে, বান্ত পদার্থ অতি সামান্য পরিমাণে উদগৃত হয় এবং এত অল্প পরিমাণ রক্ত মিশ্রিত থাকে যে তাহা বিশেষ পরীক্ষা না করিলে স্থির করা যায় না, তাহা হইলে ক্ষতসম্ভাবনার প্রতি সন্দেহ করিবার আর কোনও কারণ থাকে না।

তার্পিন্-গোয়েক পরীক্ষা করিলেই শোণিত স্থির নির্ণয় হইতে পারে। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় শোণিত কণা দেখিতে না পাইলেও শোণিতের বর্ণদ পদার্থের প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মলের সহিত এক তৃতীয়াংশ গ্লেসিয়াল এসিটিক এসিড্ একত্র করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করার পর ইথর মিশ্রিত করিয়া আলোড়িত করিতে হইবে এই মিশ্রিত পদার্থের এক কিম্বা দুই ড্রাম একটি টেষ্ট টিউবে রাখিয়া তাহাতে নূতন প্রস্তুত দশ ফোঁটা টিংচার গোয়েক এবং ২০ ফোঁটা তারপিন তৈল মিশ্রিত করিলে যদি বেগুনী বা নীলবর্ণ ধারণ করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উক্ত মলে শোণিত মিশ্রিত আছে। অস্ত্র চিকিৎসকের পক্ষে এই পরীক্ষা বিশেষ আবশ্যক। কারণ বৃহৎ অন্ত্রের পুরাতন ক্ষত বা কার্সিনোমা লুকাইত অবস্থায় থাকিলে অবরোধের লক্ষণ উপস্থিত না হওয়া

পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু যখন এই লক্ষণ উপস্থিত হয় তখন আর রোগীর আরোগ্য হওয়া সম্ভাবনা থাকে না।

মল পরীক্ষায় নিয়তঃ শোণিত প্রাপ্ত হওয়া যায়। অথচ শোণিত স্রাবের কারণ স্থান ঠিক হয় না। নাসিকা, মুখ, গলকোষ ইত্যাদি স্থান হইতেও শোণিত স্রাব হয়। এই অবস্থা হইলে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া কোথায় ক্ষত আছে তাহা স্থির করা আবশ্যক। কারণ, পীড়ার প্রথম অবস্থায় তাহা স্থির করিয়া অস্ত্রোপচার করিতে পারিলেই রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে নতুবা কোন সুফল হয় না।

শ্রীঃ—

দ্রব্যগুণ তত্ত্ব।

পলাশ।

জাতি ও পরিচয়—লিগিউমিনোসি জাতীয় বিউটিয়া ফ্রণ্ডোসা নামক বৃক্ষ। এই বৃক্ষ অত্যন্ত উচ্চ হয়। ইহা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। উত্তর পশ্চিম হিমালয় দেশ হইতে ঝিলাম নদীতট পর্য্যন্ত স্থান, এবং কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলের পার্ব্বত্যদেশে ইহা অত্যন্ত বেশী পরিমাণে হয়। রাঢ় ও বঙ্গদেশে ইহা খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

পলাশপত্র ত্রিপর্ণ—একটি বৃন্তে তিনটি পাতা থাকে। সাধারণ বৃন্ত অতি দীর্ঘ। মধ্যস্থ পত্রের বৃন্ত পার্শ্বস্থ পত্রদ্বয়ের বৃন্ত অপেক্ষা দীর্ঘতর হয়। মধ্যস্থ পত্র কচিৎ কিঞ্চিৎ সগহ্বরাগ্র হইয়া থাকে। পত্রোদর রোমাঞ্চিত এবং চিক্কণ হয়। পুষ্পিত হওয়ার পরে বসন্তকালে এই বৃক্ষ পত্রবিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। পুনরায় বর্ষাকালে প্রথম বারিপাতে পলাশতরু নবপত্রে ভূষিত হয়।

পলাশপুষ্প ব্যাঘ্রনখবৎ বক্র হয়। বসন্তের প্রারম্ভে ইহার উদ্ভব হইয়া থাকে। রাজনির্ঘণ্টুমতে রক্ত, পীত, শুভ্র ও নীল পুষ্পভেদে, পলাশ চারি প্রকার। সাধারণতঃ রক্ত পলাশই এতদ্দেশে দৃষ্ট হয়। কমলা রংএর সহিত লাল রং মিলাইলে যে প্রকার বর্ণ হয় ইহার ফুল ও প্রায় তদ্রূপ

লাল বর্ণ হইয়া থাকে। পুষ্প সকল গুচ্ছাকারে অশাখ পুষ্পদণ্ডে সংলগ্ন থাকে। পলাশফুলের 'কুণ্ড' মখমলের মত কোমল, কৃষ্ণবর্ণ, ঘননিবিষ্ট রোমে আবৃত। ইহার ফুলের দল শিম্বিজাতীয় ফুলের দলের অনুরূপ হইয়া থাকে। পলাশের বীজ শিমের ন্যায় চ্যাপ্টা এবং পাতলা হয়। বীজের আবরণ পাতলা কাগজের মত হয়। অভ্যন্তরে একটি মাত্র বৃক্কাকৃতি বীজ থাকে।

পলাশ বৃক্ষের ত্বক কাটিয়া দিলে কর্ত্তিত স্থান হইতে অথবা বর্ষাকালে স্বভাবতঃই কাণ্ডের গাত্রে ছিদ্র হইয়া, একপ্রকার আঠাবৎ নির্য্যাস বাহির হয়। উহা এতদ্দেশে পলাশগঁদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গদকে ইংরাজীতে বেঙ্গল কাইনো (Bengal Kino) উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কম্‌বকস্‌ এবং বোম্বাই অঞ্চলে চিনিয়া গঁদ্‌ বলে। বৃক্ষগাত্র হইতে এই নির্য্যাস বাহির হইবার কালিন ইহা কাচবৎ সচ্ছ থাকে। পরে ক্রমশঃ বাতাসের সংস্পর্শে গাঢ় পীত বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং পুরাতন হইলে উক্ত বর্ণ আরও গাঢ়তর হইয়া থাকে। শুষ্ক আঠা অল্প চাপে গুড়াইয়া যায় এবং জলে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইলে উহা পরিস্কৃত হয়।

পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মা পার্ব্বতীর শাপে পলাশ বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, ব্রহ্মার মাংসে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এই কারণে পলাশ বৃক্ষ ব্রহ্মার স্বরূপ বলিয়া অভিহিত। পদ্মপুরাণে ইহার দর্শন, স্পর্শন ও সেবার দ্বারা পাপ নাশ হয়, এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহা দুঃখ আপদ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তিগণের দুঃখাদি নাশক বলিয়া বৈদিক যুগের আর্য্যগণ ইহাকে পূজা করিতেন।

পর্য্যায়—সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে ইহার অনেকগুলি পর্য্যায় নাম আছে। যথা—কিংশুক, পর্ণী, যাজ্ঞিক, বীজ স্নেহ, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ ব্রহ্মবৃক্ষ, সমিদ্বর, ত্রিপর্ণ, বক্রপুষ্প পূতদ্রু, কাষ্ঠদ্রু ও ব্রহ্মোপনেতা। সমস্ত শব্দই পলাশ বৃক্ষকে বুঝায়।

দেশভেদে নাম—বাঙ্গলা—পলাশ; হিন্দি—ঢাক, ধাক; বুন্দেলকন্দ—ছলছ্‌; কোল—মুরুৎ; সাঁওতাল—মুরুপ; বেহার—পলস্‌ বা করস্‌; নেপাল—পলাশী, বুলচেত্র; উড়িয়া—পরাসু; গোণ্ড ও কুর্গ—মুরব; গুজরাতী—পলাশ, খাকার, খগদো, খাখরণুঝাড়; কচ্ছ—খাকর, পালাস; মারহাট্টি—পরুস,

পলস্, ফলাসাচা-ঝাড়; কক্রাচা-ঝাড়; তামিল—পোরসন, পরস, মুরুক্কন, পুরৈব, পুরসু, পলাশম্; তেলেগু—মোদুগ, মোহতু, টেল্লমুদুগু, মুদুগুচেট্টু, পলাসমু, পলাবমু, পালাসুম, কিংশুকমু, মোতুকু, পালাস, মোদগমর্ণলু; কনাড়ী—মুত্তুগ, থোরাস, মুত্তুগমরা মুত্তুগ গিদা; মলয়—মুরুক্ক মবম; পারস্ত—দরখতে পলাহ, পলহ; সিঙ্গাপুর—গসকোয়েলা বা গসকিএলা, কালিয়া; ব্রহ্ম—পৌক্, পাব, পিন্; ইংরাজীতে ইহাকে Butica gum, Bengal kino, এবং Bastard teak বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।

পলাশ পুষ্প—ধারক, নির্ম্মলতাকারক, মূত্রবৃদ্ধিকর এবং কামোদ্দীপক।

বস্তিদেশে (Bladder) পলাশ পুষ্পের দল বিছাইয়া অথবা বাটিয়া পুল্টিষের মত, বান্ধিয়া রাখিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগ অপনোদিত হয়। স্ত্রীলোকের আর্ত্তব-বদ্ধ-জনিত রোগে ইহার পুল্টিশ প্রয়োগ করিলে আর্ত্তব নিস্রুত হইয়া থাকে। (১)

কোষপ্রদাহে (orchitis) পলাশ পুষ্প বাটিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলে প্রদাহ জনিত জ্বালার উপশম হয়।

করঞ্জার বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশ পুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহা মধু জল বা ছাগ দুগ্ধে ঘর্ষণ পূর্ব্বক অঞ্জন প্রদান করিলে পুষ্প নামক নেত্র রোগ আরোগ্য হয় (ভাবপ্রকাশ)।

পলাশ পুষ্পের ফাণ্ট (Infusion) সোরার সহিত মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগে সেবন করাইলে প্রস্রাব সহজে নির্গত হইয়া থাকে।

পলাশ বীজ—ইহা ঈষৎ রেচক এবং ক্রিমিনাশক। শার্ঙ্গধর ও ভাবমিশ্র এই উভয় গ্রন্থকারই পলাশবীজের মৃদু বিরেচকত্ব ও ক্রিমিনাশত্ব গুণের উল্লেখ করিয়াছেন।

---

(১) রোস্তমজি নসেরওয়াঞ্জী কোরি এবং নানাভাই নব্রসজী কৎরক্ কৃত Materia Medica of India and their Therapeutics.

ব্যবহারের পূর্ব্বে ইহার বীজ জলে ভিজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিতে হয়। তাহাতে উপরের খোসা দুইটি পৃথক করিতে অতি সহজ হইয়া থাকে। পরে ভিতরের শস্য ঔষধার্থে প্রয়োগ করিতে হয়।

পলাশ বীজের রস কিম্বা পেষিত পলাশ বীজ তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে ক্রিমিরোগ আরোগ্য হয়। (সুশ্রুত—উঃ ৫৪ অঃ)

কেচোর মত এবং ফিতার মত ক্রিমি বিনষ্ট করিবার জন্য পলাশ বীজ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

ডাক্তার অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ বলেন ১০ রতি মাত্রায়, উপর্য্যুপরি তিন দিন, দিনে তিনবার, ইহার চূর্ণ সেবন করাইয়া চতুর্থ দিবস প্রাতে এরণ্ড তৈল দ্বারা বিরেচন করাইলে ইহা দ্বারা কৃমি নির্গত হইয়া থাকে।

ইহা সেবন করাইলে যদি ইহার ক্রিমিনাশক গুণ প্রকাশ না পায় তাহা হইলে কোন কোন রোগীতে ইহা দ্বারা মুহুর্ম্মুহু বিরেচন, বমন ও মূত্রকোষে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইতে দেখা যায়, এইজন্য ইহা অতি সাবধানে রোগীর ধাতুপ্রকৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পলাশ বীজের কাথ দুগ্ধের সহিত সেবন করিয়া পশ্চাৎ আরও দুগ্ধ পান করিলে অতিসার আরোগ্য হয়। বিরেচন যোগ্য অতিসারে এই কাথ সেবন করাইলে বিরেচন হইয়া অতিসার নিবৃত্তি পায়।

(চরক চিঃ ১০ অঃ)।

যে সমস্ত স্থলে ক্রিমিজনিত পেটফাঁপা, অজীর্ণ, অল্প অল্প পাতলা নানা বর্ণের মল নির্গমন প্রভৃতি উপসর্গ থাকে তত্তৎস্থলে এই যোগটি বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

পলাশ বীজ ও যজ্ঞডুমুর তিলতৈল সহ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মধু সহযোগে যোনিতে প্রলেপ দিলে যোনির শিথিলতা নষ্ট হয়।

(বঙ্গসেন—স্ত্রীরোগচিকিৎসা)

আকন্দের আঠায় পলাশ বীজ পেষণ পূর্ব্বক লেপ দিলে বৃশ্চিক দংশন জন্য যাতনা নিবৃত্তি পায়। (বঙ্গসেন—বিষাধিকার)

পলাশ বীজ লেবুর রসে পেষণ পূর্ব্বক, রজককণ্ডু (Dhobis itch) দদ্রু, বেদনা-বিজ্জিবত-ক্ষত এবং ভগন্দরে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার

পাওয়া যায়। উক্ত প্রলেপ কোনও সুস্থ চর্ম্মের উপর প্রয়োগ করিয়া সেই স্থান ব্লিষ্টার প্রয়োগের মত লাল হইয়া উঠে।

পলাশ বীজে এক প্রকার সচ্ছ ও নির্ম্মল তৈল পাওয়া যায় কোনও কোনও স্থানে ইহাকে মুদুগ্ তৈল বলে। এই তৈল ক্ষতরোগ প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়।

পলাশ পত্র—ধারক, বলকারক কামোদ্দীপক, কষায় ও রসায়ন ইহা অতিসার, ক্রিমি-শূল, শোষের ঘর্ম্ম, সোমরোগ, রক্তপ্রদর, মুখদিয়া জল উঠা (pyrosis) প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

ইহার পাতা বাটিয়া গরম করতঃ পুল্টিষ প্রদান করিলে ব্রণশোথ (abscess) বিলীন হয়। পত্রের কাথ প্রস্তত করিয়া তদ্দ্বারা অতিসার রোগে গুহ্যদেশে এবং প্রদর রোগে যোনিতে পিচকারী দিলে রোগ উপশমিত হয়। গলক্ষতে কিম্বা মুখক্ষতে ইহার কবল করিলে ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

সমভাগে তিলতৈল ও গব্য ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পলাশপত্র ভাজিয়া দধির সরের সহিত তাহা অর্শ রোগীকে সেবন করাইলে অর্শরোগ আরোগ্য হয়। (চরক, চিঃ ৯ অঃ)।

বৃন্দ বলেন—জ্বররোগীর বাহ্যদাহ নিবারণার্থ পলাশপত্রের প্রলেপ হিতকর।

ভাবমিশ্র বলেন পলাসের কচিপাতা কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে জ্বরের দাহ নিবারিত হয়।

অর্শের বলি ও বাগী প্রভৃতিতে পলাশপত্রের পুল্টিশ লাগাইলে উপকার হয়।

গর্ভের প্রত্যঙ্গ সমুহ ব্যক্ত হওয়ার পূর্ব্বে দুগ্ধপিষ্ট একটি কাচা পলাশ পত্র সেবন করাইলে গর্ভিণী বীর্য্যবান পুত্র প্রসব করে। (ভাবপ্রকাশ)

ব্রণ অথবা ঘামাছির জন্ম ফোড়ায় ইহার পুল্টিষ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

উদরাধ্মান জনিত পেটবেদনায় পেটে পলাশপত্রের প্রলেপ প্রয়োগ করিলে বেদনা ও পেটফাঁপা উপশমিত হয়।

ক্ষয়কাস জনিত ক্ষত ও রক্তস্রাব সম্বন্ধিয় রোগে পলাশ পত্রের সদ্য-নিষ্কিক্ত রস সেবনে বিশেষ ফল দর্শে।

পলাশ ত্বক—পলাশের ছালের কাথ ও কল্কদ্বারা যথাবিধি পক্ব ঘৃত মধুসহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ আরোগ্য হয় (চরক চিঃ ৪ অঃ)

বাগ্‌ভট্ট শৃতশীত পলাশ ত্বকের কাথ চিনি কিম্বা মধু ও ঘৃত সহযোগে রক্তপিত্ত রোগীকে পান করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা রক্তপিত্তের একটি অতি উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ।

আদার সহিত ইহার ছাল বাটিয়া খাইলে সর্পদংশন জনিত বিষজ্বালা নিবারিত হয়।

ডাক্তার সেপার্ড (Shepherd) লিখিয়াছেন অহিফেনজাত মর্ফিয়া (morphia) নামক দ্রব্য শ্বেতবর্ণ করিতে পলাশ ত্বকের কয়লা বিশেষ আবশ্যক হয়।

পলাশ নির্য্যাস—পলাশের গঁদ তীব্র সঙ্কোচক। ইহা বিলাতী "কাইনো" নামক ঔষধের উত্তম প্রতিনিধি। যে যে পীড়ায় কাইনো ব্যবহৃত হয় তত্তাবৎ পীড়াতেই ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে।

চরক, কুষ্ঠরোগে পলাশ নির্য্যাসের প্রলেপ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। (সূ—৩ অঃ)

বঙ্গসেন, নেত্ররোগ চিকিৎসায়, পিত্তাভিষ্যন্দ (conjunctivitis) রোগে পলাশের নির্য্যাস, অঞ্জনার্থ ব্যবহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

রক্তচন্দন ১ ভাগ, সৈন্ধব ২ ভাগ ও পলাশ গঁদ ৪ ভাগ, সমুদয়ের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে অধিমাংসার্ম্ম (Pterygium) ও শুক্র (Opacity of the Cornea) নামক নেত্ররোগ আরোগ্য হয়।

(চক্রদত্ত)

পলাশ ক্ষার—পলাশের বল্কল পোড়াইয়া ভস্ম করতঃ জলে গুলিয়া ছাকিয়া তাহা অগ্নিসন্তাপে শুষ্ক করিয়া লইলে যে শ্বেতবর্ণ দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাকে পলাশক্ষার কহে।

পিপুলের চূর্ণের সহিত পলাশ-ক্ষার-জলের ভাবনা দিয়া তাহা সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়। (ভাবপ্রকাশ)

ত্রিগুণ পলাশক্ষারোদক এবং ত্রিকটুর কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া অর্শরোগীকে পান করাইলে অর্শের বলি নিশ্চিত পতিত হয়। (চক্রদত্ত)

পলাশের ক্ষার ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, শঙ্খভস্ম ৩ তোলা, কদলী মূল বা আকন্দ পাতার রসে মাড়িয়া ৭ বার লেপ দিলে লোমযুক্ত স্থান নির্লোম হয়। (শার্ঙ্গধর)

পলাশ ক্ষারোদক দ্বারা বিপক্ক ঘৃত রক্তগুল্ম রোগগ্রস্থা নারীর পক্ষে একটি মহৌষধ। (ভাবপ্রকাশ)

বেদে পলাশবৃক্ষের উল্লেখ রহিয়াছে।* নন্দনকাননস্থ ইন্দ্রাণীর অঙ্গরাগকর পারিজাত পুষ্পই মর্ত্ত্যধামে গন্ধহীন পলাশ বলিয়া পরিচিত। সোম (চন্দ্র) পলাশপ্রিয়। পলাশের কাষ্ঠ নবগ্রহ যাগ জন্য হোমাদিতে ব্যবহৃত হয়। বৌদ্ধেরা পলাশ বৃক্ষকে পবিত্রজ্ঞান করিয়া থাকেন।

শ্রীচন্দ্রকান্ত দাশগুপ্ত।

বিসূচিকা রোগ

ও

আয়ুর্ব্বেদ মতে তাহার সরল বৈজ্ঞানি চিকিৎসা।

মুখবন্ধ

পাঠক গণের অবগতির জন্য এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী মন্তব্য নিম্নে দেওয়া গেল। যথা—

১। প্রবন্ধের কলেবর একটু বড় হইবে। তাহার কারণ এই যে, কবিরাজীর উপরে শ্রদ্ধা থাকিলেও নানা কারণে আয়ুর্ব্বেদের অবনতির দরুণ, প্রকৃত প্রস্তাবে কবিরাজ অপেক্ষা ডাক্তারের উপর লোকে ভক্তি, ও শ্রদ্ধা অধিক দৃষ্ট হয়। সমাজের এরূপ অবস্থায়, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রবন্ধ লিখিলে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা দুঃসাধ্য। এই কারণে কি অবতরণিকা, কি মূল প্রবন্ধ, উভয়ই একটু বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করা গিয়াছে। আর এই উপলক্ষে অনেক বাজে কথারও উল্লেখ করিতে হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ নিতান্ত খাটী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, গভর্ণমেণ্ট বা ডাক্তার সম্প্রদায়, কবিরাজীর পথাবলম্বন পূর্ব্বক অর্থাৎ বিসূচিকা

রোগে সহসা যে উক্ত মতের চিকিৎসার পক্ষপাতী বা পৃষ্ঠপোষক হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। সুতরাং সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রবন্ধকারের প্রধান সহায় ও অবলম্বন। ঐ সম্প্রদায় সত্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলে, সহজেই সমাজে সত্যের প্রচার হইতে পারিবে। আবার আজকালের অবস্থায় পতিত কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত ওলাউঠার প্রবন্ধ একটু বিস্তারিত ভাবে না লিখিলেও সাধারণের দৃষ্টি ঐ দিকে প্রতিত হইবে কিনা সন্দেহ। ধনে ও পলতা ঘটিত বৈজ্ঞানিক তত্ব উপাদেয় হইলেও, নীরস ও তিক্ত বলিয়া সংসারাবর্ত্ত-বিভ্রান্ত সাধারণের চিত্তকে সরস ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ বিস্তার ক্রমে লেখার প্রয়োজন।

২। কেহ কেহ ইহারই মধ্যে প্রবন্ধ কারের লিখিত অন্য পুস্তক সম্বন্ধে (More Qcademic than practical) বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা কেহই চিকিৎসক সম্প্রদায় ভুক্ত নহেন। যাহা হউক, এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কেহ ঐরূপ না ভাবেন, তজ্জন্য সরলভাবে জানাইতেছি যে, আমি নিজের জীবনে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি ও কার্য্যক্ষেত্রে যে সত্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি তাহাই অকপটে প্রকাশ করিব। প্রবন্ধে কবিত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু "ভাবুকতা" নাই। আমার বিশ্বাস, এই প্রবন্ধের প্রণালীমতে আয়ুর্ব্বেদের বিধানানুযায়ী ওলাউঠা রোগীর চিকিৎসা হইলে, প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা হইতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুসংখ্যা অধিকতর হ্রাস হইবে।

৩। আমি এযাবৎ ওলাউঠা রোগগ্রস্থ প্রায় ২০ বিশটি রোগীর চিকিৎসার সুযোগ পাইয়াছি। অবশ্য, কবিরাজগণ কলেরা রোগী বেশী পান না। যাহাহউক, উক্ত ২০টী রোগীর মধ্যে ১৯শ টী রোগীকে আয়ুর্ব্বেদ মতের চিকিৎসায় আরাম করিতে সমর্থ হইয়াছি। একটি রোগী নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, সেটীও নিতান্ত আমার দোষে হয় নাই। কারণ, সন্ধ্যার সময় তাহার কলেরা হয় এবং সমস্ত রাত্রি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার পর, পরের দিন ৮টার সময় রোগী আমার চিকিৎসাধীনে আসে। রোগীর বয়স ২বৎসর মাত্র ছিল এবং তাহার লোকবলও ছিল না। আমার চিকিৎসাধীনে আসার ৩।৪ ঘণ্টা পরেই রোগীর মৃত্যু হয়।

৪। ওলাউঠার চিকিৎসা প্রণালী ও ঔষধাবলী। এই প্রবন্ধের চিকিৎসা স্থানের কতিপয় পৃষ্ঠার মধ্যেই শেষ করা গিয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে ঐ কতিপয় পৃষ্ঠার উপদেশই রোগীর আরোগ্যের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু, ঐ চিকিৎসার সমর্থনার্থ বহুবিধ যুক্তি, তর্ক ও নজীরের উল্লেখ করিতে হইয়াছে বলিয়া প্রবন্ধের কলেবরও বাড়াইতে হইয়াছে। সর্ব্ববিধ রোগের চিকিৎসা স্থলে কবিরাজী মতের চিকিৎসার প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা পুনরায় আকৃষ্ট হইলে, তখন আর ঐরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না।

অবতরণিকা।

যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে যখন কবিরাজী মতে ওলাউঠা চিকিৎসার প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, তখন শাকেতেই যোড় হাত করা অর্থাৎ ভূমিকাতেই আমাদের কৈফিয়ৎ দেওয়ার একান্ত দরকার বিবেচনা করি। আজ কাল সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি অনেকের ভক্তি বিশ্বাস থাকিলেও, অস্থানে পতিত বেওয়ারীশ মালের মত, নানা হাতে পড়িয়া উহাদের নানা প্রকার দুর্গতি ও লাঞ্ছনা হইতে দেখিয়া, শিক্ষিত জনসাধারণ কবিরাজ গণের প্রতি আর তাদৃশ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। বরং অনেক স্থলে এরূপ ও দেখা যায় যে, কেহ কেহ আয়ুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রতি মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও, কার্য্যকালে "Praise the sea, but keep on land অর্থাৎ সমুদ্রকে প্রশংসাকর, কিন্তু তীর ছাড়িয়া যাইওনা," এই নীতি সূত্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ করিবার হেতু অবশ্যই আছে। চরক বলেন—"ন চাঙ্কুরোৎপত্তিরবীজাৎ" অর্থাৎ বীজ বা কারণ ভিন্ন, অঙ্কুর বা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। সাংখ্যকার ও বলিয়াছেন, "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ" অর্থাৎ বিনা কারণে কিছুই হয় না। শ্রদ্ধা করিবেনই বা কিরূপে? পাশ্চাত্য মতের চিকিৎসার যেরূপ বিদ্যালয় আছে, উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা বাছাই করিবার জন্য যেরূপ পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন আছে, কবিরাজী শাস্ত্রের শিক্ষার জন্য সেরূপ কোন সুবন্দোবস্ত নাই। কার্য্যক্ষেত্রে

যিনি যেরূপ কৃতিত্বেরই পরিচয় না দেন কেন, এল, এম্, এস—এম্, বি ও এম্, ডি প্রভৃতি উপাধি দেখিয়া ডাক্তার গণের পার্থক্য একপ্রকার ঠিক করা যাইতে পারে। কিন্তু, কবিরত্ন ও কবিশেখর প্রভৃতি বহু চাকচিক্যশালী উপাধি দেখিয়া কবিরাজগণের পার্থক্য ঠিক করা জনসাধারণের অসাধ্য। কাজেই, কবিরাজগণের প্রতি সাধারণের যে তাদৃশ আস্থা নাই, তাহার কতকটা কারণও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর, "হেতু প্রভাব নিশ্চিতঃ স্যাৎ" অর্থাৎ কারণের কার্য্যকারিতা থাকিবেই। তবে যে কেবল কবিরাজগণেরই দোষে সর্ব্ববিধ রোগের চিকিৎসায় লোকে কবিরাজী চিকিসার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে না তাহা নহে। সকল দেশেই চিকিৎসা শাস্ত্রের দুইটী বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। (১) বৈজ্ঞানিক বিভাগ; (২) কার্য্যকর বিভাগ। বৈজ্ঞানিক বিভাগে চিকিৎসা সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়া থাকে। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে, দ্রব্যগুণ বিষয়ে, চিকিৎসার প্রণালী সম্বন্ধে এবং ঔষধ প্রস্তুতির বিষয়ে, নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়াই প্রথমোক্ত বিভাগের কার্য্য। যাঁহারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য এইরূপ আলোচনাদি করেন, তাহারা সুধু রোগীর চিকিৎসা করিয়াই বেড়ান না। প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট বা ধনীসম্প্রদায় সাধারণতঃ ঐসমস্ত বিজ্ঞানবিদ ও চিকিৎসা তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিত গণের ভরণ পোষণাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কার্য্যকর বিভাগে ডাক্তারগণ চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত ও উপদিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা করিয়া থাকেন। পরন্তু, কার্য্যক্ষেত্রে উক্ত উভয় প্রকার পণ্ডিতগণই পরস্পরের সাহায্য করিয়া থাকেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের এইরূপ ব্যবস্থা যে অতি সুব্যবস্থা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা শাস্ত্রের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে এই দেশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

ভারতের যখন সুদিন ছিল, তখন ইহা এবং ইহা হইতেও উৎকৃষ্টতর উপায় সকল অবলম্বন করা হইত। সমাজের জ্ঞানেন্দ্রিয় মুনিঋষিগণ, বিজ্ঞানাদির আলোচনা করিতেন; আর সমাজের কর্ম্মেন্দ্রিয় ভিষকগণ কার্য্যক্ষেত্রে সেই মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া চিকিৎসা কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। অথচ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের

সহানুভূতি ছিল এবং পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়া বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতেন। হয় এক আমির, না হয় এক ফকীরই সমাজে সত্য প্রচার করিতে প্রকৃতভাবে সমর্থ হয়।

"নৈবকুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসা পণ্যবিক্রয়ম্।
ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্ন বৃত্তয়ে॥"

অর্থাৎ লোভের বশীভূত হইয়া কদাচ চিকিৎসা বিক্রয় করিবেনা। যদি দরকার হয়, তবে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য বসুমতীর অধীশ্বরদিগের অর্থাৎ রাজার নিকট ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবে। যে ভারতের শাস্ত্রীয় উপদেশ এইরূপ, সে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিলে রোমাঞ্চিত হইতে হয়। তথায় এখন আর সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

কবিরাজ মহাশয়দিগকে আজ কাল শাস্ত্র চিন্তা করিতে হয়, রোগী দেখিয়া বেড়াইতে হয়, ঔষধ প্রস্তুতির পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় এবং দগ্ধ উদরের চিন্তাও না করিলে চলে না। এক ব্যক্তির দ্বারা ঐ সকল কার্য্য একাধারে কোন মতেই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট কবিরাজী শাস্ত্রের উন্নতির জন্য যে সাহায্য করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। দেশীয় ধনকুবেরগণ, আমোদ প্রমোদে ধনের অজস্র অপব্যয় করিতেই ব্যস্ত এই বিষয়ের উন্নতিকল্পে মনোযোগী হইয়া কিঞ্চিত ব্যয় করিতে তাহারা একেবারেই উদাসীন। যাহারাও বা অর্থের কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করা সম্বন্ধে একটু ভাবেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য সাহায্য দান করা বাজে ব্যয় বলিয়া মনে করেন। আবার, কবিরাজগণও প্রায়শঃ গরীব; চিকিৎসা বিষয়িণী অভিনব চিন্তাদি তাঁহাদের হৃদয়ে উত্থিত হইলেও উপযুক্ত আনুকূল্যের অভাবে হৃদয়েই লয় পাইয়া থাকে। "উত্থায়হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" এইত সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

যাহা হউক, নানাবিধ কারণেই আজ কাল কোন কোন রোগে, কবিরাজী চিকিৎসার পসার প্রতিপত্তির পড়তা, অনেকটা মন্দা পড়িয়াছে। আর, পড়তা মন্দা পড়িলে রসিকতাও সময় সময় গালাগালি হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই এহেন দুর্দ্দশাপন্ন কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত ওলাউঠার চিকিৎসা প্রবন্ধও পাঠকের উপাদেয় এবং প্রীতিকর হইবে কিনা, জানিনা। তাই বলিতে

ছিলাম যে, ভূমিকাতেই আমাদের কৈফিয়ৎ দেওয়ার একান্ত দরকার। নতুবা, সাধারণকে দেশীয় ভাষায় নিবদ্ধ ও দেশীয় শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ পূর্ণ এই প্রবন্ধের আগাগোড়া পড়ান দূরে থাকুক, ভূমিকারও সমগ্র অংশ পড়াইতে পারিব কিনা বলিতেপারি না। তবে. যুক্তিযুক্ত ও কার্য্যতঃ প্রকৃত পথ নির্দ্দেশক অর্থাৎ (practically suggestive) হইলে হয়ত শিক্ষিত পাঠকের নিকট ইহা উপেক্ষিত নাও হইতে পারে. এই মাত্র ভরসা। লর্ড চেষ্টারফিল্ড বলিয়াছেন, "We should consider rather what is said than who says it" অর্থাৎ কে বলিতেছে তাহার বিচার না করিয়া কি বলিতেছে তাহার বিচার করাই সুসঙ্গত। মহর্ষি বশিষ্ট দেবও বলিয়াছেন।

যুক্তিযুক্তমুপ্রাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যত্তৃণমিব ত্যাজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥"

অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত উপদেশ বাক্য বালক হইতেও গ্রহণ করিবে এবং যুক্তির বহির্ভূত কথা ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত হইলেও,উহা তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। যাহা হউক, পাঠক পড়ুন, আর নাই পড়ুন, অথবা কবিরাজ বলিয়া আমাদিগের বিরুদ্ধে যেরূপ বা যত প্রতিকূল ধারণাই পোষণ করুন না কেন, আমরা কিন্তু "কার্ডিনেল নিউম্যানের উপদেশেরই অনুসরণ করিব। তিনি বলিয়াছেন—

"Some will hate thee ; some love thee,
Some will flatter, some will slight,
Cease from man and look above the,
Trust in God and do the right"

মোটের উপর ইহার অর্থ এইযে, লোকের মতামতের উপর নির্ভর করিলে এবং প্রতি পদবিক্ষেপে "লোকে কি বলে" এইরূপ ভয় করিলে, কোন কার্য্যই সম্পন্ন করা যায় না। কেহ কেহ হয়ত তোমাকে ঘৃণা করিবে, কেহ কেহ হয়ত তোমাকে ভাল বাসিবে। কেহ কেহ হয়ত তোমর তোষামোদ করিবে, আবার, কেহকেহ হয়ত তোমাকে তুচ্ছ করিবে। লোকের মতামতের দিকে দৃষ্টি করিলে তোমার অব্যাহতি কোথায়? কাজেই মানুষের মতামতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এবং ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতঃ ; যাহা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহাই সম্পন্ন করিয়া যাও।

ক্রমশঃ।

কবিরাজ শ্রীচিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরঞ্জন।

পল্লী-চিকিৎসক।

প্রস্তাবনা।

বর্ত্তমানযুগে মানব মণ্ডলীর অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি বড়ই প্রবলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্যতিব্যস্ত, কেহ বা বিজ্ঞানালোচনায় আত্মভোলা। অতীতের দিকে চাহিয়া পুরাতনের অনুসন্ধানে অনেকেই লিপ্ত কিন্তু আমাদের যাহা যাহা আছে এবং যাহা কালপ্রভাবে অতীতের গর্ত্তে বিলীন হইতে চলিয়াছে, তাহার সংরক্ষণ ব্যাপারে অনেক স্থানেই সম্যক্ ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয়। তাই আজ একটী বিষয়ের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলাম। এবিষয়ে দেশহিতৈষীগণের ঐকান্তিক সাহায্য প্রার্থনা করি।

আজকাল পাশ্চাত্য প্রণালীর অনুমতে, সহরে বন্দরে নানা শ্রেণীর ডাক্তারের অভাব নাই। আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান পতিত যুগেও নবপ্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার প্রবর্ত্তন চেষ্টারও প্রচুর আয়োজন ও আন্দোলন চলিতেছে সত্য, কিন্তু পল্লীগ্রামে ডাক্তার ও কবিরাজের সংখ্যা অত্যল্প। বিশেষ গ্রামস্থ গৃহস্থবর্গের পারিবারিক অবস্থা যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে অধিকাংশ গৃহস্থেরই ডাক্তার কি কবিরাজ ডাকিয়া পরিজনবর্গের জীবন রক্ষা কি আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামের প্রবীন প্রাচীন-প্রাচীনারাই রোগে ঔষধ দান ও রোগীর পরিচর্য্যার উপদেশ দিয়া বহু লোকের প্রাণ, রোগ কবল হইতে রক্ষা করিত। এখনও এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

কালের কি অদ্ভুত গতি! পূর্ব্বের ন্যায় প্রবীন প্রাচীনদের ঔষধে আজকালকার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের একেবারেই আস্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকিয়া রোগ প্রতিকার চেষ্টার সচ্ছল অবস্থাও অধিকাংশেরই নাই। এমতাবস্থায় টোট্‌কা ঔষধ শিখিবার আগ্রহও অনেকেরই হয় না। কারণ উহা শিখিলে পাছে লোকের নিকট লজ্জা পাইতে হয় বা উপহাসাস্পদ হইতে হয় এইটিই প্রধান ভয়। এরূপ শৈথিল্য হেতু ক্রমে ক্রমে আমাদের গ্রাম্য প্রচলিত ঔষধগুলি নিম্নশ্রেণীর হাতে পড়িয়া লজ্জা ও অভিমানে আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে হয়ত শীঘ্রই আমাদের অজ্ঞাত পথে সরিয়া পরিবে।

পূর্ব্বকালে প্রসূতি মাত্রেই সন্তানের মঙ্গলার্থে একটু না একটু কিছু জানিতেন। আর, এখন? কথায় কথায় ডাক্তার ডাক, যে সময়টুকু ওসব "ছাইভস্ম" (?) শিখিতে নষ্ট করিবেন সে সময় হাস্যকৌতুকে, উল্ কার্পেট লইয়া অথবা নাটক নভেল পড়িয়া আমোদে কাটাইবেন। এদিকে স্বামী বা প্রতিপালকের যে ডাক্তার ডাকিবার সচ্ছলতা নাই তাহা হয়ত তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবসরও পান না।

আমাদের তুচ্ছতাচ্ছল্যে অনেক রত্ন লোপ পাইয়াছে—বাকী যাহা আছে তাহাও যাইতে বসিয়াছে। তাই বলি, এখনও যাহা আছে তাহাও যদি পরিশ্রম সহকারে যত্নে কুড়াইয়া রাখা যায়, তবুও আমাদের এক দিগের অভাব কথঞ্চিৎ ঘুচিতে পারে—আয়ুর্ব্বেদের এক অধ্যায় বাড়িয়া পড়ে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রতি গ্রামেই কেহনা কেহ সামান্য গাছ গাছড়ার সাহায্যে এমন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর রোগ দূরীকরণে সমর্থ, যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্ভূত চিকিৎসাকেও তাহার নিকট লজ্জিত হইতে হয়।

আমরা বহু আয়াস সহকারে এইরূপ বহু টোটকা দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি এবং অনেক স্থানেই এই সমস্ত টোটকা ঔষধ দিয়া রোগ দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছি। বন্ধু বান্ধবগণের আগ্রহে কথোপকথন ছলে তাহাই এ প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। সকলেই যেন সহজে বুঝিতে পারেন, এই জন্য, এ প্রবন্ধে "গ্রাম্য ভাষা" পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা না করিয়া বরং অতীব যত্নে উহা ব্যবহার করিয়াছি।

এ প্রবন্ধে অনেক "ঠিক্ ঠাক্" নিয়ম থাকিবে, তাহা দেখিয়া যেন কেহ হাসিয়া উড়াইয়া না দেন। আমরাও প্রথম প্রথম উহা অবিশ্বাস্য বোধে উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পরে স্থল বিশেষে উহার প্রয়োগ করিয়া অসম্ভাবিত ফল লাভ করতঃ বিস্ময়াভিভূত হইতে হইয়াছে, তজ্জন্য সে সমস্ত সাদরে গ্রহণ করতঃ আপনার করিয়া লইয়াছি। অবশ্য ঔষধ ব্যবহার করিতে গেলে অনেক স্থলে ফল নাও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উহার ফল ফলিল না বলিয়া, যেন কেহ উহা নিতান্ত 'অসার', এই ভাবিয়া উপেক্ষা না করেন। একটু বিশ্বাস সহকারে বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধগুলি প্রয়োগ করিলে উহাদের ফল প্রায় সর্ব্বত্রই উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইবেন। প্রবন্ধ লিখিত ঔষধ

ব্যবহারে যদি কেহ ফল পান এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানান তবে বড়ই বাধিত হইব।

সর্ব্বসাধারণের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে যদি তাঁহাদের জ্ঞাত গ্রাম্য ঔষধ আমাদিগকে জানান, তবে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত উহা গ্রহণ করতঃ আমাদের এই প্রবন্ধে যথাসময়ে প্রকাশ করিব। আর এই প্রবন্ধ পাঠে সাধারণের উপকার হইলে, আমাদের শ্রম ও সফল জ্ঞান করিয়া প্রীত হইব।

১ম অধ্যায়।

"এই যে ঠাকুদ্দা, কোথেকে এলে? আজ কাল বড় এদিকে দেখা যায় না যে?"

"আর সুরেন্ বাবু, আপনারা বড়লোক, অর্থ সামর্থ্য যথেষ্ঠ, বিদ্যাবুদ্ধির তো অভাবই নাই। আপনি এখন কালেজে পড়িতেছেন, বিজ্ঞান পড়িয়া বিজ্ঞ হইতেছেন, আর কি আমাদের ঠাট্টা গল্প আপনাদের মনে লাগিবে?"

সুরেন স্থানীয় জমিদার পুত্র, কলেজে পড়িতেছেন, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাটী আসিয়াছেন; পাড়ার বৃদ্ধ হরিমালীকে দেখিয়া তাহাকেই ডাকিয়াছেন। পাড়ার সকল ছেলেপিলেই তাহাকে "ঠাকুদ্দা" বলিয়া ডাকে। হরিনাথ বড়ই পরোপকারী। অবশ্য ধন দানে নয়; তবে কিনা, অমুকের অসুখ হ'ল, হরিকে ডাক আর কথা নাই, অমনি শত কাজ ত্যাগ করিয়া হরিনাথ উপস্থিত। তাই পাড়ার সকলে তাকে বড়ই ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে।

সুরেন—আচ্ছা, ঠাকুদ্দা, চুল গুলিতো সাদা হ'য়ে গেছে, বল দেখি ভবপারের ক'দিন বাকী?

হরি—আর যাই বলুন, আপনাদের এরূপ স্নেহ যত্নের মাঝে এখন চোক দুটী বুজিতে পারিলেই বাঁচি।

সুরেন—তোমার যেন মরণে সাধ হ'য়েছে, তুমি যেন ম'রে বাঁচলে; কিন্তু যাঁ'রা তোমার মুখাপেক্ষী, তঁ'দের বাঁচাবে কে?

হরি—কেন, আপনারা? আমরা নিরক্ষর মূর্খ; আপনারা ধনী ও বিদ্বান. আপনারাই লোকের আশ্রয় হইবেন।

সুরেন—আরে, ধন ও বিস্তায় করিবে কি? তোমার ঐ সহজসাধ্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কোথায় পা'ব বল?

হরি—কেন? আজকাল ইংরেজ বাহাদুরের অনুগ্রহে ডাক্তারের ত অভাব নাই? আপনারা বড়লোক, ডাক্তার হইয়া অথবা ধনদানে ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া, আশ্রিত গরীব দুঃখীর প্রাণ রক্ষা করিবেন।

সুরেন—না, ঠাকুর্দ্দা, তোমার জ্ঞান ও আশ্চর্য্য কৌশল অনেক স্থলেই দেখি, পাশ্চাত্য বিদ্যাকে পরাস্থ করে। যেখানে ডাক্তারের মাথা ঘামায়, সেখানে তুমি যেন স্বয়ং ধন্বন্তরির ন্যায় যা তা একটা সামান্য দ্রব্য দিয়াই আশ্চর্য্যরূপে রোগ প্রতীকার করিয়া ফেল। আচ্ছা, ঠাকুর্দ্দা, তোমার যখন চরমকাল আগত প্রায়, তোমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কতক অংশ আমাকে দান করিয়া যাও না?

হরি—মুখের কথায় হয় না দাদা, সব কার্য্যেই একটা আন্তরিক 'টান' চাই, আর যথেষ্ঠ বিশ্বাস থাকাও চাই। পরের জিনিষ আপনার করিয়া নিতে হয়। যাহার নিকট কিছু শেখা যায়, তাহার আদেশ গুরু বাক্য মানিয়া যত্নে প্রতিপালন করিতে হয়।

সুরেন—তুমি আমাকে তোমার 'চেলা' কর না? আমি তোমার যাবতীয় আদেশই মানিয়া চলিব।

হরি—আচ্ছা, দেখা যাবে।

সুরেন—এইটাই বাঙ্গালীর দোষ। 'দেখা যা'বে,' 'দেখা যা'বে,' করিয়াই ভাড়াইয়া ভাড়াইয়া সময় পার করে; কেহ কাহাকে কিছুই শিখাইতে চায় না। কাজেই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের ব্যক্তিগত গুণ ও জ্ঞানগুলি চিরকালের জন্য লোকজ্ঞানের অতীত হইয়া যায়। এই হ'চ্ছে বাঙ্গালীর পোড়া বুদ্ধির ভ্রম।

হরি—শিখায় না কেন শুনিবেন? আমি যদি বলি "আপনার ঠোঁট ফাটিয়াছে,—ওঃ, আপনি বড় কষ্ট পাইতেছেন; দেখুন, আমার একটা কথা শুনুন, আজ রাত্রে শুইবার কালে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা তিনবার সরিষার তৈল লইয়া গুহ্যদ্বারে দিয়া পরে ঘুমা'বেন। দেখিবেন, পরদিনই আপনার ঠোঁট ফাটা সারিয়া যাইবে। একথা আপনি বিশ্বাস করিবেন কি? হয়ত হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন। কাজেই আর কি করিয়া হয়। প্রত্যেক

কার্য্যের মূলেই বিশ্বাস থাকা চাই, তুচ্ছ তাচ্ছল্যে চলিবে না। যদি কোনও দ্রব্য সহজেই সকলে পায়, তবে তাহার তত আদর থাকে কি?

সুরেন—না, তুমি আমাকে শিখাও। আমি ভক্তি বিশ্বাসের সহিতই তোমার কথা মানিয়া চলিব এবং যথাসাধ্য পরোপকার ও আত্মোৎসর্গ করিব।

হরি—দেখুন, সুরেন্ বাবু, আপনি যদি উহা শিখেন এবং আমার উপদেশ মতে চলেন, উপহাসের পাত্র হইবেন। আপনার শিক্ষিত নামধারী বন্ধু বান্ধবগণ আপনাকে ফকির, ওঝা, দানারি, অবধুত, হাতুড়ে প্র আখ্যান দিয়া প্রতিনিয়ত ঠাট্টা করিবে, আপনি উহা সহ করিতে পরি আমাদের মধ্যে "শিক্ষিত' এই অভিমানটা ঢুকিয়া পরাতেই নিজস্ব প্রতি আর আমাদের দৃষ্টি নাই। কাযেই দেশের যত রত্ন লোপ পাইয়াছে, পাইতেছে—অনেক গিয়াছে—সবই যাইতে বসিয়াছে; —এখনও যাহা আছে তাহা ধ্বংসাবশেষ কঙ্কাল মাত্র। ঐ কঙ্কাল ও কেবল মাত্র তথাকথিত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের আদরেই এখনও আছে সত্য, কিন্তু নেহায়েৎ অবিবেচক ও অনভিজ্ঞের হাতে পড়িয়া সুফলের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলেই কুফল প্রদান করিতেছে।

সুরেন্—আমি ঠাট্টাকে ভয় করিনা। আমি চাই, সহজলভ্য "বস্তু" দ্বারা সহজ উপায়ে আমার আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবাসীর উপকার করা। তোমার হৃদয় নিহিত অতুল রত্নাগারটার দ্বার একবার আমার সম্মুখে খুলে ফেল না? আমি সযত্নে রত্নগুলি কুড়াইয়া নেই।

হরি—আচ্ছা, কা'ল হ'বে; আজ এখন যাই।

সুরেন্—দেখিও যেন কা'ল বলিয়া কালে না ধরে;

হরি—সুরেন্‌বাবু, বাচালতা করিব কার সঙ্গে? আপনারা দেশরক্ষক, প্রজাপালক ও গরীব দুঃখীর বাপ মা; আপনার সহিত কথা বলিয়া যদি রাখিতে না পারিলাম, তবে আর বৃথা এ জীবন ধারণ কেন?

সুরেন্—তবে তুমি স্বীকার ক'লে?

হরি—হাঁ।

সুরেন্—তোমার দিলাম।

হরি—আমার দিব্যি।

সুরেন্—আজ অবধি তুমি ওস্তাদ্, আর আমি তোমার চেলা।

হরি—আজ তবে বিদায় হই।

সুরেন্—আচ্ছা, মনে থাকে যেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

অবধৌতিক চিকিৎসাতত্ত্ববিৎ।

আয়ুর্ব্বেদে শোধন ও মারণ।

অনন্ত শাস্ত্রং বহুধা চ বিদ্যা স্বল্পশ্চ কালো বহুল চ বিঘ্না।
যচ্ছারভূতং তদুপাসনীয়ম্ হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥

এই পৃথিবীতে অনন্ত শাস্ত্র ও বহুপ্রকার বিদ্যা আছে ; কিন্তু নানা প্রকার বিঘ্ন ও আয়ুষ্কাল অল্প হওয়াতে, জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হাঁস যেরূপ সারভাগ দুগ্ধই গ্রহণ করে, সেইরূপ সুধীজন সর্ব্বদা সার বস্তুর উপাসনাই করিয়া থাকেন।

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের শ্যামল শোভা সম্পদের মধ্যে বেদজ্ঞ মহর্ষিগণের সুমধুর বৈদিক স্বরলহরী যেরূপ সকলকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে, সেইরূপ অতি প্রাচীন কাল হইতে আবহমান কাল পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা ও রসায়ন বিদ্যা প্রভাবে কোটী কোটী নরনারীর স্বাস্থ্য ও আয়ু রক্ষা করিয়া আসিতেছে। যে রসায়ন বিদ্যাপ্রভাবে আর্য্যঋষি শত শত বৎসর তপঃ সাধনে সক্ষম ও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যে অধুনা নব্য পাশ্চাত্য রসায়নী বিদ্যার নিকট ক্রমশ আদরনীয় হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে। কারণ বর্ত্তমান সময় সুদূর ইংলণ্ড হইতে সমগ্র ভারত ব্যাপী জনসঙ্ঘ আয়ুর্ব্বেদোক্ত দধি ঘোলের ব্যবহারে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইতেছেন। কেবল তাহা নহে আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন শাস্ত্রের উজ্জলতম রত্ন "মকরধ্বজ"ও নব্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাক্তারগণ রোগীর প্রতি ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল দেখিতে পাইতেছেন। এইরূপে আয়ুর্ব্বেদীয় বিজ্ঞান ও

রসায়ন শাস্ত্রকে ডাক্তারই হউন, কি নব্য শিক্ষিত রসায়নাভিজ্ঞই হউন, ক্রমশঃ সকলেই মান্য করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদীয় শোধন ও মারণ প্রণালির উদ্দেশ্য সম্যক রূপে অবগত না হওয়াতেই সুবহু অসার তর্কের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইদানীং তাহা অনেকটা সাম্যভাব ধারণ করিয়াছে। আশা করি, ভগবদিচ্ছায়, যাহা কিছু বাকী আছে, তাহা ও সম্যক অবগত হইলে, তদ্বিষয়ের বিতর্ক সমূহ তিরোহিত হইয়া, আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন শাস্ত্র সর্ব্বসমক্ষে সমধিক আদরনীয় হইবে। তাই কব্যুক্তিতে বলিয়াছে. "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ"।

পূর্ব্বকালে যখন আর্য্য ঋষিগণ পারদাদি ধাতুসমূহকে মানব দেহে প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন, তখন প্রথম প্রয়োগে সেই সমস্ত ধাতু, ব্যাধি নিবারক না হইয়া ব্যাধির বর্দ্ধকই হইয়াছিল। সুতরাং পারদের দোষসমূহ নিবারণকল্পে ঋষিগণ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সুগভীর চিন্তার ফলস্বরূপ যাহা সুনিশ্চিত হইয়াছিল, তাহাই নিম্নে বর্ণিত হইল।

ধাতু নির্দ্দোষী-করণং শোধনং। যে ক্রিয়া দ্বারা ধাত্বাদির শরীরের অনিষ্টজনক শক্তি নষ্ট হইয়া, তাহাদের ব্যাধিনিরাকরণে সামর্থ্য জন্মায়, সেই প্রক্রিয়ার নাম আয়ুর্ব্বেদীয় "শোধন"।

আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়নশাস্ত্রমতে মিশ্রধাতুকে অমিশ্ররূপে পরিণত করাকে শোধন প্রণালী কহে। পাশ্চাত্যমতে অনেকের বিশ্বাস, যে কোন উপায়েই হউক, ধাত্বাদির আবর্জ্জনা দূর করিয়া জিনিষটিকে খাঁটি করিয়া লইবার নামই শোধন। তাহাদের মতে শোধন শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ করা।

"ভস্মীকরণং মারণং"। যে প্রক্রিয়াদ্বারা সুসংস্কৃত ধাত্বাদি ভস্মীকৃত হয়, তাহাকেই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যেরা "মারণ" বলেন।

পারদ।

"বিবিধ ব্যাধি ভয়োদয় মরণ জরাসংকটেঽপি মর্ত্ত্যানাং।
পারং দদাতি যস্মাত্তস্মাদয়ং পারদঃ কথিতো মহর্ষিভিঃ।
রসায়নার্থিভি র্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।
ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ॥"

পারদ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে পৃথিবীর নানা প্রকার ব্যাধিভয় ও জরা মরণ সংকট হইতে ইহা দ্বারা উদ্ধার পাওয়া যায় বলিয়াই ইহাকে পারদ বলে। রসায়নাথ লোক সমূহ দ্বারা পারদ ভক্ষিত হয় বলিয়া, ইহা রস নামে অভিহিত হয় এবং ইহাকে ধাতুও বলে। পারদ এক প্রকার স্বনাম খ্যাত খনিজ স্বচ্ছ তরল ধাতু বিশেষ। ইহাকে চলিত ভাষায় পারা বলে।

শিবাঙ্গাৎ প্রচ্যুতং রেতঃ পতিতং ধরণীতলে।
তদ্দেহ-সার-জাতত্বাচ্ছুক্লমচ্ছমভূচ্চ তৎ ॥
ক্ষেত্র ভেদেন বিজ্ঞেয়ং শিববীর্য্যং চতুর্ব্বিধম্।
শ্বেতং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণং তত্তু ভবেৎ ক্রমাৎ ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ খলু জাতিতঃ।
শ্বেতং শাস্তং রুজাং নাশে রক্তং কিল রসায়নে।
ধাতুবাদেতু তৎপীতং খেগতৌ কৃষ্ণমেব চ।"

আয়ুর্ব্বেদে পারদের উৎপত্তি, প্রকার ভেদ ও তাহার গুণ বিষয়ে ঋষিগণ তপোমগ্ন হইয়া যাহা নিশ্চিত করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইল।

দেবাদিদেব মহাদেবের যে বীর্য্য প্রচ্যুত হইয়া পতিত হয়, তাহাই পারদরূপে পরিণত হইয়াছে। শিব শরীরজাত সারপদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া উহা শ্বেতবর্ণ ও স্বচ্ছ। শিববীর্য্যোৎপন্ন এই পারদ ক্ষেত্রভেদে চতুর্ব্বিধ। শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ পারদ ব্রাহ্মণ জাতি, রক্তবর্ণ পারদ ক্ষত্রিয় জাতি, পীতবর্ণ পারদ বৈশ্য জাতি এবং কৃষ্ণবর্ণ পারদ শূদ্রজাতি। এই চারিপ্রকার পারদের মধ্যে রোগনাশে শ্বেতবর্ণ পারদই প্রশস্ত। রসায়নে রক্ত বর্ণ পারদ, ধাতুভেদে পীতবর্ণ পারদ এবং আকাশগতি সাধন বিষয়ে কৃষ্ণবর্ণ পারদ হিতকর।

এই ভূমণ্ডলে পারদের খনির মধ্যে স্পেন্‌দেশে আলমাদেন্ নামক স্থানে ক্যালিফর্ণিয়ার ইদ্রিয়ার খনি সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। হাঙ্গেরিয়া, ট্রান্সিলভেনিয়া এবং জার্ম্মাণির অন্তর্গত ডিউপান্টাম্ নামক স্থানেও পারদের খনি অধিক আছে। ভারতবর্ষে পারদের খনি অধিক নাই, একমাত্র নেপাল প্রদেশে ইহার খনি আছে। অধিকাংশ পারদ চীন ও স্পেন্‌দেশ হইতে ভারতবর্ষে রপ্তানি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় বাজারে যে সকল পারদ বিক্রয় হয়,

তাহা হিঙ্গুল হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। হিঙ্গুলের ১০০ ভাগের মধ্যে ৮৫ ভাগ পারদ ও ১৫ ভাগ গন্ধক আছে, ইহা বৈজ্ঞানিক মতে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। খনিতে পারদ প্রায়ই গন্ধকের সহিত মিশ্রিত থাকে। এই মিশ্রিত পদার্থকে হিঙ্গুল কহে। ইহা রক্তবর্ণ বলিয়া রসায়ন কার্য্যে প্রশস্ত। বিশেষতঃ পারদ যখন খনি হইতে উত্তোলন করা হয়, তখন গন্ধক, লৌহ ও রজত প্রভৃতি ধাতুর সহিত মিশ্রিত থাকে।

ঔষধ কার্য্যে কিরূপ পারদ প্রশস্ত, তাহারই লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে। যে পারদের অভ্যন্তর নীলবর্ণ এবং বহির্ভাগ সমুজ্জল অথচ মধ্যাহ্ন সূর্য্য প্রতিম তেজবিশিষ্ট, তাহাই ঔষধের জন্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

রসেন্দ্র, পারদ, সূত, সূতরাজ, সূতক, শিবতেজ ও রস এই সাতটী পারদের পর্য্যায় বাচক শব্দ। কাহারও কাহারও মতে শিববীজ, রস, সূত, রসেন্দ্র এবং শিব পর্য্যায়ক শব্দ সকল পারদের নাম।

পারদের দোষ সমূহ ও তাহার শোধনের আবশ্যকতা। পারদে স্বভাবতঃ মল, বিষ, বহ্নি, প্রস্তর, চাঞ্চল্য, বঙ্গ ও নাগ দোষ অবস্থিতি করে। পারদের এই সকল দোষ পরিহার না করিয়া সেবন করিলে, মলদোষ দ্বারা মূর্চ্ছারোগে, বিষদোষ দ্বারা মৃত্যু, বহ্নিদোষ দ্বারা অতি কষ্টতম গাত্রদাহ, প্রস্তর দোষ দ্বারা শরীরের জড়তা, চাঞ্চল্য দোষ দ্বারা বীর্য্যনষ্ট, বঙ্গ দোষ দ্বারা কুষ্ঠ এবং নাগ দোষ দ্বারা ব্রণ রোগ জন্মে। প্রধানতঃ পারদে বহ্নি, বিষ ও মল এই তিনটি দোষ বর্ত্তমান থাকিয়া যথাক্রমে সন্তাপ, মৃত্যু ও মূর্চ্ছা জন্মায়। পারদের অন্যান্য দোষ সকল যাহা বর্ণিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই তিনটী দোষই বিশেষ অনিষ্ট জনক। পারদের দোষ সকল সংশোধন না করিয়া সেবন করিলে, শরীরে কষ্টকর রোগসমূহ উপস্থিত হয় এবং, এমন কি, তদ্দ্বারা শরীরের বিনাশ পর্য্যন্ত সাধিত হয়। এই কারণে পারদ শোধন করা এবং তাহার অষ্ট প্রকার সংস্কার (স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, উত্থাপন, পাতন বোধন, নিয়ামন ও দীপন ক্রিয়া) সাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পারদ শোধন।

পারদ মারক দ্রব্যের চূর্ণ ষোড়শাংশ পারদে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক দ্রব্য প্রতিদিন সাতবার করিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। ইহাই পারদের সাধারণ শুদ্ধির নিয়ম। মেষরোম, হরিদ্রা, ইষ্টক চূর্ণ ও গৃহধুম এই সকল দ্রব্যের সহিত পারদ একদিন মর্দ্দন করিয়া ধৌত করিলে পারদের মলদোষ অপনীত হয়। এইরূপ গোরক্ষচাকুলে ও অঙ্কোঠ (আঁকড়া) চূর্ণে বঙ্গদোষ, সোনালু চূর্ণে মলদোষ, চিতাচূর্ণে বহ্নিদোষ, কৃষ্ণধুস্তুর চূর্ণে চাঞ্চল্য দোষ, ত্রিফলা চূর্ণে বিষদোষ, ত্রিকটু চূর্ণে প্রস্তর দোষ এবং গোক্ষুর চূর্ণ সহ মর্দ্দনে অসহ্যাগ্নি দোষ নষ্ট হয়। প্রত্যেক দোষ তদ্দোষনিবারক ষোড়শাংশ দ্রব্য এবং ঘৃত কুমারীর শাঁসের সহিত মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ কাঁজি দ্বারা মৃৎভাণ্ডে প্রক্ষালন করিতে হইবে। এই পারদের সাধারণ শুদ্ধ-নিয়মটি বিশেষ শুদ্ধিতে প্রয়োগ করিলে পারদ সকল-দোষবর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হয়।

ঘৃতকুমারী, চিতা, রক্তসর্ষপ ও বৃহতী ইহাদের ক্বাথে অথবা ত্রিফলার ক্বাথে তিন দিবস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে সকল দোষ হইতে বিমুক্ত হয়। ইহা পারদের সর্ব্বপ্রকার দোষ হরণ করিবার একটী সংক্ষিপ্ত শোধন প্রণালী।

রশুনের রস, পানের রস ও ত্রিফলার ক্বাথে যত্ন পূর্ব্বক যথাক্রমে পারদ তিন দিন মর্দ্দন করিয়া তৎপর পারদকে যথাক্রমে উক্ত রসত্রয় হইতে পৃথক করিয়া কাঁজি দ্বারা ধৌত করিয়া গ্রহণ করিলেও পারদ সর্ব্বদোষ রহিত হয়। এবম্ভূত শোধিত পারদ অমৃত তুল্য, মধুরাদি ছয় রস যুক্ত, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষ নাশক, রসায়ন, যোগবাহী, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, সকলরোগ নাশক এবং কুষ্ঠরোগে বিশেষ হিতকর।

ক্রমশঃ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেনগুপ্তকবীন্দ্র।

Registered No. D 114

২য় বর্ষ] আশ্বিন পূর্ণিমা ১৩১৯ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়িণী

মাসিক পত্রিকা

আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিণী

সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীনলিনী কান্ত দাশ গুপ্ত

বিদ্যাভূষণ, কবিরত্ন; এল, সি, পি, এস।

সূচী।

আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা] [বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২, টাকা।

আয়ুর্ব্বেদ হিতৈষিণী

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়িণী মাসিক পত্রিকা।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।"

২য় বর্ষ } আশ্বিন—১৩১৯। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আয়ুর্ব্বেদে রোগের নিদানতত্ত্ব।

বিবিধ বৈচিত্রপূর্ণ সৃষ্টিকৌশলময় পরিদৃশ্যমান জগৎ অনন্তলীলাময়ী প্রকৃতি-দেবীর রঙ্গভূমি বা নাট্যশালা। ইহার প্রধানতম অভিনেতা মানব, আবহমান কাল হইতে কখন পিতা সাজিয়া অপত্যস্নেহের, পুত্র সাজিয়া পিতৃভক্তির, কখনও বা ভ্রাতা সাজিয়া ভ্রাতৃস্নেহ বা ভ্রাতৃবাৎসল্যের, পত্নী সাজিয়া পতিভক্তির আবার কখনও বা মাতা সাজিয়া মাতৃস্নেহের অভিনয় প্রফুল্লমনে করিয়া আসিতেছে। এ ভবের খেলা বা অভিনয়সৌষ্ঠব, সুস্থদেহ ও সুস্থমনের পক্ষে যেমন আনন্দজনক, তেমনই অসুস্থদেহ ও মনের পক্ষে দুর্ব্বিসহ ভারস্বরূপ নিরানন্দকর ব্যাপার। কি অর্থোপার্জ্জন, কি বিদ্যোপার্জ্জন, কি প্রীতির দান-প্রতিদান, সকলই সুস্থদেহীর পক্ষে যেমন আনন্দের, অসুস্থের পক্ষে তেমনই ভবকারানিবাস বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

যদি স্বাস্থ্য ও হতস্বাস্থ্যই জগতের সুখ ও দুঃখের নিয়ামক হইল, তবে ব্যক্তিমাত্রেরই, অক্ষুন্ন স্বাস্থ্য ও অক্ষুন্নমনা হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের চেষ্টা করা উচিত। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—"নগরী নগরস্যেব রথস্যেব রথী সদা স্বশরীরস্য মেধাবীকৃত্যেষ্ববহিতোভবেৎ,,—(চরক,) ৫ম অধ্যায় সূত্রস্থান।

যেমন নগরের কার্য্যে নগরাধ্যক্ষ, রথের কার্য্যে রথী, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বদেহের কৃত্যে বা কার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত বা সতর্ক হইবেন।

কিরূপ আহার আচার, কিরূপ প্রকৃতির পক্ষে উপযোগী, কোন্ পথ্য কোন্ প্রকৃতি বিরুদ্ধ বা অনুপযোগী, কিরূপ আহার আচারে শরীর ও মন দ্রবিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হয়, কোন্প্রকার আহারে আচারেই বা ব্যাধি আসিয়া সংসারের সমস্ত সুখশান্তি মূহুর্ত্তে চুর্ণ করিয়া দিয়া যায়, তাহাই আমাদের সর্ব্বদা অনুসন্ধেয় ও চিন্তনীয়। নিয়ম অনিয়মের অজ্ঞতা বশতঃ বহুসময় নিয়ম বলিয়া অনিয়ম ও অত্যাচার করায় আকস্মিক ব্যাধিরূপ ঝঞ্ঝাবাত আসিয়া আমাদিগের এত সাধের দেহপ্রদীপটি নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কি কারণে আমরা ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হই এবং কি কি নিয়মে সে আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারি। আয়ুর্ব্বেদে বায়ু-পিত্ত-কফ এই তিনটী দোষ এবং রস,রক্ত,মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটী দূষ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই দোষ ও দূষ্য অবিকৃত অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে আমরা সুস্থ, অন্যথায় অসুস্থ বা রোগগ্রস্থ হইয়া থাকি। এই দোষ ও দূষ্যের উপরই যখন জীবের শুভাশুভ ও জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে তখন সর্ব্বসাধারণেরই ইহাদের (সপ্তধাতু ও ত্রিদোষের) প্রকৃতি, বিকৃতি, অবস্থান, গতি অর্থাৎ কি কি কারণসমবায়ে বায়ু-পিত্ত-কফ কুপিত ও কি কি কারণে প্রশান্ত হইয়া থাকে, শরীরের কোন্স্থানে ইহাদের অবস্থান এবং দেহাভ্যন্তরে ইহাদের গতি (সঞ্চরণ) কিরূপে সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন।

আয়ুর্ব্বেদ একস্থানে বলিতেছেন—"সর্ব্বেষামেব রোগানাং নিদানং কুপিতা মলাস্তৎপ্রকোপস্য তু প্রোক্তং বিহিতাহিত সেবনং"—প্রায় ব্যাধিমাত্রেরই উৎপত্তির কারণ প্রকুপিত মল বা দোষ; আবার বিবিধ প্রকার অহিতাহার ও অহিতাচার প্রভৃতিই সেই দোষপ্রকোপের কারণ।

এই দোষ বা ধাতুসমূহের বিকৃতির কারণ বা নিদান আয়ুর্ব্বেদের যে অংশে বর্ণিত হইয়াছে তাহাকেই আমরা রোগের নিদানতত্ত্ব বলিতে পারি; এই নিদানতত্ত্বই এস্থলে আমাদের বক্তব্য।

প্রথমতঃ দোষ ও ধাতু কি, তাহা না বুঝিলে তাহার প্রকোপ ও প্রশম কিরূপে বুঝিব? সুতরাংই এক্ষণে আমরা দোষাদির স্বরূপ অবগত হইবার চেষ্টা করিব।

দোষ—বায়ু, পিত্ত, কফ,। এই দোষত্রয়কে আমরা নিম্নলিখিত রূপে দশভাগে বিভাগ করিতে পারি।

১। দোষের স্বরূপ, ২। দোষের গুণ, ৩। দোষের স্থান, ৪। দোষের প্রকোপ, ৫। দোষের প্রসর, ৬। স্থানসংশ্রয়, ৭। দোষের ক্ষয়, ৮। দোষের বৃদ্ধি ৯। সাম্যাবস্থা, ১০। প্রকুপিত দোষের স্বলক্ষণ বা কর্ম্ম।

১। দোষের স্বরূপ।

(ক) বায়ুর স্বরূপ—

রুক্ষঃশীতোলঘুঃসূক্ষ্মচলোথ বিশদঃ খরঃ।
বিপরীত গুণৈর্দ্রব্যৈর্মারুতঃ সংপ্রশাম্যতি॥

শারীর বায়ু রুক্ষ, শীতল, লঘু, সূক্ষ্ম (অতীন্দ্রিয়), দ্রুত, অপিচ্ছিল, এবং পরুষ; যে সকল দ্রব্য বায়ুর বিপরীত গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ স্নিগ্ধ,উষ্ণ, গুরু, স্থূল, মন্দ, পিচ্ছিল ও মসৃণ তদ্দ্বারা বায়ুর শান্তি হয় (যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং শারীরিক যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয় ও যাহার ক্রিয়ায় শরীরের উৎসাহ, স্ফুর্ত্তি, ও আহার্য্যবস্তু অধঃকরণ ও পরিপাককার্য্য সুচারু নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তাহাকে বায়ু বলে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা বলেন, ইন্দ্রিয় ক্রিয়া ও শারীরিক যন্ত্রসমূহের ক্রিয়া নার্ভ নামক শিরাদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। বৈদ্যেরা অনেকেই নার্ভদিগের স্বতন্ত্র ক্রিয়া স্বীকার করেন না। আবার নার্ভসকল যে কিরূপে ক্রিয়া করে, তাহা পাশ্চাত্যশাস্ত্রে মীমাংসিত হয় নাই। অতএব যদি স্বীকার করা যায় যে নার্ভসকল বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া ক্রিয়া করে তবে উভয় মতেরই সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

(খ) পিত্তের স্বরূপ।—

সস্নেহমুষ্ণংতীক্ষ্ণঞ্চদ্রবমম্লং সরং কটু।
বিপরীতগুণৈ পিত্তং দ্রব্যৈরাশু প্রশাম্যতি॥

পিত্ত অল্প স্নেহযুক্ত,উষ্ণ, দাহকত্ব প্রভৃতি তীক্ষ্ণগুণযুক্ত, দ্রব, অম্ল, নিঃসরণশীল এবং কটু। যে সকল দ্রব্য ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহা রুক্ষ, শীতল, অতীক্ষ্ণ, অদ্রব, অম্ল, যাহা নিঃসৃত হয় না এবং যাহা মধুরাদি গুণবিশিষ্ট, তদ্দ্বারা পিত্তের শান্তি হয়। (পিত্তশব্দে পিত্তনামক দ্রব্য বিশেষ ও জীবশরীরের উষ্মা বুঝায়) পাশ্চাত্যচিকিৎসকেরা তাহাকে "এনিমেলহিট্ (animal heat) বলেন।

(গ) শ্লেষ্মার স্বরূপ—

গুরুশীত মৃদুস্নিগ্ধ মধুরস্থিরপিচ্ছিলাঃ।
শ্লেষ্মণঃ প্রশমং যান্তি বিপরীতগুণৈর্গুণাঃ॥

শ্লেষ্মা গুরু, শীতল, মৃদু, স্নিগ্ধ, মধুর, স্থির, ও পিচ্ছিল। যে সকল দ্রব্য বিপরীত গুণবিশিষ্ট তদ্দ্বারা শ্লেষ্মার প্রশান্তি হইয়া থাকে (সাধারণতঃ শরীরস্থ জলীয় ভাগকে শ্লেষ্মা বলে)।

মোটামুটি ত্রিদোষের স্বরূপ।

বায়ু অমূর্ত্ত পদার্থবিশেষ। শিরা বা নার্ভের সাহায্যে ইহার ক্রিয়া উপলব্ধি হইয়া থাক।

পিত্ত ঈষৎ তাম্রবর্ণ, উষ্ণগুণ ও কটুরসবিশিষ্ট তরল পদার্থ বিশেষ।

শ্লেষ্মা পাণ্ডুবর্ণ, সফেন, ঈষৎ মধুরাস্বাদবিশিষ্ট, শরীরস্থ জলীয় ধাতুবিশেষ।

ত্রিদোষের গুণ।

আমরা ইতি পূর্ব্বেই দোষের স্বরূপ বর্ণনা কালে বায়ুর রুক্ষ শীতলাদি, পিত্তের উষ্ণতীক্ষ্ণাদি, এবং শ্লেষ্মার গুরুশীতাদি গুণেরও পরিচয় পাইয়াছি। দোষের স্বরূপে ও গুণে বিশেষ পার্থক্য নাই, দোষের স্বরূপ প্রস্তাবেই ইহা আলোচনা করা হইয়াছে।

দোষত্রয়ের স্থান।

বায়ুর স্থান—বস্তি পুরীষাধানং কটী সক্থিনী পাদাবস্থীনি বাতস্থানানি তত্রাপি পক্বাশয়ো বিশেষেণ বাতস্থানং। — (চরক, সূত্রস্থান)।

বস্তি, পক্কাশয়, কটি ও নিতম্বদ্বয়, পাদদ্বয়, অস্থি সমূহ, ইহারা বায়ুর স্থান। তন্মধ্যে পক্কাশয় বায়ুর প্রধান স্থান। পক্কাশয় শব্দের অর্থ বিষ্ঠাশয় বা মলাধার, মলাধারের অপর নাম অন্ত্র। নাভি ও বক্ষপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী আমাশয় বা পাকস্থালী ; তন্নিম্নে দক্ষিণ ভাগে গ্রহণী, গ্রহণীর নিম্নে অন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। লোকের অন্ত্র তাহার নিজ হাতের চৌদ্দহাত লম্বা। উহা দুইভাগে বিভক্ত, ক্ষুদ্রান্ত্র ও স্থূলান্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্র, গ্রহনীর নিম্নে আরম্ভ হইয়া দক্ষিনদিকের কুচকির উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, পরে স্থূল হইয়া স্থূলান্ত্র নাম ধারণ করিয়াছে। স্থূলান্ত্র দক্ষিণদিগের কুচকির উর্দ্ধভাগে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ স্থানে মল সঞ্চিত হয়, ইংরেজিতে

ঐ স্থানকে সিকম্ (Secum) বলে। সংস্কৃত ভাষায় সিকম্‌কেই উণ্ডুক বলে। স্থূলান্ত্র ঐস্থান হইতে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া যকৃত পর্য্যন্ত আসিয়াছে; পরে যকৃতকে বেষ্টন করিয়া অথবা যকৃতের তলদেশ দিয়া এবং বক্ষের ঠিক নিম্ন দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বক্ষের ঠিক নিম্নে আমাশয় আছে সুতরাং অন্ত্র আমাশয়ের তলদেশ দিয়া গিয়াছে। অনন্তর বামপঞ্জরের নিকট আসিয়া নিম্নমুখে গুহদ্বারে গিয়া শেষ হইয়াছে। অন্ত্র সর্ব্বদা বায়ুদ্বারা পরিপূর্ণ আছে, আর ইহার ধামনিক গতিও অতিশয় বলবতী, এই জন্য বায়ুর অর্থ লইয়া গোলযোগ হয়। কেহ মনে করেন, অন্ত্র বাতাসের আধার বলিয়া উহাকে বায়ুর প্রধান স্থান বলা হইয়াছে। কেহ বলেন অন্ত্রের ধামনিক গতি বা পেরিষ্টানটিক মোশন (Peristantic motion) বলবতী বলিয়া উহাকে বায়ুর প্রধান স্থান বলা হইয়াছে, ইহাদের মতে বায়ু শব্দে ধামনিক গতি। সুশ্রুত এই মতের পক্ষপাতী; চরক স্পষ্ট করিয়া কোনও স্থানে ধমনীর কথা উল্লেখ করেন নাই।

পিত্তেরস্থান—স্বেদোবসালসীকারুধিরমামাশয়ঃ পিত্তস্থানানি তত্রাপ্যামাশয়োবিশেষেণ পিত্তস্থানং।

স্বেদ, রস, লসীকা, (লোমছাল উঠিলে যাহা হইতে জলবৎ রস নির্গত হয়) রুধির ও আমাশয়, পিত্তের স্থান। এস্থলে আমাশয় শব্দে আমাশয়ের অংশ গ্রহণীকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে কেননা আমাশয়ে পিত্ত থাকিতে পারে না। আর যদিই কোন কারণে আমাশয়ে প্রবেশ করে তবে দারুণ যন্ত্রণা হয়।

শারীরিক উষ্মা পিত্তের ধর্ম্ম। সুতরাং স্বেদ, রস, লসীকা ও রুধিরের উষ্মা পিত্তের ধর্ম্ম।

শ্লেষ্মারস্থান—উরঃ শিরোগ্রীবা পর্ব্বন্যামাশয়ো মেদশ্চ শ্লেষ্মণঃ স্থানানি তত্রাপ্যুরো বিশেষেণ শ্লেষ্মণঃ স্থানং।

বক্ষঃস্থল, মস্তক, গ্রীবা, পর্ব্বসমূহ, আমাশয় ও মেদ শ্লেষ্মার অবস্থিতি স্থান, তন্মধ্যে বক্ষঃস্থল প্রধানস্থান। শ্লেষ্মবহ স্রোতসকলকে ইংরাজিতে লিম্ফাটিক (Lymphaties) কহে। ঐসকল স্রোত বক্ষঃস্থলেই অধিক, (The lung is abundently supplied with lymphatics) অর্থাৎ শ্লেষ্মবহ স্রোত সকল বক্ষোদেশে প্রচুর পরিমাণে আছে। (বেকর প্রণীত ফিজিওলজি, ২২৩ পৃষ্ঠা)। সংক্ষেপতঃ দোষত্রয়োপ্রধান স্থানকয়টীর কথা বলিয়া আবার কার্য্যের বিভাগানুসারে তাহাদের প্রত্যেকের পাঁচ পাঁচটি স্থানের কল্পনা করা হইয়াছে।

পঞ্চ বায়ুর স্থান ও কার্য্য।

প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান এই পঞ্চবিধ বায়ু, স্থান ও কর্ম্মভেদে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করতঃ শরীর যাপন করাইতেছে। (ক)

১। যে বায়ু মুখে সঞ্চরণ করে, তাহাকে প্রাণবায়ু কহে। উহা দেহ ধারণ ও আহার্য্য বস্তুকে অন্তঃপ্রবেশিত করে এবং প্রাণসমূহকে ধারণ করে। এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিক্কাশ্বাসাদি রোগ হয়। (খ)

২। উদান নামক বায়ু কণ্ঠদেশে অবস্থান করতঃ গীতভাষণাদি ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে। দূষিত হইলে প্রায়ই ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখগত রোগ) জন্মাইয়া থাকে। (গ)

৩। সমান বায়ু আম ও পক্বাশয়ে অবস্থিত ও পাচকাগ্নির সহায়কারী থাকিয়া আহার্য্য বস্তু পরিপাক করে এবং আহারজ রস, মূত্র ও পুরীষকে পৃথক করিয়া থাকে। প্রকুপিত হইলে গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অতীসার প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া থাকে। (ঘ)

৪। ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহচারী। উহা শরীরের ইতস্ততঃ রসাদি বহন করে, স্বেদ ও রক্তস্রাবাদি ক্রিয়ার সহায় হয়, এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া যথা নিয়মে করিয়া থাকে। (চ)

(ক) প্রাণোদানৌ সমানশ্চ ব্যানশ্চাপান এবচ
স্থানস্থা মারুতঃ পঞ্চ যাপয়ন্তি শরীরিণং ॥

(খ) বায়ুর্যো বক্ত্রসঞ্চারী স প্রাণোনামদেহধৃক্
সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রানাংশ্চাপ্যবলম্বতে ॥

(গ) প্রায়শঃ কুরুতেদুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্
উদানোনামযস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ।
তেনভাষিত গীতাদি বিশেষোঽভিপ্রবর্ত্ততে
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ করোতিচ বিশেষতঃ ॥

(ঘ) আমপক্বাশয়চরঃ সমানোবহ্নিসঙ্গতঃ
সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তিহি।
গুল্মাগ্নিসঙ্গাতীসার প্রভৃতীন্ কুরুতে গদান্ ॥

(চ) কৃৎস্নদেহচরোব্যানোরসসংবাহনোদ্যতঃ
স্বেদাসৃক্ স্রাবণো বাপি পঞ্চধাচেষ্টয়ত্যপি।
ক্রুদ্ধশ্চকুরুতেরোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্ ॥

৫। অপান বায়ু পক্বাশয়াশ্রিত। এই বায়ু যথা নিয়মে বিষ্ঠা, মূত্র, শুক্র গর্ভ ও আর্ত্তব অধোদেশে প্রেরণ করে; ইহা ক্রুদ্ধ হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশাশ্রিত ঘোরতর রোগ সমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। শুক্রদোষ ও প্রমেহরোগ সমূহ ব্যান ও অপান উভয় বায়ুর প্রকোপ হেতু উৎপন্ন হয়। আর, সমস্ত বায়ু একত্রে কুপিত হইলে দেহকে নিশ্চয়ই নাশ করে। (ছ)

বায়ুর ন্যায় পিত্তেরও, কার্য্যের বিভাগানুযায়ি পাঁচটী স্থানের কল্পনা করা হইয়াছে। যথা।—

অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নোর্হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে।
ত্বচিসর্ব্বশরীরেঽপি পিত্তং নিবসতিক্রমাৎ॥

১। অগ্ন্যাশয়ে থাকিয়া পিত্ত পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে বলিয়া উহার নাম পাচক।

২। যকৃৎ ও প্লীহস্থানে অবস্থান করতঃ রসের রক্তিমতা সম্পাদন করে বলিয়া রঞ্জক।

৩। হৃদয়ে অবস্থান করতঃ বুদ্ধি, মেধা ও অভিপ্রেতার্থ সম্পাদক বলিয়া সাধক।

৪। চক্ষুর্দ্বয়ে থাকিয়া আলোকের সহায় হয় বলিয়া আলোচক।

৫। ত্বকে থাকিয়া ত্বকের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদক বলিয়া ভ্রাজকপিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

একই শ্লেষ্মা ঐ প্রকার পঞ্চস্থানস্থ হইয়া পাঁচটি কার্য্যের নেতৃত্ব করে বলিয়া পাঁচটি নাম প্রাপ্ত হইয়াছে যথা।—

(ছ) পক্বাধানালয়োঽপানঃ কালকর্ষতিচাপ্যয়ং
সমীরণঃ শকৃন্মূত্রশুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ
ক্রুদ্ধশ্চকুরুতেরোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্
শুক্রদোষ প্রমেহাংস্তুব্যানাপান প্রকোপজাং
যুগপৎ কুপিতশ্চাপিদেহং ভিন্দ্যাৎনসংশয়ম্।
সুশ্রুত—নিদানস্থান, ১ম অঃ।

"শ্লেষ্মাচ পঞ্চধাবস্থঃ শ্লেষকাদি স্বকর্ম্মণা।

কফধাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং যৎকরোত্যবলম্বনং

অতোঽবলম্বক শ্লেষ্মাযস্ত্বামাশয় সংশ্রিতঃ

ক্লেদকঃ সোঽন্নং ক্লেদাদ্বোধকোরসবোধনাৎ

রসনাস্থঃ শিরসংস্থোঽক্ষিতর্পণাত্তু তর্পকঃ।

সন্ধিসংশ্লেষণাদেব শ্লেষকঃ সন্ধিষুস্থিতঃ॥

(১) শ্লেষকাদি (সংযোগাদি) স্বকীয়কর্ম্মের দ্বারা শ্লেষ্মা, সমস্ত সংযোগস্থান অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া তজ্জন্য তাহা অবলম্বক। (২) আমাশয় সংস্থিত হইয়া আহার্য্য বস্তুকে ক্লিন্ন করে বলিয়া ক্লেদক। (৩) রসনাস্থ থাকিয়া রসের অববোধক হেতু বোধক। (৪) শিরঃসংস্থ হইয়া চক্ষুর তৃপ্তি সম্পাদন করে বলিয়া তর্পক। (৫) সন্ধিদেশে থাকিয়া সন্ধির সংশ্লেষক বা সংযোজক হেতু শ্লেষ্মা শ্লেষক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দোষের প্রকোপ।

এক্ষণে আমাদের চতুর্থ বক্তব্য বিষয়।

কিকি কারণে দোষ প্রকুপিত হয়, তাহাই আলোচ্য।

বায়ু প্রকোপের কারণ।

"তত্র বলবদ্বিগ্রহাতিব্যায়াম ব্যবায়াধ্যয়নপ্রপতন প্রধাবন প্রপীড়নাভিঘাত লঙ্ঘন প্লবন তরণ রাত্রিজাগরণ ভারহরণ গজতুরঙ্গরথপদাতিচর্য্যা কটুকষায়তিক্ত রুক্ষলঘুশীতবীর্য্যশুষ্কশাক বল্লূর বরকোদ্দালক কোরদূষশ্যামাক নীবারমুদ্গ মসূরাকী হরেণুকলায় নিষ্পাণুবানশনবিষমাশনাধ্যশন বাত-মূত্র-পুরীষ-শুক্র-ছর্দ্দি ক্ষবথুদ্গার-বাষ্পবেগ-বিঘাতাদিভির্বিশেষৈর্বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে।

সশীতাভ্র প্রবাতেষু ঘর্ম্মান্তেচ বিশেষতঃ।

প্রত্যুষস্যপরাহ্নেতু জীর্ণেঽন্নেচ প্রকুপ্যতি॥

বলবানের সহিত যুদ্ধ, ব্যায়াম, ব্যবায়, অধ্যয়ন, পতন, ধারণ, পীড়ন আঘাত, লঙ্ঘন, সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, গজ ও তুরঙ্গে আরোহন, রথারোহন, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, বরকধান্য (ঘোড়াধান), উদ্দালক, কোরদূষ (কাউন), শ্যামাধান (তৃণধান্যাভেদ), নীবার (উড়ীধান), মুদ্গ, মসুর, অরহর, হরেণু বর্ত্তুলকলায়, মটরকলায় ও রাজশিম্বীর অতিসেবন, উপবাস, বিষমভোজন, অধ্যয়ন,

এবং পূর্ব্বআহার্য্য জীর্ণ না হইতে পুনরায় আহার, বাত, মূত্র পুরীষ, শুক্র, বমি, ক্ষবথু (হাচি) উদ্গার ও অশ্রুবেগ ধারণ এ সকল কারণে বায়ুর প্রকোপ হয়।

এ স্থলে ত্রিশঠাচার্য্যের বচন কয়টি আমাদের উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার্থীর আয়ত্বের পক্ষেও ইহা বিশেষ সুবিধা।

ব্যায়ামাদপতর্পণাৎ প্রপতনাৎ ভঙ্গাৎ ক্ষয়াজ্জাগরাদ্বেগা-
নাঞ্চবিধারণাদতিশুচঃ শৈত্যাদতিত্রাসতঃ।
রুক্ষক্ষোভকষায় তিক্তকটুকৈরেভিপ্রকোপং
ব্রজেদ্বায়ুর্বারিধরাগমে পরিণতে চান্নেঽপরাহ্নেপিচ॥

ব্যায়াম. উপবাস, পতন, ভঙ্গ (ভাঙ্গিয়া যাওয়া), ধাতুক্ষয়, রাত্রি জাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শোক, শৈত্য (অতিরিক্ত শীতক্রিয়া) ত্রাস (ভয়) রুক্ষ, ক্ষোভ, কষায়, তিক্ত, কটুদ্রব্যের অতিসেবনে, বর্ষাঋতুতে, অন্নপরিপাক হইলে এবং অপরাহ্নে বায়ু প্রকুপিত হয়।

পিত্ত প্রকোপের কারণ

ক্রোধ-শোক-ভয়ায়াসোপবাস-বিদগ্ধ মৈথুনোপগমন কটম্ল-লবণ-তীক্ষ্ণোষ্ণ লঘু বিদাহি তিলতৈলপিন্যাক-কুলত্থ-সর্ষপাতসী-হরিতকশাক-গোধা-মৎস্যাজাবিক মাংসদধি-তক্রকুর্চ্চিকা-মস্তু-সৌবীরকসুরাবিকারাম্লফলকট্বরাকৈ প্রভৃতিভিঃ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে।

তত্নুষ্ণৈরুষ্ণকালেচ মেঘান্তেচ বিশেষতঃ।
মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রেচ জীর্য্যত্যন্নেচ কুপ্যতি॥

ক্রোধ,শোক,ভয়,আয়াস (শরীরের পীড়ন), আহারাদিকৃত বা শোণাদিকৃত-বিদাহ, মৈথুন, কটু,অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু ও বিদাহিদ্রব্য (দাহজনকদ্রব্য) সমূহের অতিসেবন, তিল, তৈল, পিন্যাক (খইল), কুলত্থ, সর্ষপ, অতসী, (তিসি) হরিতকশাক,(১) গোধামাংস, (২) মৎস্য, ছাগমাংস, মেষমাংস, দধি,তক্র-কুর্চ্চিকা, (৩) দধিমস্তু,সৌবীরক,(৪) সুরাবিকৃতি, অম্লফল, কট্বর (সরবিশিষ্ট দধির তক্র)

(১) হরিতক শাক—সজনা। (২) গোধামাংস—গুইসাপ ইতি ভাষা।
(৩) সৌবিরক—যব গোধুমকৃত কাঁজি। (৪) কূচ্চিকা—ক্ষীরসা ইতিভাষা। সাচ দ্বিবিধ ক্ষীর কূর্চ্চিকা তক্র কূচ্চিকাচ।

এবং সূর্য্যকিরণ প্রভৃতির অতিসেবনহেতু পিত্ত প্রকুপিত হয়।

উষ্ণসেবন, উষ্ণকাল, বিশেষতঃ শরৎকাল, মধ্যাহ্ন,অর্দ্ধরাত্র ও অন্ন জীর্ণ হইবার সময় পিত্ত প্রকুপিত হয়।

পিত্ত প্রকোপ বিষয়ে ত্রিশঠাচার্য্য —

কটম্লোষ্ণ বিদাহি তীক্ষ্ণ লবণ ক্রোধোপবাসাতপস্ত্রীসম্পর্ক তিলাতসী দধি-সুরা-শুক্তারনালাদিভিঃ ভুক্তেজীর্য্যতি ভোজনেচ শরদিগ্রীষ্মেসতি প্রাণিনাং মধ্যাহ্নেচ তথার্দ্ধরাত্রিসময়ে পিত্তং প্রকোপং ব্রজেৎ।

কটু, অম্ল, বিদাহকরদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, লবণ, ক্রোধ, উপবাস, স্ত্রীসংসর্গ, তিল মসিনা, দধি, সুরা, শুক্ত, আরনাল, (সুরাজাতীয় সন্ধান বিশেষ) আহার্য্য বস্তু জীর্ণ হইতেছে এরূপ সময়ে এবং শরৎ ও গ্রীষ্মঋতু, মধ্যাহ্ন ও অর্দ্ধরাত্রি সময় পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে।

পিত্ত ও রক্তের প্রকোপগত সাধর্ম্ম্য আছে বলিয়া রক্তের প্রকোপক কারণ প্রদর্শন করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সুশ্রুত বলিতেছেন —

পিত্তপ্রকোপনৈরেবচাভীক্ষ্ণং দ্রবস্নিগ্ধাগুরুভিরাহারৈর্দিবাস্বপ্ন-ক্রোধানলাতপ-শ্রমাভিঘাতাজীর্ণ-বিরুদ্ধাধ্যশনাদিভি রক্তং প্রকোপমাপদ্যতে।

পিত্ত প্রকোপন দ্রব্য সমূহ, সর্ব্বদা দ্রব, স্নিগ্ধ, গুরু আহার, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, অগ্নি, রৌদ্র, শ্রম, আঘাত, অজীর্ণ, বিরুদ্ধভোজন ও অধ্যশন প্রভৃতি কারণে রক্ত কুপিত হয়।

কফপ্রকোপের কারণ।

দিবাস্বপ্নাব্যায়ামালস্যমধুরাম্ল-লবণ-স্নিগ্ধ-গুরু-পিচ্ছিলাভিষ্যন্দিহায়নক যবকনৈষধেৎকটমাষ মহামাষ গোধুম তিলপিষ্টবিকৃতি দধিদুগ্ধকৃশরা পায়সেক্ষু বিকারানূপোদক মাংস বসাবিসমৃণালকশেরুকশৃঙ্গাটক মধুরবল্লীফল সমাশনধ্যশন প্রভৃতিভিঃশ্লেষ্মাপ্রকোপমাপদ্যতে।
সশীতৈঃ শীতকালেচ বসন্তেচ বিশেষতঃ
পূর্ব্বাহ্নেচ প্রদোষেচ ভুক্তমাত্রে প্রকুপ্যতি॥

দিবানিদ্রা, পরিশ্রমশূন্যতা, আলস্য, মধুর, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, ও অভিষ্যন্দী (স্রোতঃ সমূহের ক্লেদ জনক) দ্রব্য সমূহের অতি সেবন,

হায়নক ধান্য, (শালিধান্য বিশেষ) যবক (যবাকার তণ্ডুল) নৈষধ ধান্য, ইৎকট (খগগলী) মাষ, রাজমাষ, গোধুম, তিল, তণ্ডুল, পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশরা (তিলতণ্ডুল ও যবকৃত খিচুরী) পায়স, ইক্ষুবিকৃতি (গুড় প্রভৃতি), আনূপমাংস, উদকমাংস, বসা, বিসন্ন, (পদ্মমূল) মৃণাল, কশেরুক (কেশুর), শৃঙ্গাটক (পাণিফল) নারিকেলাদি মধুর ফল, বল্লীফল (শসা প্রভৃতি) দ্রব্যের অতি সেবন, এবং অতিভোজন, অধ্যশন (পূর্ব্বআহার্য্য জীর্ণ না হইতে পুনর্ব্বার ভোজন) প্রভৃতি কারণে শ্লেষ্মা কুপিত হয়।

শ্লেষ্মশীতে (শাতক্রিয়াদ্বারা), শীতকালে বিশেষতঃ, বসন্তকালে, পূর্ব্বাহ্নে (প্রাতঃকালে), সন্ধ্যাকালে এবং ভুক্তমাত্রে কফ কুপিত হইয়াথাকে।

কফপ্রকোপ বিষয়ে ত্রিশঠাচার্য্য।

> গুরুমধুররসাতিস্নিগ্ধ দুগ্ধেক্ষু ভক্ষ্যদ্রবদধিদিননিদ্রা
> পূপসর্পিঃ প্রপূরৈঃ তুহিনপতনকালে শ্লেষ্মণঃ সংপ্রকোপঃ
> প্রভবতিদিবসাদৌ ভুক্তমাত্রে বসন্তে।

গুরু, মধুর, স্নিগ্ধদ্রব্য, ইক্ষুকৃতভক্ষ্য, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবানিদ্রা, পিষ্টক, ঘৃত, পরিপূর্ণভোজন, হেমন্ত ও বসন্তকালে, এবং দিবসের আদিভাগে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হয়।　　　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।
শাস্ত্রী কবিরাজ।

বিসূচিকা রোগ

ও

দেশীয় মতে তাহার সরল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

দেখা যায় যে, দেশের অধিকাংশ লোকেই ঘৃত-তৈল-লবণ-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন চিন্তাতেই নিয়ত বিব্রত আছেন। স্বাধীনভাবে, ধীরতার সহিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতঃ স্বাবলম্বিত বিষয় ভিন্ন, অন্য বিষয়ের হিতাহিত চিন্তা করিয়া ভাল মন্দ নির্ব্বাচন করিবার অবসর, অনেকেরই খুব কম আছে। তারপর,

আবার পাশ্চাত্য চিকিৎসালয়াদির অভ্রভেদী চূড়া চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান। কবিরাজগণের তমসাচ্ছন্ন ও ভূমি-বিলুণ্ঠিত-প্রায় জীর্ণ কুটিরের প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসর কোথায়? যে দিকেই তাকাইবে, সেই দিকেই স্বর্গের ইন্দ্রালয়, পাশ্চাত্য চিকিৎসালয়রূপে ধরাতে অবতীর্ণ দেখিয়া তোমার মাথা ঘুরিয়া যাইবে। আবার, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও বিষম গোলযোগ উপস্থিত। পুরাকালের নিষ্কাম ব্রতধারী, বিশ্বহিতৈষী ও উদার প্রকৃতি ঋষিগণ গঙ্গাতীরে বসিয়া, দেবলোক ও পিতৃলোকের তর্পণ ও পূজাদি করিয়া, পূজোপসৃষ্ট নির্ম্মাল্য সলিল মধ্যে বিসর্জ্জন দিতেন। সেই ধারণায় এবং সেই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া, সেই নির্ম্মাল্যের লোভে, সরল বিশ্বাসী সলিলচারী মীনগণ, দলে দলে তটসন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ঋষি চলিয়া গিয়াছেন। অধুনা তৎপরিবর্ত্তে স্বার্থপরায়ণ ও সঙ্কীর্ণচেতা ধীবরগণ, ঋষির সেই পবিত্র আসন পরিগ্রহ করতঃ ব্যবসারূপ বাগুড়া বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। এখন "তস্মাৎ পুত্রবদেনং পালয়েদাতুরং ভিষক্" অর্থাৎ চিকিৎসক যে রোগীকে পুত্রবৎ পালন করিবেন, অথবা "জীবিতহেতোরপি চাতুরেভ্যো নাতিদোগ্ধব্যম্" অর্থাৎ জীবিকার অনুরোধেও যে রোগীদিগকে অতি দোহন করিবে না, এরূপ দিন আর নাই। আজ কাল অধিকাংশ চিকিৎসকই রোগী পাইলে শিকার জুটিয়াছে বলিয়া মনে করেন এবং "প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যম্" স্থির করিয়া উহার কাঁধে ঝাপাইয়া পড়েন। ফলতঃ মায়াবী মহীরাবণ যেমন উপায়ান্তর অভাবে বিভীষণের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতঃ হনুমানকে বঞ্চনা করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে পাতালে লইয়া গিয়াছিল, আজকালের অনেকানেক চিকিৎসকও, বুঝিয়াই হউক বা না বুঝিয়াই হউক, আত্মীয়তার ভাণ করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধন মানসে, নানারূপে মায়া বিস্তার করিতেছে। একদিক হইতে ডাক্তার ডাকিতেছেন, আমার নিকট আইস। আমিই তোমার দুঃখ মোচন করিবার উপযুক্ত পাত্র। আমার ঔষধই তোমার রোগ দমনে একমাত্র সমর্থ। কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া আমারই শরণাপন্ন হও। নতুবা তোমার পরিত্রাণ নাই, অন্য দিক হইতে কবিরাজ হাকিতেছেন, "এহ্যেহি ইতঃ নিষীদ। এস, এস, এখানে বস। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" সকলপ্রকার চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও।

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ।" ক্ষোভ করিবার দরকার নাই। আমিই তোমার সকল দুঃখ মোচন করিব। আমাকেই তোমার ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদানের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া জানিও। তুমি রোগী! রোগ তোমার দেহ ও মন, উভয়ই দুর্ব্বল করিয়াছে। তোমার হয়ত ড্রাইডেনের সেই—

The smiles of courtiers and the harlots' tears,
The trademen's oaths and the mourning of an heir,

কথাটা মনেই পড়িবে না। * বল দেখি, তুমি কাহার শরণাপন্ন হইবে? কাহাকে বিশ্বাস করিবে? তোমার দশা শূনঃশেফ নামা ব্রাহ্মণ কুমারের দশার মত নহে কি? অযোধ্যার রাজা অম্বরীষ নরমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য ঋচীক নামা এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণের তিনটী পুত্র। তন্মধ্যে একটীকে, যজ্ঞের আহুতি দিবার জন্য, ধনলুব্ধ ব্রাহ্মণ রাজার নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। রাজা অম্বরীষ উপযুক্ত ধন প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে লইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এটি হইবে না। এটি আমার ধর্ম্মজপুত্র, পিণ্ডের অধিকারী।" তৎপরে রাজা সর্ব্ব কনিষ্ঠকে লইতে ইচ্ছুক হইলে বিপ্রপত্নী বলিলেন, 'এটি নহে। এটিকে আমার কোল শূন্য করিয়া দিতে পারিব না।' তখন রাজা মধ্যমটীকে গ্রহণ করিলেন। মধ্যম বালক শূনঃশোক, পিতামাতার প্রতি কাতর দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেও তাঁহারা কিছুই বলিলেন না। আর বলিবেনই বা কি? ধন গ্রহণ করিয়াছেন; একটিকেত দিতেই হইবে। তখন মধ্যম বালক শূনঃশেফ নিরুপায় হইয়া এই কথা বলিয়াছেন—

---

* ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ এই, যে, রাজার সভাসদগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং হাসির বিশেষ কারণ বর্ত্তমান না থাকিলেও, রাজার মনস্তুষ্টির জন্য লোক দেখান গোছের দেঁতো হাসি হাসিয়া থাকে। বারবণিতাগণ, আগন্তুকদিগের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরাগ বা ভালবাসা না থাকিলেও, মৌখিক ভালবাসা দেখাইবার ছলে, কান্নাকাটি করিয়া থাকে। ক্রেতার বিশ্বাসোৎপাদন মানসে ব্যবসায়িগণ কথায় কথায় শপথ করে এবং মৃতব্যক্তির সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও শোকসূচক পরিচ্ছদাদি ধারণ করে। এই সকলের একটাও আন্তরিক নয় বলিয়া অবিশ্বাস্য।

পিতরৌ ধনলুব্ধৌচ, রাজা খড়্গাধারীস্তথা।
দেবতা বলিমিচ্ছন্তি, কোমে ত্রাতা ভবিষ্যতি ? ॥

আমি বালক। পিতামাতাই আমার প্রথম ও প্রধান রক্ষক। তাঁহারা ধনলুব্ধ—ধনলোভে তাঁহারা আমাকে বিক্রয় করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট আমার রক্ষার কোন আশা নাই। যাহা হউক, পিতামাতা রক্ষা না করিলেও প্রজার রক্ষাকর্ত্তা রাজা যখন বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তখন তিনি হয়ত আমাকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু, দেখিতেছি তিনিও আমাকে বধ করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাহা হইতেও আমার রক্ষার কোন আশা নাই। যাহাহউক, সর্ব্বভূতের রক্ষক দেবতার শরণ লইয়া দেখা যাউক। কিন্তু, দেখিতে পাই, আমার সে গুড়েও বালি পড়িয়াছে —দেবতাই আমার বলি গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। তবে, সত্য সত্যই আর আমার পরিত্রাণ নাই।

যাহাহউক, আজ কাল যখন ওলাউঠা হইলে অধিকাংশ লোকেই হোমিও-প্যাথীর শরণাপন্ন হয়, তখন কবিরাজী মতে ওলাউঠা চিকিৎসার প্রবন্ধ লিখিবার এ সাধ কেন ? ওলাউঠা রোগে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা কি পর্য্যাপ্ত (Quite Sufficient) নয় ? কই, কবিরাজী মতেত কাহাকেও ওলাউঠার চিকিৎসা করাইতে শুনা যায় না। হোমিওপ্যাথি কি এ্যালোপ্যাথিক মতের চিকিৎসায় যে ওলাউঠা রোগীর মৃত্যু হয় না, এমন নহে। তবে, কবিরাজী মতে আজ কাল প্রায়শঃ কেহ ঐ রোগের চিকিৎসাই করায় না। মরুক আর বাচুক, ওলাউঠা হইলে অধিকাংশ লোকে, হোমিওপ্যাথীরই শরনাপন্ন হয়। যাহা হউক, যদিও এই প্রশ্নের উত্তরে, আমরা আমাদের বক্তব্য বিষয় গুলি, ওলাউঠাতে এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথী ও কবিরাজী মতের চিকিৎসার সমালোচনায় প্রকাশ করিব, তথাপি এখানেও উহার কতকটা আভাস দেওয়ার দরকার বিবেচনা করি। ওলাউঠার কথা ছাঁড়িয়া দাও। আজ কাল সর্ব্বসাধা-রণের বিশ্বাস এই যে, নূতন রোগে ডাক্তারী ও পুরাতন রোগে কবিরাজী চিকিৎসা ভাল।* সাধারণতঃ ডাক্তারীকে ফৌজদারী ও কবিরাজীকে দেওয়ানী

* লোকের মনে ঐরূপ ধারণা হইবার নানাবিধ কারণের মধ্যে একটী প্রধান কারণ এই যে, মু- ল্মান রাজত্বের অবসান ও ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয়ের

চিকিৎসা বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি তাহাই বলুন। কিন্তু কেহ কি কথাটা কখনও তলাইয়া দেখিবার অবসর নিয়াছেন?

আমাদের কিন্তু এই বিষয় ধারণা ও অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। রোগ নূতন অবস্থায় সরল থাকে, দেহে বল থাকে এবং রোগীও ঔষধ সেবন বা অহৃদ্য পথ্যাদি পালন করিতে বিরক্তি প্রকাশ করে না। আবার সেই রোগই পুরাতন হইলে, উপসর্গাদি যোগে জটিলতা প্রাপ্ত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হয়, দেহ দুর্ব্বল ও রক্ত শূন্য হয় এবং রোগীও অনেক দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবন করিয়া, ফল না পাইয়া চিকিৎসক ও ঔষধের উপর শ্রদ্ধাহীন ও বিরক্ত হয়।

প্রাক্‌কালে—— যখন অরাজকতার পূর্ণ প্রাদুর্ভাবে ভারতাকাশ গাঢ়তমসাবৃত ছিল। কেবল মাঝে মাঝে সুদূরস্থিত গগন প্রান্তে দুই একটী নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোক, উহার সত্তার পরিচয় প্রদান করিত মাত্র, যখন লোকে শাস্ত্রালোচনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা প্রাণ লইয়াই ব্যস্ত থাকিত, তখন প্রথম প্রথম এলোপ্যাথী, নূতন জ্বরে জোলাপ দিয়া, আশুজ্বরাবরোধক কবিরাজীর হরিতালাদি ঘটিত "ম্যাদী বড়ী"র মত, কুইনাইন প্রয়োগ করতঃ হঠাৎ জ্বর বন্ধ করিত। লোকেও ঔষধের চমৎকা ফল দেখিয়া বিস্মিত হইত। "বাধনং সানুবাধনম্" প্রভৃতি অভেষজ ঔষধ ও প্রকৃত আরোগ্যকারী ঔষধের ভেদাভেদ লোকে বুঝিত না বলিয়াই হঠাৎ আরোগ্যের পরিণাম ফল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। (বাধন ও সানুবাধন ঔষধের বিস্তারিত বিবরণ এই প্রবন্ধের সমালোচনার অংশে দ্রষ্টব্য)। কবিরাজীর ম্যাদী বড়ীর প্রয়োগ এখনও বরিশাল এবং ফরিদপুর প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কাহারও জ্বর হইয়াছে, অথচ তৎপর দিবস রোগীকে কোন স্থানে যাইতেই হইবে। রোগীর এইরূপ অবস্থায়, কবিরাজ মহাশয়েরা উক্ত বড়ী প্রয়োগ করিয়া ও পান্তা ভাত পথ্য দিয়া, সুতীব্র জ্বরের ও আশু প্রতিরোধ করিয়া থাকেন। উক্ত বড়ীর জ্বরঘ্ন ক্রিয়ার ম্যাদ ৭।৮ দিন মাত্র থাকে। অর্থাৎ ঔষধের প্রভাবে ৭।৮দিন মাত্র বা কোন পরিমিত কাল পর্য্যন্ত জ্বর বন্ধ থাকিয়া পুনরায় প্রকাশিত হয় বলিয়া তাহার নাম "ম্যাদী বড়ী"। ৭৮ দিন পরে রীতিমত চিকিৎসা করিয়া রোগী আরাম করিতে হয়। এই জন্য চিকিৎসা দ্বারা বিভিন্ন ধাতুতে বিভিন্ন রকমের কুফলও ফলিয়া থাকে বলিয়া সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়েরা উক্ত চিকিৎসার পক্ষপাতী নহেন।

যে শাস্ত্রের সাহায্যে জটিল ও দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরাম করা যায়, সেই শাস্ত্রের সাহায্যে সেই জটিল রোগেরই সরল ও সহজ অবস্থায় উহা আরাম করা যাইতে পারে না, ইহা কি কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন? আর, যখন এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী প্রভৃতি চিকিৎসা এদেশে ছিল না, তখন এদেশে নূতন রোগের কি চিকিৎসা চলিতনা? নূতন রোগে কি সকলেই মরিয়া যাইত? যদি মরিয়াই যাইত, তবে নূতন রোগ পুরাতন প্রাপ্ত হইয়া কবিরাজী চিকিৎসার জন্য আসিত কিরূপে? "কবিরাজী কি ডাক্তারী চিকিৎসা অমুক অমুক রোগে বা অমুক অমুক রোগের অমুক অমুক অবস্থায় ভাল, কি ভাল নয় এরূপ না বলিয়া, কোন্ কোন্ কবিরাজ, কি কোন্ কোন্ ডাক্তার 'অমুক অমুক রোগের বা অমুক অমুক রোগের অমুক অমুক অবস্থায় চিকিৎসা ভাল করেন বা করিতে পারেন না, এইরূপ বলিলে মন্তব্যটি যেন সমীচীন ও সুসঙ্গত হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে, লোকের মনে ঐরূপ অসঙ্গত ধারণা হইবার নানাবিধ কারণও যে বর্ত্তমান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাজার উৎসাহ দানের অভাব, দেশীয়দের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা ও সর্ব্বোপরি কবিরাজগণের দৈন্যদশা প্রভৃতি বহুবিধ কারণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা পূর্ণ শক্তিতে কার্য্য করিতে পারিতেছে না।

তবে, উপযুক্ত উপকরণ বিহীন হইলেও কঙ্কালাবশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদের যেটুকু প্রভাব আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, তাহাতেই আমাদিগকে মুগ্ধ হইতে হইতেছে। স্বর্গীয় সুপণ্ডিত কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার মহাশয় বলেন, "চরকোক্ত চিকিৎসা বিলুপ্ত প্রায়। কারণ ইহার গুরু নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইহার চিকিৎসাধিকারে মদ, মাংস, বস্তি (গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কারী) বমন প্রভৃতির প্রয়োগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু, ইহা বর্ত্তমান প্রথার বিরুদ্ধ। চরকের বস্তি প্রভৃতি উপকরণ দেশে প্রচলিত হইলে, রোগীর এত শীঘ্র শীঘ্র উপকার দর্শিতে থাকিবে যে, বিদেশীয় চিকিৎসা প্রণালী ইহার নিকট সমাদর পাইবে না। আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

বসন্ত চিকিৎসার সমালোচনা উপলক্ষে (প্রবন্ধকার কৃত বসন্তরোগ ও দেশীয় মতে তাহার সরল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা" নামক গ্রন্থে) প্রসঙ্গক্রমে মুনিঋষিদের জ্ঞান ও আজ কালের বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের জ্ঞানের

পার্থক্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। যদিও ঐ বিষয়ে অনেক কথা বলিবার আছে, তথাপি নানা কারণে উহা পরিত্যাগ করিয়াছি। বহুবিধ কারণে ঋষি-উপদিষ্ট চিকিৎসার প্রতি আমাদের, এবং কেবল আমাদের কেন, ভারতের অধিকাংশ লোকেরই বিশেষ আস্থা আছে। হোমিওপ্যাথিক মতের কথাই নাই, এলোপ্যাথিক মতেও দেখা যায় যে, কার্য্যক্ষেত্রে চিকিৎসার সময় মস্তিষ্কের বিশেষ চালনা না করিলে,রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ মনোনীত করা যায় না।

এরূপ শুনা যায় যে, হোমিওপ্যাথির প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় মহেন্দ্র নাথ সরকার এম্, ডি, মহাশয় বলিতেন যে, বিশেষ বিদ্বান্ ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান না হইলে কেহই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারেন না। তিনি প্রায় অধিকাংশ হোমিওপ্যাথীর ডাক্তারকেই না কি চিকিৎসার পরিবর্ত্তে লগুড় হাতে করিয়া রোগীকে ঠেঙ্গাইবার উপদেশ দিতেন। মোটকথা, অধিকাংশ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকই যে, ভালরূপে ঔষধ নির্ব্বাচনাদি করিতে পারেন না, ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। ইহা সত্যই হউক, আর মিথ্যাই হউক, ঔষধ মনোনীত করিতে না পারিলে যে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় ফল হয় না এবং যে সে লোকে যে হোমিওপ্যাথীর ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হয়েন না, ইহা কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক, কি ব্যবসায়ী, কি অব্যবসায়ী, অধিকাংশ লোকেই বলিয়া থাকেন। দেশব্যাপী ওলাউঠা হইলে, যদি অধিকাংশ স্থানেই তেমন মনোনীতকারী হোমিওপ্যাথী মতের চিকিৎসক না পাওয়া যায়, তবে, সেই চিকিৎসার প্রতি কিরূপে নির্ভর করা যাইতে পারে। রত্নাকর সিন্ধুগর্ভে অনন্তরত্নাদি নিহিত আছে, তাহাতে তোমার আমার কি ? যদি কাজের সময় রত্নাদি সংগ্রহ করিয়া নিজের প্রয়োজনেই লাগাইতে না পারিলাম, তবে উহাতে ফল কি ? চরক বলেন, "তুল্যং ভবতি জ্ঞানমজ্ঞানেনেতি।" অর্থাৎ ঐরূপ স্থলে শাস্ত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ সমান কথা।

চিকিৎসা ক্ষেত্র কর্ম্মক্ষেত্র। এক্ষেত্রে কার্য্যতঃ লোকের জীবনমরণরূপ জটিল সমস্যায় সমাধান করিতে হয়। তাই এখানে ভাবুকতা হইতে কার্য্যকারিতার এবং বিদ্যার পণ্ডিত হইতে কাজের পণ্ডিতের এত আদর। কার্য্যক্ষেত্রে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ উপলক্ষে পাশ্চাত্যপণ্ডিত মহামতি হেল্‌প্‌স্ (Helps) বলেন "It should ever remind us where we are and what we

can do, not in fancy, but in real life ," অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবে ভাবুকতা পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতপক্ষে কোথায় আমরা আছি এবং কি করিতে পারি, তাহাই সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, ঋষিগণ এরূপ ভাবেই চিকিৎসা প্রণালী বাঁধিয়া গিয়াছেন এবং বটিকা ও পাচনাদির এরূপ ভাবেই যোগাযোগ ও প্রস্তুত করিবার বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, কবিরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিরত কথাই নাই, "যদিষবঃ মিষ্যন্তি লক্ষ্যে চলে" গোছের নিতান্ত মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি ব্যক্তিও যথানির্দ্দিষ্ট প্রণালী মতে প্রস্তুত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ অন্ধভাবে প্রয়োগ করিলে, রোগীর কিছু না কিছু উপকার করিতে পারে—কোনরূপে প্রমেহ রোগের ঔষধ বাতব্যাধি ক্ষেত্রে না দিয়া প্রমেহ ক্ষেত্রে দিলেই হইল। দেখা যায় যে, যে ইঞ্জিন (Engine) সম্পূর্ণ (Perfect), সেই ইঞ্জিনই যে সে লোকে চালাইতে সমর্থ হয়। ইঞ্জিন চালাইতে হইলে যদি বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিবার দরকার বা মস্তিষ্কের অতিরিক্ত চালনা করিবার আবশ্যকতা হয়, তবে ইঞ্জিন খানা অসম্পূর্ণ বা Inperfect ই বলিতে হইবে। বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি খরচ না করিয়া এবং মাথা বেশী না ঘামাইয়াও যে, কবিরাজ মহাশয়েরা অনেকানেক কঠিন রোগ, অত্যল্প সময়েও অত্যাশ্চর্য্যরূপে আরাম করিতে সমর্থ হন, আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠতার উহাও একটা কারণ বটে। যখন বিশেষ নাম করণ না করিয়া, শুধু বায়ু, পিত্ত ও কফের অংশাংশ বিচার করিয়াই বর্ত্তমান ও ভাবী এবং নামহীন ও নামযুক্ত সর্ব্ববিধ রোগেরই চিকিৎসা করা যাইতে পারে, তখন সেই চিকিৎসাশাস্ত্র—শ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র একবার ভাল করিয়া খুজিয়া দেখা যাউক যে, ওলাউঠা রোগের কোন উৎকৃষ্টতর চিকিৎসা পদ্ধতি উহাতে পাওয়া যায় কি না।

সাধারণের বিশ্বাস যে, হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাই ওলাউঠার উৎকৃষ্টতম চিকিৎসা। আমরা এই বিষয়টি সমালোচনায় ও কবিরাজী মতে আমাদের দ্বারা চিকিৎসিত রোগীর বিবরণেই বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিব। সুতরাং এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, যে সমস্ত কারণে অন্যান্য মতের বহুবিধ গ্রন্থ বর্ত্তমান থাকিতেও আমরা কবিরাজীমতে ওলাউঠা চিকিৎসা লিখিতে বসিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ক্রমশঃ।

কবিরাজ শ্রীচিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরঞ্জন।

পল্লীচিকিৎসক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

সুরেন—রাতকাণার ঔষধ কি ?

হ—'রাত কাণাকেই আমরা 'হেতান' রোগ বলি।

একটী কবরী কলার মধ্যে একটী জীবিত ছারপোকা ভরিয়া রবিবার দিন প্রাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া ঘরের ছাঁচির (ছক্কার) নীচে দাঁড়াইয়া যদি উহা খাইয়া ফেলে, একদিনে উক্ত রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। স্থলবিশেষে এই ঔষধ দুইবার সেবন করাইতে হয়। দুইবারের বেশী এই ঔষধ ব্যবহার করাইতে হয় নাই।

সু—'রবিবার' ছাড়া কি অন্যদিনে চলে না ? ঘরের ছাঁচির নীচে দাড়াইবার আবশ্যকতা কি ? পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া' ঔষধ খাইতে হইবে ইহারই বা অর্থ কি ?

হ—আমরা আপনাদের বিজ্ঞানের ন্যায় প্রতি কথার কারণ-প্রমাণ দিতে অক্ষম—যেহেতু আমরা বিদ্যাহীন! অবশ্যই ইহার একটা গূঢ় রহস্য আছেই আছে, আমি উহা জানিনা। 'শনিবার', 'মঙ্গলবার,' 'দক্ষিণদিক', 'পূর্ব্বমুখ,' প্রভৃতি অনেক 'ঠিক্‌ঠাক্' এই অবধৌতিক মতের চিকিৎসার মধ্যে দেখিতে পাইবেন। যাহা নিয়ম বলিয়া জানি, তাহাই বলিয়া যাইতেছি। গুরুবাক্যই আমরা মানিয়া চলিয়াছি, এবং চলিতেছি। অন্যপথে চলিনাই চলিতে সাহসও করিনাই; কাজেই অন্যবারে, হয় কি না, জানি না। ইহাতে আপনারা অন্ধ বিশ্বাসই বলুন আর যা'ই বলুন, প্রমাণ করিবার যখন ক্ষমতা নাই তখন আমাদের ঐ অন্ধ বিশ্বাসই ভাল। 'ফল' পাওয়া যায়, এইমাত্র জানি। কারণ খুজিয়া বাহির করা অনেক স্থলেই অসম্ভব; তজ্জন্য কারণানুসন্ধানের প্রবৃত্তিও আমাদের হয় না। আচ্ছা, বলুন দেখি, আপনাদের শিক্ষিত নামধারী পাশ করা ডাক্তারদের মধ্যেইবা শতকরা কয়জনে তাঁহাদের ব্যবহৃত ঔষধের 'ফল কেন হয়' তাহা জানেন। অধিকাংশই এই দ্রব্যের এই গুণ এইমাত্র দেখিয়া শিখিয়া রাখেন; কেন এই গুণ হয়, তাহার মীমাংসা করিতে কয়জন

চেষ্টা করেন, আর চেষ্টা করিয়াই কয়জন প্রত্যেক কার্য্যের কারণ বাহির করিতে সমর্থ হ'ন ? 'ঘরের ছাঁচি', 'পূর্ব্বমুখ' প্রভৃতি সম্বন্ধে ও আমার উত্তর ঐ একইরূপ।

এই ঔষধের নামই 'কলা পড়া'। রোগী কিম্বা অপরের অজ্ঞাতে কলার মধ্যে উহা ভরিয়া দিতে হয়।

পানের সহিত জোনাকী পোকা—চলিত কথায় যাহাকে 'জুনী' পোকা বলে—সন্ধ্যাবেলা সেবন করিলে অথবা পানের রস প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে চোকে ৩। ৪ ফোঁটা করিয়া দিলে, উক্তরোগ সারে।

ভাল গব্যঘৃত গরম করতঃ হাত পায়ের তালুতে এবং ব্রহ্মতালুতে ও চক্ষুর পাতার উপর মালিস করিলে অচিরেই রোগমুক্ত হওয়া যায়।

দধির সহিত গোলমরিচ ঘষিয়া অল্প মাত্রায় চক্ষুতে দিলেও রাত্র্যন্ধ (হেতান) রোগ দূরীকৃত হয়।

সু—এই রোগে চাউল মাপিবার পুরা (সর) দিয়া ও না জানি কি করে ?

হরি—হাঁ, আন্ধার (কৃষ্ণ) পক্ষের রাত্রিতে ঘোর সন্ধ্যাবেলায় রোগীসহ চিকিৎসক বসে। সম্মুখে একটী 'পুরা' থাকে। কেহ কেহ শনিবার কি মঙ্গল বার সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করে, কেহবা আমাবস্যা রাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে তিনদিন ঐরূপ করে; কাহারও মতে রোগীকে বামদিকে ও 'পুরা'টী ডানদিকে রাখিয়া উত্তরমুখ কি পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিতে হয়। চিকিৎসক নিম্নোক্ত প্রস্তাবটী (উহাই একটী মন্ত্র) বলিতে থাকে আর ঐ রোগী উহা অতি মনোযোগের সহিত একাগ্রচিত্তে শুনিতে থাকে। প্রস্তাবটী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরাটি গড়াইয়া দিয়া রোগীকে ধরিয়া আনিতে বলে—এরূপে একইবেলা, তিনবার করায়। ইহাতেও অনেক রোগী আরোগ্য হয়।

প্রস্তাবটী এই—'এক গায়ে তিনটী; তিনটী ছেলে ছিল। তার একটী ল্যাংটা, একটি কাপড় পড়তে জানে না, একটির কাপড়ই নাই; তারা তিনজনে একত্রে দেশ দেখ্‌তে বাহির হইল। যাইতে যাইতে যায়, আর রাস্তা ফুরায় না? ফুরায়না, পথের মধ্যে এক জা'গায় পাইল তিনটা পয়সা। পয়সা, তার একটা টুটা, একটা ফাঁটা, একটার তামাই নাই—যে'টার তামা নাই, মাত্র সেইটাই টোকাইয়া লইল-লইল ত লইল, থুইল কোথা? যার

কাপড় নাই তা'র কোছে। যায়, যাইতে যাইতে পথে এক জেলের সঙ্গে দেখা—দেখা হ'ল, আর ঐ তামা ছাড়া পয়সাটা দিয়া কিনিল তিনটা টেংরা মাছ; কিনিল, লইয়া চলিল ৩জনে ৩টা; —যায়, ঘরনাই, দুয়ার নাই, কেবল মাঠ। বেলা দুপুর বেলা পাইল একটা কুমার বড়ী—বাড়ীতো বাড়ী যেন রাজপুরী—রাজপুরীতে মোটে তিনখানা ঘর—একটা প'ড়েগে'ছ, একটার চালা নাই, আর একটার থাম নাই, খুটা নাই—নাইত নাই, ভিটীর মাটীর চিহ্নও নাই; সেই ঘরে ঢুকিল ছেলে তিনটা.—ঢুকিল, পাইল তিনটা পাতিল—তা'র ১টা ভাঙ্গা, ১টা চুড়া, একটার তলাই নাই, যে'টার তলা নাই, সেইটায় বসাইল মাছ পাক। তিনজনে কাঠ কুড়াইয়া আগুণ ধরাইল: —ধরাইল, পাক হইল, মাছ কয়টা পড়ে গেছে, ঝোলটুক্ বাকী আছে; আছে, ঝোলটুকুই তিনজনে উদর ভরিয়া খাইল—খাইল, আবার চলিল"।

এই শেষ "চলিল" কথার সঙ্গে সঙ্গেই "পুরাটা"ও চিকিৎসক গড়াইয়া চালাইয়া দেয়।

সু—এযে, একটা আজগুবি মন্ত্র! আচ্ছা, রোগীকে কি পুরাটা নিয়াই আসিতে হয়?

হ—আজগুবি মন্ত্রই বলুন, আর গুলিখোরী গল্পই বলুন; লোকে এর সাহায্যে উপকার পেলেই'ত হ'ল! রোগীকে অনুসন্ধান করিয়া পুরাটা নিয়াই আসিতে হয়?

সু—আচ্ছা রোগীতো রাতকাণা, যদি সে পুরাটা দেখিতে না পায় এবং আনিতে না পারে, তবে কি হয়?

হরি—অন্য একজনে রোগীকে পুরাটা অগত্যা তখন দেখাইয়া দেয় এবং রোগী নিয়া আসে।

সু—এখন তিমির রোগের ২।১ টা ঔষধ বল না?

হ—"তিমির" রোগ কি বুঝিলাম না।

সু—দর্শন দোষ অর্থাৎ কুয়াসার ন্যায় বা ঘোর ঘোর দেখা।

হ—সাধারণতঃ আমরা যাহাকে 'খুয়া খুয়া দেখা বা আবজা আবজা দেখা" বলি তাই কি?

সু—হাঁ, চোকে কম দেখা:—কেহ কেহ যাহাকে 'চালিশে পড়িয়াছে' বলে।

হ—আহারান্তে জল দ্বারা করতল ঘর্ষণ করিয়া ধুইয়া, হস্তস্থিত জলের ফোটা চোকে দিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

সেঁচি শাকের পাতার রস সপ্তাহ কাল বা কিছু অধিকদিন হাতের ও পায়ের তালুতে মালিস করিলে উক্ত রোগ দূর হয়। মস্তিষ্ক রোগ হেতু চক্ষুর দৃষ্টিহীনতা ঘটিলেও উহাতেই আরোগ্য হয়।

চিত্রা নক্ষত্র ও ষষ্ঠী তিথি একত্র হইলে সেই দিন পরিষ্কৃত সৈন্ধব লবণ চূর্ণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে অসাধ্য তিমির রোগও আরোগ্য হয়।

শ্বেত পুনর্নবার রস ও জল সমপরিমাণে মিশাইয়া চোকে দিলে চোকের ঝাপসা কাটিয়া যায়।

সু—চক্ষু দিয়া জল পড়িলে বা জ্বালা হইলে তাহা নিবারণের উপায় কি?

হ—প্রাতঃকালে ঠাণ্ডা জল দ্বারা মুখ পূর্ণ করতঃ গণ্ডুষ দ্বারা চক্ষুর মধ্যে গাঢ়রূপে শীতল জল সিঞ্চন (জল ঝাপ্টা) করিলে চক্ষু রোগ সমূলে নষ্ট হয়।

শ্বেত পুনর্নবার রস ও তৈল সমভাগে মিশাইয়া চোকে দিলে চক্ষু দিয়া জল পড়া ও জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়।

জলে ডুব দিয়া চোক মেলিয়া চোকের সম্মুখে হস্ত দ্বারা জল আলোড়ন করিলেও জ্বালা ও জল পড়া নিবারিত হয়।

মধুসহ সামান্য পরিমাণ লবঙ্গ ঘসিয়া ঈষৎ উষ্ণ করিয়া চোকে দিলে চক্ষুর নালী, ফুলা, জলপড়া প্রভৃতি ভাল হয়।

সু—চক্ষুতে হঠাৎ কিছু ঢুকিলে বড়ই কষ্ট হয়, ঐ জ্বালা দূরীকরণের উপায় আছে কি?

হ—আছে; সাধারণতঃ চোক হইতে প্রবিষ্ট দ্রব্যটী খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই অচিরে জ্বালা দূর হয়।

যদি চক্ষুতে কি ঢুকিয়াছে বুঝা না যায় এবং কোনও উপায়েই উহা বাহির করিতে না পারা যায়, তবে চোকের ভিতর একটী পরিষ্কৃত চাউল প্রবেশ করাইয়া দিবেন; ভয় নাই ঐ চাউল দ্বারা কোনও যন্ত্রণাই হইবে না, বরং ঠাণ্ডা বোধ হইবে। পরে চোক বুজিয়া থাকিলে বা ঘুমাইলে কিছুক্ষণ পরেই প্রবিষ্ট দ্রব্যটি সঙ্গে করিয়া চাউলটী আপনাআপনিই বাহির হইয়া পড়িবে; চোকের জ্বালা যন্ত্রনা ফুরাইয়া যাইবে।

চোকে কিছু প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র যদি তখন, তখন চক্ষু মেলিয়া পেছনে ৩।৪ পদ হাটা যায় তবে দেখিবেন আপনার চোকের পোকা বা ধুলা বালি আপনাপনিই বাহির হইয়া গিয়াছে ; কোনও জ্বালা যন্ত্রনা নাই। কেহ কেহ তৎক্ষণাৎ দক্ষিণে, বামে ও উর্দ্ধমুখে থুথু ফেলিয়া ও পেছনে হাটিয়া আসে এবং পোকা বা ধুলা প্রভৃতির চক্ষে পড়ার দরুণ জ্বালা হইতে রক্ষা পায়।

সু—চোকের কোটায় বা পাতায় পিছির নিকট দিয়া যে ব্রণ হয় উহার ২।১টী ঔষধ বল না ?

হ—যাহাকে আমরা 'নুন্সা' বা লুন্সা' বলি তাহার কথা কি ?

সু—হাঁ ; উহা হইলে রোগ স্থান বড় চুলকায় ও জ্বালা দেয়।

হ—উক্ত ব্রণে ছেলেপিলের লিঙ্গ স্পর্শ করাইলে উহা সারে। 'দা' বা লৌহ নির্ম্মিত কোনও দ্রব্য স্পর্শ করাইলে ও আরোগ্য হয়।

গরম জলে স্বেদ দিলেও উপশম হয়।

একটী চিনে জোঁক (ক্ষুদ্র আয়তনে স্থূল জোঁক) আনিয়া উহা ঐ ব্রণে বুলাইলে (ছোঁয়াইয়া নাড়াচাড়া করিলে) ঐ রোগ ভাল হয়—জোঁকটী কিন্তু তৎক্ষণাৎই মরিয়া যায়।

আজ অনেক হইল, এখন আর নয় ; আবার কা'ল হইবে, এখন বিদায় হই।

সুরেন—আচ্ছা, ভু'লোনা যেন ?

হরি—যখন কথা দিয়াছি, তখন এটা আমার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের মাঝে হইয়া পড়িয়াছে, ভুলিব কেন ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

গঙ্গাধরের পাচন ও মুষ্টিযোগ।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সৈদাবাদের স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজের নাম অদ্যাপিও প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ভারতের আবালবৃদ্ধ বনিতার হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। যিনি কষ্ট সাধ্য বহুরোগের চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন ; বলিয়া সুচিকিৎসক, শাস্ত্রবাদে বহুজ্ঞ বলিয়া সুপণ্ডিত এবং বহুপণ্ডিতের মতের

প্রতিকূলেযুক্তি ও শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ বলে স্বপক্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ঋষতুল্য মনুষ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার মুষ্টিযোগ ও পাচন সমূহ যে ভারতের জন সাধারণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত আদরণীয় হইবে, ইহাতে সন্দেহের বিষয় কি আছে? স্বনামধন্য সেই মহাপুরুষের মুষ্টিযোগ ও পাচন সমূহ সর্ব্বত্র জনসাধারণকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা।

"উদ্ধৃত্য মুষ্টিনাচ্ছাদ্য ভেষজংযৎ প্রযুজ্যতে।
তন্মুষ্টিযোগ মিত্যাহু মুষ্টিযোগ পরায়ণাঃ।" (চক্রদত্ত।)

যে সকল ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া মুষ্টি পরিমিত প্রয়োগ করা যায়, মুষ্টিযোগ পরায়ণ চিকিৎসকগণ তাহাকে মুষ্টিযোগ বলেন।

"পচেন্নামং বহ্নিকৃচ্চ দীপনং তদ্যথা মিশিঃ।
পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্ তদ্ধি পাচনম্॥
নাগকেশর বদ্ বিদ্যাচ্চিত্রো দীপন পাচনঃ॥ "শাঙ্গধরঃ।

যে সকল দ্রব্য আমরসকে পাক না করিয়া অগ্নিদীপ্তিকর হয়, তাহাকে দীপন কহে। যথা "মৌরী"। ইহা দ্রব্যের প্রভাব বশতঃই হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য আমরসকে পাক করিয়া অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে না, তাহাকে পাচন কহে। যথা "নাগেশ্বর"। ইহাও দ্রব্যপ্রভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে। "চিতাকে" উভয় গুণাত্মক (অর্থাৎ একাধারে দীপন ও পাচন গুণ বিশিষ্ট) বলিয়াই জানিবে। অগ্নিবল বুঝিয়া পাচনে দীপনাত্মক দ্রব্যসমূহ ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমরা জ্বর চিকিৎসা হইতে ক্রমশঃ সেই মহাপুরুষ ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ফল প্রদ মুষ্টিযোগ গুলি লিখিয়া যাইব।

জ্বর চিকিৎসা।

প্রথমতঃ কাথ প্রস্তুত করিবার প্রণালী জ্ঞাত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

"দ্রব্যাদাপোত্থিতনত্তোয়ে বহ্নিনা পরিতাপিতাৎ।
নিসৃতো যো রসঃ পূতঃ সংশৃতঃ সমুদাহৃতঃ।।
কাথঃ কষায়ো নির্য্যূহঃ পর্য্যায়স্তস্য উচ্যতে।।"

দ্রব্য সমূহ কুট্টিত করিয়া জল সহযোগে অগ্নিতে পাক করতঃ বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিলে যে রস নিঃসরণ হয়, তাহাকে শৃত বলে। ক্বাথ, কষায় ও নির্য্যূহ, শৃতের পর্য্যায় বাচক নাম।

ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হইলে, একটি হাঁড়িতে ক্বাথ দ্রব্য দুই তোলা ও জল অর্দ্ধসের দিয়া অগ্নিপক্ক করিবে। যখন চতুর্থাংশ (অর্দ্ধপোয়া) অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইয়া একখণ্ড বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই ক্বাথ প্রস্তুতের সাধারণ নিয়ম।

কফজ্বরে—

পটোল পত্র, হরীতকী, চিরতা, বাসক পত্র ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে কফজনিত জ্বর উপশমিত হয়। মুথা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, কটকী, পরূষকফল, (ফল্সা), ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

কুড়, ইন্দ্রযব, সূর্য্যমুখী ও পটোল পত্র, ইহাদের ক্বাথ সেবনে কফজ্বরের শান্তি হয়। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, বাসকপত্র, গুলঞ্চ, কটকী ও বচ ইহাদের ক্বাথ সেবনে কফজ্বর নিবারিত হয়।

পিত্তজ্বরে—ধনে ও পটোল পত্রের ক্বাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বরের পক্ষে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ক্ষেতপাপড়া, বালা, রক্তচন্দন ও শুণ্ঠী ইহাদের ক্বাথ সেবনে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষেতপাপড়া, গুলঞ্চ ও আমলকীর ক্বাথ সেবনেও তদ্রূপ ফল হয়।

ধনের জল বাসি করিয়া চিনি সহযোগে পান করিলে, আভ্যন্তরিক দাহ অতি সত্বর প্রশমিত হয়। প্রস্তুতের নিয়ম—কুট্টিত ধনে দুইতোলা, জল অর্দ্ধ পোয়া; পূর্ব্বদিবস ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিবসে ব্যবহার করিতে হইবে।

পিত্তজ্বরে যে ব্যক্তি তৃষ্ণা ও দাহে অত্যন্ত কাতর হয়, তাহার শিরঃ প্রদেশে ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িমের খোসা, লোধ কাষ্ঠ, কয়েতবেল ও ছোলঙ্গলেবুর কেশর সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করতঃ প্রলেপ দিবে। ইহা প্রায় জীর্ণ জ্বরেই ব্যবহার হইয়া থাকে। কারণ তরুণ জ্বরে এতাদৃশ শীতল ক্রিয়া করার পক্ষে সুশ্রুতে নিষেধ আছে। পিত্তজ্বরে রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া নাভিদেশে তামা বা কাঁসা প্রভৃতির গভীর পাত্রে সুশীতল জল উপযুক্ত পরিমাণে

ঢালিলে আশু দাহ নিবারিত হয়। কিন্তু জল ঢালিবার সময় যাহাতে রোগীর গাত্রে জল-কণিকা না লাগে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক।

পিত্তজ্বরে, কাঁজিদ্বারা বস্ত্র আর্দ্র করিয়া শরীর অবগুণ্ঠন করিলেও দাহ নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বিষম জ্বরে—ক্ষেতপাপড়া ও শেফালিকা পত্রের রস দুই তোলা, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে, বিষমজ্বর অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। একমাত্র শেফালিকা পত্ররস ২ দুই তোলা, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলেও বিষম জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ ১ একতোলা, ক্ষেতপাপড়া ১ তোলা ও শেফালিকা পাতা ১ তোলা গ্রহণ করিয়া কুট্টিত করতঃ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে বস্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া রস বাহির করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিষম জ্বর আশু নিবারিত হয়। চিরতা, গুলঞ্চ ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। গোলমরিচ, লাটার শাস ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং চিরতার চূর্ণ তিন তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বরূপ মাত্রায় সেবন করিলেও বিষম জ্বর প্রশমিত হয়।

তুলসীপত্ররস কিম্বা দ্রোণ পুষ্পের রস দুই তোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ গোলমরিচ চূর্ণ সহ সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কণ্টকারী, তেউড়ি, কেশুর্ত্তে, ক্ষেতপাপড়া ও মুথা ইহাদের কাথ সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া বিষম জ্বর নিবারিত হয়। কটকী চারিআনা, ছোটএলাচি দুইআনা, যষ্টিমধু দুইআনা, অনন্তমূল অর্দ্ধতোলা, সোণামুখী বারআনা ও ধনে চারিআনা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া পূর্ব্ব রাত্রে তিনছটাক জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিবস প্রত্যুষে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া ঐ জল পান করিবে। ইহা দ্বারা মৃদু বিরেচন হয় এবং বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়।

গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা ও নিমছাল এইসকল দ্রব্যের কাথ এবং চিরতা গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া বাসকপত্র ও ধনে ইহাদের কাথ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হয়।

রসুনের বল্কল দুই আনা কিম্বা চারিআনা এবং তিলতৈল উক্তপরিমাণে একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিষমজ্বর ঘোরজ্বর ও বাতরোগ হইতে অচিরাৎ মুক্তিলাভ করা যায়। তিলতৈলের পরিবর্ত্তে গব্যঘৃতের সহিত সেবনেও উক্তরূপ ফল পাওয়া যায়।

অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে—পটোল পত্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া নিমছাল, কিস্মিস্, সোঁদাল (কানাইলড়ি) ও বাসকমূলের ছাল, ইহাদের কাথে মধু সিকি তোলা ও চিনি সিকি তোলা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অন্যেদ্যুষ্ক (ঐকাহিক) জ্বর প্রশমিত হয়। দ্রব্যগুণজ্ঞ ব্যক্তিগণ উক্ত দ্রব্যসমূহের প্রভাব সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

চাতুর্থক জ্বরে—অগস্ত্যপত্রের (বকপত্রের) স্বরসের নস্য দ্বারা চাতুর্থকজ্বর আশু নিবারিত হয়।

পালা জ্বরে—আপাঙের মূলের রসের নস্য অথবা অপরাজিতা পাতার রসের নস্য দ্বারা পালাজ্বর দুরীভূত হইয়া থাকে।

বাতপিত্ত জ্বরে—কণ্টকারী,বেড়েলা (বাইরকলি,) রাস্না,বালাপাতা, গুলঞ্চ ও চাইলতা ইহাদের ক্কাথ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর উপশমিত হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে—মুথা, শুঠ ও চিরতা ইহাদের প্রত্যেকদ্রব্য দুই তোলা মাত্রায় লইয়া দেড় সের জলে সিদ্ধ করিয়া তিন ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া পান করিবে। এই ক্কাথ কফ, বাত ও আম প্রশমক, পাচক এবং জ্বর বিনাশক।

বালুকা স্বেদ—একটী হাঁড়িতে বালুকা উত্তমরূপে উত্তপ্ত করিয়া, তাহা, একখণ্ড বস্ত্রের উপর এরণ্ডপত্র, আকন্দ পাতা অথবা পান পাতিয়া, তদুপরি রাখিতে হইবে এবং উহাতে কাঁজির জল অল্প পরিমাণে সিঞ্চন পূর্ব্বক একটী পুটুলী বাঁধিয়া স্বেদ দিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর শিরঃপীড়া ও অঙ্গবেদনা নিবৃত্তি হয়। বালুকাস্বেদ বাতশ্লেষ্মজ্বরের একটী মহৌষধ। অনেক সময় একমাত্র স্বেদ প্রয়োগেই জ্বর বিচ্ছেদ পাইতে দেখা গিয়াছে। অণ্ডকোষ, হৃদয় প্রদেশ ও চক্ষু ব্যতীত সর্ব্বশরীরেই স্বেদ দিবে। যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে তথায় মৃদুস্বেদ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জ্বরে ঘর্ম্ম হইতে

থাকিলে, ঘর্ম্মরোধার্থ কুলথকলায় ভাজিয়া তাহার চূর্ণ রোগীর অঙ্গে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

জীর্ণজ্বরে—অর্দ্ধতোলা পিপুল চূর্ণের সহিত অর্দ্ধতোলা পুরাতন গুড় সেবন করিলে, পাণ্ডু, অরুচি, ক্রিমি, শ্বাস ও জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়।

প্লীহাজ্বরে—নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কালতুলসীর পাতা ও গোলমরিচ ইহাদের প্রত্যেকে সমানাংশ গ্রহণ করতঃ একত্র পেষণ করিয়া বুট্ প্রমাণ বটিকা করিবে। উহা গোমূত্র অনুপানে সেবন করিলে, প্লীহাসংযুক্ত জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। উক্ত চারিপদের ক্বাথ সেবনেও যথেষ্ট উপকার হয়। ইহা দৃষ্টফলপ্রদ। ধন্য ৺গঙ্গাধর কবিরাজের দ্রব্যগুণ বিচার।

ত্রিদোষ জ্বরে—গোলমরিচ, পিপুল শুণ্ঠী, মুথা, হরীতকী আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, নিমফল, বাসকপত্র, চিরতা, গুলঞ্চ ও দুরালভা ইহাদের ক্বাথ সেবনে ত্রিদোষজ জ্বর নিবারিত হয়।

অতিসার চিকিৎসা।

বালাপাতা, ইন্দ্রযব, ধনে, মুথা ও মোচরস ইহাদের ক্বাথ সেবনে অতিসার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শুণ্ঠী, আতৈষ ও মুথা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ অতিসার ও বেদনা নাশক, আম পাচক ও গ্রঅগ্নদীপক। ধনিয়া ও শুণ্ঠী এই দুই দ্রব্যের ক্বাথ ও উক্ত গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বেলশুঠ ও আম্রাস্থির (আমের আঁঠির শস্য) ক্বাথ কিঞ্চিৎ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে, অতিসার ও বমন নিবৃত্তি হয়। পটোলপত্র, যব ও ধনে ইহাদের ক্বাথ সেবনেও উক্তরূপ ফল পাওয়া যায়।

বাবলা পত্রের রস অথবা শোণাছাল ও কুটজের ছালের রস দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার অতিসার নিবারিত হয়।

ইন্দ্রযব ও কুটজের ছালের ক্বাথ সেবন করিয়া মধ্যাহ্নে ঘোলের সহিত অন্নাহার করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও আমাশয় প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তাতিসারে—কেবল মাত্র ইন্দ্রযবের ক্বাথ সেবন করিলে পিত্তাতিসার দূরীভূত হয়।

মউয়াফুল, কটফল ও দাড়িমের খোসার চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা অথবা উহা হইতে অধিক মাত্রায় কিঞ্চিৎ মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে, পিত্তাতিসার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমাতিসারে—আকানাদি (দৈফুল)° পত্র, ইন্দ্রযব, হরীতকী, ও শুঠ ইহাদের ক্বাথ সেবনে আমাতিসার নিবারিত হইয়া থাকে।

বিংশতিটি মুথা কুট্টিত করিয়া দেড়পোয়া জল ও অর্দ্ধপোয়া ছাগীদুগ্ধ সহ পাক করিবে। দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া ঐ ক্বাথ আমাতিসারীকে সেবন করাইলে আমাতিসার ও তজ্জন্য নাভিশূল অচিরে প্রশমিত হয়। অর্দ্ধতোলা পরিমিত থানকুনী পাতার রস কিঞ্চিৎ মধু সহ সেবন করিলে আমাতিসার বিনষ্ট হয়। ইহা প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিবে। গন্ধভাদুলিয়া পাতার রস ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে উক্তরূপ ফল পাওয়া যায়। কচিবেল পোড়া ২ তোলা ইক্ষুগুড় ২ তোলা, পিপুল চূর্ণ দুই আনা, শুণ্ঠীচূর্ণ দুই আনা কিঞ্চিৎ তিল তৈল সহ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিরুদ্ধবায়ু ও আমাতিসারের শান্তি হয়।

বেলশুঠ ও হরীতকীর ক্বাথ বেদনাযুক্ত আমাতিসারীর পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে।

কচিবেলের শস্য ১ তোলা ও তিল বাটা অর্দ্ধতোলা ঘোলের সহিত সেবন করিলে আমাতিসার অতি সত্বর প্রশমিত হয়।

রক্তাতিসারে—কচি আমপাতা, জামপাতা ও আমলকীপাতার রস দুই তোলা কিঞ্চিৎ মধু সহ সেবন করিলে অতিপ্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

কেচরাপাতা, কচি আমপাতা, দাড়িমের কচি লাল পাতা, পাণিফলের পাতা, বেলশুঁঠ বালাপাতা, মুথা ও শুন্ঠি ইহাদের ক্বাথ সেবনেও বিশেষরূপে রক্তাতিসারের উপর ক্রিয়া করে।

কুটজছাল, বেলশুঁঠ, দাড়িমের খোসা, মুথা ও আম্রাস্থি (আমের আঠির শস্য) ইহাদের ক্বাথ সেবনে রক্তাতিসার দূরীভূত হয়।

একমাত্র দাড়িমের কচি লালপাতা অর্দ্ধতোলা পরিমিত পেষণ করিয়া একপোয়া ঘোল ও চিনি সহ সেবন করিয়া ঘোলের সহিত অন্নাহার করিলে, রক্তাতিসাস নিবারিত হয়। কিন্তু জ্বর অবস্থায় ঘোল নিষিদ্ধ।

বেলশুঁঠ এক তোলা ও ছাগীদুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া আবশ্যকমত জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে; যখন দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিবে, তখন ছাকিয়া উহাতে মোচরস ও ইন্দ্রযব চূর্ণ প্রত্যেকে এক আনা এবং চিনি দুই আনা মিশ্রিত করিয়া অতি দুর্ব্বল আমাতিসারীকে সেবন করাইলে, বিশেষ উপকার দেখা যায়। একসিকি বা অর্দ্ধতোলা কাঁটানটে পেষণ করতঃ তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

এক সিকি বা অর্দ্ধতোলা কৃষ্ণতিল পেষণ করতঃ কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া একছটাক বা অর্দ্ধছটাক দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে একদিবসেই রক্তাতিসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

একসিকি বাবলার কুড়ি, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তাতিসার দূরীভূত হয়।

জীরা ।• তোলা, জাতিফল ।• তোলা, হরীতকী ॥• তোলা, জঙ্গীহরীতকী ॥• তোলা, লবঙ্গ ॥• তোলা, সৈন্ধব লবণ ৵• দুই আনা এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন পূর্ব্বক ৭টী বটী করিবে। কুটজছাল ২ তোলা, উক্তবটী ১টী, জল অর্দ্ধসের, সহ সিদ্ধ করতঃ অবশিষ্ট /৵• অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া দিবসে দুইবার সেবন করিলে প্রবল রক্তাতিসার, আমাতিসার, আমশূল, পিত্তাতিসার ও বমন প্রভৃতি অতি সত্বর প্রশমিত হয়। এই ঔষধটী ৺ গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের সিদ্ধযোগ। এই ঔষধ সেবনে যে কত জটিল আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগী আরোগ্য হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাকে বিংশশতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্রমশঃ।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত কবীন্দ্র।

সমাজরক্ষা ও শারীরতত্ত্ব।

আজকাল ভারতীয় মনুষ্য সমাজ খরতর বেগে মৃত্যুমুখে প্রধাবিত হইতেছে; বিশেষতঃ হিন্দুসমাজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে ধ্বংশপ্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিবেনা; কেবল ইতিহাসবেত্তাগণ ইতিহাস পাঠে অবগত হইবেন যে, হিন্দু

নামে পরিচিত একজাতীয় মনুষ্য ছিল। দশমবাৎসরিক জনসংখ্যা বিজ্ঞাপনপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, হিন্দুর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতেছে ; মুসলমান প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং পাশ্চাত্য-বিদ্যাবিৎ একদল মনীষী অনুমান করেন যে হিন্দুর শাস্ত্রে যে সকল বিধান আছে—তাহা, অর্থাৎ বালিকাবিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষেধ,ইত্যাদি নিয়ম পরিবর্ত্তন না হইলে লোকক্ষয় নিবারণ করা অসম্ভব। লোকক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে ভ্রূণহত্যা নিবারণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি একটি আট বা দশবৎসর বয়স্কা বালিকা বিবাহ করিয়া সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই ভবলীলা সম্বরণ করিল, আর তদীয় ভার্য্যা ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা আত্ম-দোষ প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কামবেগ দমনে প্রবৃত্তা হইলেন : হিন্দুসমাজে এইরূপে লোকসংখ্যার অল্পতা হইতেছে। ভ্রূণহত্যা নিবারণ-কল্পে বালিকা-বিবাহ রহিত ও বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। স্মৃতি-শাস্ত্র পাঠ করিলে বিধবার বিবাহের বিধি পাওয়া যায় : পুরাণ ও ইতিহাস পাঠ করিলে বিধবা বিবাহ ও পুরুষের বহু বিবাহের নজির দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে খাদ্য-সামগ্রী যেরূপ মহার্ঘ্য, তাহাতে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী ও তজ্জাত বহু পুত্রকন্যার ভরণ পোষণে অসমর্থ বিধায় পুরুষের বহু বিবাহ অসঙ্গত ; পক্ষান্তরে একজন পুরুষের প্রতিপাল্যরূপে বিশেষতঃ দুই তিনটী বিধবা জুটিলেও ভরণপোষণ করা সাধ্যায়ত্ত নয়। ভারতীয় আর্য্যগণ বিধবাগণকে মৎস্য মাংসাদি ভোজনরূপ রসনার তৃপ্তি সাধন ও সর্ব্ববিধ বিলাস ভোগ হইতে বঞ্চিত রাখিয়া এবং একাদশী প্রভৃতি উপলক্ষ্যে উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া নানারূপ কষ্ট দেন ; গৃহদাসী অপেক্ষাও হিন্দু বিধবা অধিক কষ্টে দেহাতিপাত পূর্ব্বক পিতা, ভ্রাতা অথবা শ্বশুর প্রভৃতির গৃহে কালযাপন করে। এই সকল কারণে সমাজ-সংস্কার প্রয়াসী পাশ্চাত্য বিদ্যার্ণব মনীষিগণ বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন দ্বারা বিধবার কষ্টনিবারণ ও লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে উপদেশ দিয়া করুণাসাগর ও সমাজহিতৈষী হইতে চাহেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহান্ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু গবেষণাপূর্ণ কিনা সন্দেহ। প্রাচীন-কাল হইতে সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগ পর্য্যন্ত বিধবা-বিবাহ, ও ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীলোক বিবাহ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল ; সে সময়ে কানীন-পুত্র,সহোঢ়পুত্র,

গূঢ়োৎপন্ন পুত্র প্রভৃতি পুত্ররূপে গৃহীত হইত, তাহাতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল, তবে কেন বর্ত্তমান কলিযুগের পক্ষে সেই সকল নিয়ম বন্ধ হইল? যদি বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রভৃতি রহিত না হইত তবে বর্ত্তমান সমাজ-হিতৈষীগণের পক্ষে নানারূপ প্রয়াস স্বীকারে শিরোনিঃসৃত স্বেদ-স্রোতঃ পদতলে নিপাতন করিতে হইত না। অনেক সমাজ-হিতৈষী করুণাসাগর, বিধবা-বিবাহ-রহিতকারী নিজ নিজ উর্দ্ধতন পূর্ব্বপুরুষকে "অবিবেচক ও অপরিণামদর্শী" প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিয়া নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির গরীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিজ পূর্ব্বপুরুষগণকে ঐরূপ শোভাসম্পন্ন দেখিতে ভালবাসেন, তাঁহারা সেই ভাবে দেখুন; আমরা কিন্তু নিজ পূর্ব্বপুরুষকে ঐরূপ বিশেষণ ভূষিত করা শ্লাঘাকর মনে করি না। আমরা মনে করি, যাহাতে আমাদের হিত হইবে, যাহাতে আমরা দীর্ঘায়ুঃ-সম্পন্ন হইব, যাহাতে লোকক্ষয় নিবারিত হইবে, কাল প্রভাবে দিন দিন বৃদ্ধিশীল হিংসাদ্বেষ আত্মকলহ প্রভৃতি, যদ্দ্বারা প্রতিরুদ্ধ থাকিবে, যাহাতে লোকসমাজ অধঃপাতে না যাইতে পারে, নরকের দ্বার স্বরূপ কামক্রোধাদির প্রতি ধাবমান মনুষ্য সমাজ যাহা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকিবে, তাহাই বিবেচনা পূর্ব্বক, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, কলিযুগারম্ভের সময় হইতেই চির-প্রবাহিত বিধবা বিবাহ-প্রথা প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়াছেন। সেই সকল প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে সমাজ ক্ষয় অনিবার্য্য বেগে প্রবাহিত হইবে। বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে ভ্রূণহত্যা কথঞ্চিৎ নিবারিত হইতে পারে, বিধবাগণ ও মৎস্য মাংসাদি ভোজনে রসনার তৃপ্তি বিধান ও বিলাস বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারেন সত্য, কিন্তু তাহা ভিন্ন আর কিছু উপকার নাই।

যে লোক-বৃদ্ধির জন্য এতদিন বিধবা-বিবাহ সঙ্গত বোধ হইতেছিল, এখন আবার দেখিতেছি সে জন্যই অসবর্ণা বিবাহেরও আবশ্যকতা বোধ হইতেছে। ইহাতে অনুমান হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহাতেও কুলাইবে না। সে সময়ে সহোঢ় ও গূঢ়োৎপন্ন পুত্রকে পুত্ররূপে স্বীকার করিয়া নিজ সমাজে লোক-সংখ্যার আধিক্য দেখাইতে হইবে। তথা কথিত পুত্রের পিতৃধনে অধিকার লাভের নিমিত্ত হিন্দুর দায়ভাগ পরিবর্ত্তনের "বিল" মঞ্জুরীর প্রয়োজন;

হইবে। এইরূপে হিন্দুসমাজ দিন দিন অধস্তন প্রদেশে উপনীত হইবে, সন্দেহ নাই আমাদের মতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া মনীষিগণের শিরোরোগ উৎপাদনের প্রয়োজন নাই; কাল-স্রোতের প্রেরণায় বর্ত্তমান প্রজাপতিগণ স্বতঃই প্রজা উৎপাদনের ক্ষেত্র আবিষ্কার করিতেছেন ও করিবেন। আমরা বলি, লোক ক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে দীর্ঘায়ুঃ লাভের পন্থা আবিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা মশক-মক্ষিকার ন্যায় অল্পায়ুঃসম্পন্ন বহু সন্তানের জন্মবিধান করিলে ভারতীয় মনুষ্য সমাজ অপরিসংখ্যেয় হইতে পারে না।

বিধবা বিবাহের উপকারিতা বা অপকারিতা আলোচনা করা আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য লোক সমাজ রক্ষা। কি উপায় অবলম্বন করিলে লোক সমাজ দীর্ঘায়ুঃ সম্পন্ন হইবে; এক একটী লোক ৮।১০ বার লোক সংখ্যানে পরিগণিত হইবে; এবং যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন যাহাতে সুস্থ ও নীরোগ অবস্থায় কালাতিবাহন করিতে পারে, তাহা দেখানই আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে দীর্ঘায়ুঃ সম্পন্ন হওয়া যায়? এই প্রশ্নের সমাধানে পাশ্চাত্য-বিদ্যা-পারদর্শী মনিষিগণ বলিয়া থাকেন—লোকসংখ্যা বিজ্ঞাপন পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, বালিকা বিবাহ নাই, খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বিশেষে শরীরোপকারী দ্রব্যমাত্রই ভোজন প্রথা আছে; সেই সমাজে মধ্যে লোক সংখ্যা অধিক। হিন্দুসমাজ সেইরূপ নিয়মে পরিচালিত হইলে দীর্ঘায়ুঃ সম্পন্ন হইবে। আমরাও স্বীকার করি, যে সমাজ ঐরূপ নিয়মে পরিচালিত, সে সমাজে লোক সংখ্যা অধিক দেখা যায় সত্য, কিন্তু দীর্ঘ-জীবি লোকের একান্তই অভাব। অদ্যকার লোকসংখ্যানে যাহাকে পুত্র সমন্বিত দেখা গেল, পঞ্চম বা ষষ্ঠ বারের লোক সংখ্যানে দেখাগেল যে, তাহার বা তদীয় পুত্রদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। পূর্ব্বে যে বাটীতে একজন গৃহস্বামী দুই তিনটী পুত্র সহ বাস করিতেছিল, ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পরে দেখা গেল, সেই বাড়ীতে বিশজন বালক ও যুবক বাস করিতেছে; কিন্তু সেই পূর্ব্ব সংখ্যাত গৃহস্বামী বা তদীয় পুত্রগণ কেহই জীবিত নাই।

এইরূপ বালক, কিশোর এবং যুবক দ্বারা লোক সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন বিধবা বিবাহ প্রভৃতি প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন, অথবা যাহারা মনে করেন লোকসংখ্যানে দংশমশকাদির ন্যায় অল্পায়ুঃ সম্পন্ন পুত্র কন্যাদি দ্বারা অধিক লোক দেখাইতে পারিলেই নিজ সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইবে, তাঁহারা যথেচ্ছা বিধবাবিবাহ করিয়া পুত্র কন্যা উৎপাদন করুণ,অথবা সহোঢ় বা গূঢ়োৎপন্ন পুত্রদ্বারা পুত্রবান্ হউন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। তাঁহারা যে নিজ মতানুসারে সাধারণকে চলিতে উপদেশ দেন ও নিজেদের পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় অন্য লোকের পূর্ব্বপুরুষকে "মূর্খ-অবিবেচক" প্রভৃতি বিশেষণ পরিশোভিত করেন,তাহার প্রতিবাদকল্পে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইল।

আজকাল দেশের গণ্য মান্য-শিক্ষিতগণ দীর্ঘায়ুঃ লাভের উপায় নির্দ্ধারণ কল্পে বহু প্রয়াস স্বীকার পূর্ব্বক সুবোধ্য ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই সকল পুস্তক সাধারণতঃ সকলের পক্ষে পাঠের উপযোগী হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট-নিয়মানুসারে চলিলেও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে দেখা যায় না। সাধারণতঃ ষাইট সত্তর বৎসর জীবিত থাকিলেই লোকে মনে করে, যথেষ্ট দিন বাচিলাম, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে বুঝা যায়, তাহাও অকাল মৃত্যু। এবম্বিধ অকাল মৃত্যুর স্রোতোরোধ করিতে সমর্থ, এইরূপ উপায় প্রদর্শিত হওয়া প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সময়ে মনীষিগণ, দীর্ঘায়ুঃ লাভের উপায়স্বরূপ যে সকল উপদেশ দেন ও পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহা ইউরোপখণ্ডবাসী নরশরীর-বিজ্ঞানবিদ-গণের মতানুসারী শীত প্রধান ইউরোপ খণ্ডের উপযোগী আহার আচার ও বিবাহ প্রভৃতির নিয়মে উষ্ণ প্রধান ভারতবাসী দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারেন কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, স্বভাবতঃ মনে হয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মানুসারে আমরা যে দেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছি, সেই দেশেই আমাদের খাদ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে থাকাই সঙ্গত। নতুবা আমাদের শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য সামগ্রী বিপরীত দেশে থাকিলে তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা জীবন ধারণে সমর্থ হইতাম না। জীবদেহের প্রকৃতি নানাবিধ বিধায় একজাতীয় আহারে সকল জাতীয় জীব-দেহ রক্ষা হয় না। এক পশুজাতির মধ্যেও দেশভেদে আহারগত পার্থক্য

দেখিতে পাওয়া যায়; একশ্রেণীর পশুও দেশভেদে পৃথক রূপ দ্রব্য আহারে দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় গোজাতি যেরূপ তৃণ ভোজনে দীর্ঘদিন বাঁচে, সেই তৃণ ভোজনে ইউরোপ খণ্ডের গোজাতি বাচিতে পারে না। পশ্চিম অঞ্চলবাসী মনুষ্য যেরূপ দ্রব্য প্রধানরূপে আহার করে, যেরূপ আচার নিয়মে চলে, পূর্ব্বাঞ্চলবাসী সেইরূপ আহার আচার ও নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিলে রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একদেশবাসীর উপকারী আহার্য্য, আচার, নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান ভিন্নদেশবাসির পক্ষে রোগ ও অল্পায়ুর কারণ হয়,একথা প্রমাণ করিতে আমাদিগকে আর কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত হইয়াই আছে। এইসকল পর্য্যালোচনা করিলে বলিতে হয় যে; প্রাকৃতিক বিধানে দেশভেদ, জাতিভেদ ও শ্রেণীভেদ অনুসারে স্বভাব ভেদ নিবন্ধন আহার, আচার, প্রবৃত্তি প্রভৃতি পৃথক্ হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মানুসারে আমরা যে দেশে জন্মিয়ছি, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আমাদের শরীর রক্ষণের উপযোগী ও আশ্রয়স্বরূপ প্রধান আহার্য্যদ্রব্য সমূহ সেই দেশেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আমাদের জন্ম-ভূমিতে যে সকল রোগ জন্মে, তাহার প্রতীকার-ক্ষম আহার্য্য, ঔষধ ও উপকরণ প্রভৃতিও এই দেশেই জন্মে। আচার নিয়ম প্রভৃতি দেশভেদে ও প্রয়োজনানুসারে পৃথক্ হওয়াই স্বভাব সিদ্ধ। দেহধারণ ও দীর্ঘায়ুঃলাভের পক্ষে বিভিন্ন আহারাচারাদিই উপযোগী। অমৃতপ্রসবিণী ভারতমাতার সন্তান দিগের পক্ষে কখনও বিদেশ হইতে আহার্য্য, আচার, নিয়ম, ঔষধ প্রভৃতি ধারস্বরূপ লওয়ার প্রয়োজন নাই। বরং অন্য দেশবাসিগণই ভারতবর্ষের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে সমাজহিতৈষি ভারত সন্তানগণই মনে করেন যে, ইউরোপখণ্ডবাসী শারীরতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকগণ যে উপায়ে দীর্ঘজীবন লাভ হইবে বলেন; তাহা এবং তাহাদের উপদেশানুসারে আমাদের গম্যাগম্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, বিহার, আচার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইলেই আমরা দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিব। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য শারীর বিজ্ঞান প্রণেতৃগণ এখনও পরের মস্তকে বেল আঘাতিত করিয়া বেলের কাঠিন্য বা কোমলত্ব পরীক্ষার ন্যায় পরদেহে প্রয়োগ দ্বারা শারীর বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিতেছেন। এইরূপ পরীক্ষা শেষ হইলে তাহাদ্বারা

আমাদের উপকার হইলেও হইতে পারে। আমরা দিগ্‌দর্শন স্বরূপ দুই একটী উদাহরণ দ্বারা পাশ্চাত্য শারীর বৈজ্ঞানিকগণের মতের অসম্পূর্ণতা দেখাইতেছি। কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক, মনুষ্যের দন্ত অস্ত্রপরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনুষ্য জাতি প্রাকৃতিক নিয়মে মাংস ও উদ্ভিদ দ্বিবিধ খাদ্য ভোজনে অভ্যস্ত, মনুষ্যগণ মাংস ভোজন করিলে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ুঃ হইবে। আর অন্য কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, মনুষ্যগণ মাংস ভোজনে চির অভ্যস্ত হইলে দীর্ঘায়ু লাভ করে না; মাংসভোজী ও নিরামিষ ভোজীর মধ্যে তুলনা করিলে নিরামিষ ভোজীকেই নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায়। হয়ত আবার কিছুদিন পরে শুনিতে পাইব যে, কাঁচা শস্য ও বৃক্ষাদিভোজী হস্তী প্রভৃতি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হয়। অতএব মনুষ্যও যদি সেইরূপ আহার করিত, তবে সেইরূপ দীর্ঘায়ু ও বলিষ্ঠ হইত; বিশেষতঃ নজীর আছে, হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ কাঁচাফল ভোজনে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইতেন। বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে দধির ন্যায় অপকারী খাদ্য আর নাই। ইহা সাক্ষাৎ যম সহোদর ম্যালেরিয়ার জনক স্বরূপ। এখন শুনিতে পাই, দধি সর্ব্বজ্বর নিবারক, বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ সন্ধান-বজ্র, সর্ব্বজ্বরগজসিংহপ্রতিম। এইরূপ অসম্পূর্ণ ও পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ পাশ্চাত্য শারীর বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে মনুষ্যগণ কতদিন জীবিত থাকিতে পারে, তাহা সকলেরই সহজে অনুমেয়। কথনও স্বয়ং অসম্পূর্ণ, অন্যকে পূর্ণজীবন প্রদানে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত বলিতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্য শারীরবিজ্ঞানমতানুসারে চলিলে আমাদের দীর্ঘজীবন লাভ অসম্ভব।

দীর্ঘায়ুঃ লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আমরা বলি, আমাদের যাহা আছে, আবহমান কাল হইতে যে মত সর্ব্বদেশবাসী মনুষ্যের পক্ষে উপযোগী, জাতি ও ধর্ম্ম-বিশেষে পার্থক্য করিয়া দেশ ও কালভেদ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্যের দেহ ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যানুসারে বহু পূর্ব্বে সিদ্ধান্তীকৃত, ও পরবর্ত্তিকালের যোগজ্ঞানসম্পন্ন মুনিঋষিগণ কর্ত্তৃক অভ্রান্ত সত্যরূপে স্বীকৃত, আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্ম সংহিতা প্রভৃতিতে উপদিষ্ট বিধানে যদি আহার আচার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়, তবেই ভারতীয় মনুষ্য সমাজ, বিশেষতঃ হিন্দু সমাজ অপ-

রিসংখ্যেয় ও দীর্ঘায়ুঃ সম্পন্ন হইবে। যে বিধান অনুসারে পরিচালিত হইয়া শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ প্রভৃতি আর্য্যগণ (আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষগণ) দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়াছিলেন, এবং মনুষ্যজাতি অকালমৃত্যুগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিলে দয়াপরবশে যে শাস্ত্রের আশ্রয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই আয়ুর্ব্বেদ আমাদের বর্ত্তমান বিপদ উদ্ধারের প্রকৃষ্টতম উপায়। যে আয়ুর্ব্বেদে মনুষ্যের পরমায়ুঃ একশত বৎসর নির্দ্দেশ করিয়া, তাহারও অধিক করিবার প্রণালী ও ঔষধ উপদিষ্ট হইয়াছে ; যাহাকে অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য নর-শরীর-বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নিজদেশীয় শারীর-বিজ্ঞান সংশোধিত, পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন; যে আয়ুর্ব্বেদ মনুষ্যসমাজ রক্ষণে ও ধারণে যোগ-উপদেশাবলীর আকর স্বরূপ ধর্ম্মসংহিতা ও লোক-লোচন স্বরূপ দর্শন শাস্ত্রের সহিত ঐক্যমত সম্পন্ন ; যাহা সমগ্রদেশীয় ও সকল জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের আদর্শ, সেই আয়ুর্ব্বেদে উপদিষ্ট বিধানে আহার, আচার, বিহার প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিলে আমরা দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারিব ; কালে আমরা আর্য্যবলে বলিয়ান্ হইয়া পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতির আদর্শ-স্বরূপ মহৎ আর্য্যজাতিরূপে অপরিসংখ্যেয় হইতে পারিব ।

আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃত দেবভাষায় লিখিত বিধায় বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের পক্ষে তাহা সুবোধ্য হয় না। এখন সাধারণের বোধ উপযোগী ভাষায় আদর্শ শারীর-বিজ্ঞান শাস্ত্রের বহু প্রচার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ আয়ুর্ব্বেদের যত অধিক প্রচার হইবে, যতই বিভিন্নদেশবাসীর বোধগম্য ভাষায় লিখিত হইবে, ও তদুপদিষ্ঠ-বিধানে মনুষ্য সমাজ পরিচালিত হইবে, ততই মনুষ্য সমাজ উপকৃত ও দীর্ঘায়ুঃ সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

আয়ুর্ব্বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত নয়, এবং পাশ্চাত্য শারীর বিজ্ঞানের ন্যায় পরীক্ষণের অপেক্ষা করে না ; ইহা অভ্রান্ত ও নিত্য। অপৌরুষেয় শাস্ত্রই আদর্শরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ অভ্রান্ত বিধায় পাশ্চাত্য-শারীর তত্ত্ববিদ্‌গণ আদরে গ্রহণ করিয়া নিজ দেশীয় শারীরবিজ্ঞানের সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিতেছেন ; আর যাঁহাদের সম্পত্তিস্বরূপ ও গৌরবের স্থান, তাঁহারাই "যুক্তিশূন্য, ও হাতুড়ে-বৈদ্যের সঙ্কলিত" মনে করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। অনেকে হয়তো মনে করিবেন, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র, ডাক্তারী, হেকিমী

প্রভৃতির ন্যায়, চলিত ভাষায় যাহাকে কবিরাজী পুস্তক বলে, তাহা মনুষ্য-প্রণীত ভিন্ন অপৌরুষেয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়; কারণ অনুমিত হইলে তবে তাহার প্রতিকার বিহিত হইতে পারে; পক্ষান্তরে কারণ দেখিয়া অনুৎপন্ন কার্য্যের অনুমান হয় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। এই অনুসারে বলিতে হইবে যে, রোগই অগ্রে হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কারণ অনুমিত হওয়ার পর চিকিৎসা-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব আয়ুর্ব্বেদ মনুষ্য-রচিত নয়, এরূপ বলা যাইতে পারে না। এই যুক্তির বিরুদ্ধে আমরা বলি যে, যেমন কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান হয়, সেইরূপ কারণ না থাকিলেও কার্য্য উৎপন্ন হয় না। কারণ পূর্ব্ব হইতে না থাকিলে রোগরূপ কার্য্যও হইত না। অতএব বলিতে হইবে যে, যেমন রোগের কারণ চিরদিন আছে, কারণের প্রতিকারও চিরদিনই রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে কারণ দেখিয়া অনুমিত রোগ ও কারণ উভয়ের প্রতিকার ও বর্ণিত হইয়াছে। এবং তাহা রোগ জন্মের অনেক পূর্ব্বে লিখিত ও হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্লেগ্ প্রভৃতি রোগ অতি অল্পদিন মাত্র ভারতবর্ষে দেখা যাইতেছে; কিন্তু তাহার লক্ষণ ও প্রতীকার প্রভৃতি বহু পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যদি আয়ুর্ব্বেদ সাধারণ মনুষ্য-রচিত হইত, তবে তাহা কখনই সম্ভবপর ছিল না। কারণ দেখিয়া কার্য্যের অনুমান করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নয়, অথচ পূর্ব্ব হইতে প্রত্যক্ষ বা শব্দে জ্ঞান না থাকিলেও প্রকৃত অনুমান হয় না। কারণ দেখিয়া কার্য্যে অনুমান হওয়াত দূরের কথা, কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান করিতে হইলেও প্রত্যক্ষ শব্দ জ্ঞান ব্যতীত মনুষ্য তাহা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যে ব্যক্তি দেখিয়াছে বা লোক মুখে শুনিয়াছে, অথবা শাস্ত্রে পড়িয়াছে যে, যে স্থানে ধূম থাকে সেই স্থানে অগ্নি থাকে; সেই ব্যক্তিই অনুমান করিতে পারে যে, পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে, অতএব তথায় অগ্নি আছে। আমি রন্ধন গৃহে যে সময় ধূম দেখিয়াছি সেই সময় অগ্নি ও দেখিয়াছি, অথবা সেইরূপ শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি। সেইরূপ যে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা শব্দ জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তি উত্তাপ দেখিয়া বলিতে পারে যে ইহা জ্বরের উত্তাপ, এবং জ্বর দেখিয়া বায়ু প্রভৃতির অন্যতম কারণের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়াছে, অনুমান করিতে পারে। অতএব বলিতে হইবে যে, আমরা যে রোগ ও তাহার কারণের অনুমান করি তাহার

প্রতিকারণ আয়ুর্ব্বেদ। আয়ুর্ব্বেদ না থাকিলে আমরা রোগ ও কারণের অনুমান করিতে সমর্থ হইতাম না। এইরূপ যিনি আমাদিগকে প্রথমে রোগ চিনাইয়া দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কারণও আয়ুর্ব্বেদ। এই আয়ুর্ব্বেদের রচয়িতা যাহাকে বলা হইবে, তিনিও অন্যের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সর্ব্বপ্রথম উপদেষ্টা একজন স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। আর তাঁহার সময়ে পরিদৃশ্যমান সর্ব্ববিধ রোগ ছিল, ইহাও অসম্ভব। একারণ স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যিনি সর্ব্বপ্রথম আয়ুর্ব্বেদোপদেষ্টা তিনি মনুষ্যাতীত শক্তি বিশিষ্ট, পুরুষাতীত বা ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রণীত বা উপদিষ্ট শাস্ত্রকেই অপৌরুষেয় বলে, ঈশ্বরোপদিষ্ট নিবন্ধন আয়ুর্ব্বেদে কারণ দেখিয়া অনুমিত কার্য্যস্বরূপ রোগ ও তদুভয়ের প্রতিকার বহু পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি যে, বর্ত্তমান "প্লেগ" ইত্যাদি রোগের উল্লেখ, পরবর্ত্তি কালের পুনর্ব্বসু প্রভৃতি যোগজজ্ঞানসম্পন্ন মুনিগণ, ঈশ্বর উপদিষ্ট বাক্যের অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক্রম পাঠ করিলে ও জানা যায় যে আয়ুর্ব্বেদ অপৌরুষেয়। ভগবান বেদব্যাস ও ভিন্ন ভিন্ন মুনিগনের রচিত গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, আয়ুর্ব্বেদ পরমেশ্বরের আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রকাশ হইয়াছে। ভগবান্ ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদের পরিচয় দিতে বলিয়াছেন যে, "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য অনুৎপাদ্যৈবপ্রজাঃ শ্লোকশত সহস্রমধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোহল্পায়ুষ্টমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োহষ্টধা প্রণীতবান। যিনি স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করেন, তাঁহার নাম স্বয়ম্ভূ। স্বয়ম্ভু শব্দে পরমাত্মা, শাস্ত্রান্তরে যাঁহাকে ভগবান ও ব্রহ্মশব্দে কীর্ত্তন করিয়াছে। স্বয়ম্ভু ভগবান্, প্রাণিসৃষ্টির পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ নামক অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ-অঙ্গসদৃশ অংশবিশেষ লক্ষশ্লোকময় অধ্যায় সহস্রাত্মকরূপে প্রণয়ন করেন। তারপর মনুষ্যগণ অল্পায়ুঃ ও অল্পমেধা সম্পন্ন হইয়াছে দেখিয়া, শল্য শালাক্য-তন্ত্রাদিরূপে পুনরায় আটভাগে প্রণয়ন করেন। মহাভারতে অভিহিত আছে, "পুরাণো মানবোধর্ম্মঃ সাঙ্গবেদশ্চিকিসিতং। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥" এই শ্লোকে পুরাণ, মনুসংহিতা, ষড়ঙ্গবেদ, চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ এই গুলিকে আজ্ঞাসিদ্ধ বলা হইয়াছে অর্থাৎ এই সমস্ত শাস্ত্রই মুনিগণ কর্ত্তৃক পরমেশ্বরের উপদেশ ক্রমে প্রকাশ হইয়াছে। "আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্ব

বেদমাত্মনঃ। স্থাপত্যঞ্চাসৃজদ্বেদংক্রমাৎ পূর্ব্বাদিতি মুখৈঃ॥ "শ্রীমদভাগবতে অভিহিত শ্লোকার্থে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বাদিক্রমে সন্নিবিষ্ট ব্রহ্মার চারিমুখ হইতে আয়ুর্ব্বেদাদি চারি উপবেদ প্রকাশ হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে "অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেত,শ্চতুর্দ্দশঃ॥ আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গন্ধর্ব্বশ্চেতিতে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈবতাঃ॥" অভিহিত শ্লোকে আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাদশ বিদ্যার অন্তর্গত ও প্রামাণ্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব আয়ুর্ব্বেদোপদিষ্ট বিধান বেদবিধির ন্যায় অভ্রান্ত সত্য ও অখণ্ডনীয় বলা যাইতে পারে। যে ধন্বন্তরি প্রথমে পৃথিবী লোকে আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন, তিনি বেদব্যাসের অনেক পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন! ধন্বন্তরি ও বেদব্যাস উভয়ে পরামর্শ করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন, ইহা যেন কেহ মনে স্থান না দেন।

কবিরাজ—শ্রীমোহিনী মোহন কাব্যতীর্থ, আয়ুর্ব্বেদরত্ন।

ভ্রম সংশোধন।

গত সংখ্যায় মুদ্রাকরের প্রমাদবশতঃ কয়েকটি ভুল প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রাহকগণ দয়া করিয়া উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

৫ম সংখ্যা ১৬৯ পৃষ্ঠায়

অশুদ্ধ—"১ গ্রেণ, বা অর্দ্ধ রতি পরিষ্কার জল—১ আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক কষ্টিক"

শুদ্ধ—১গ্রেণ বা অর্দ্ধ রতি কষ্টিক—১ আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক পরিষ্কার জল।

১৭১ পৃষ্ঠা ৬ষ্ঠ ছত্র।

অশুদ্ধ—"দুইটি ফুঁ দি ত হয়"—

শুদ্ধ—'তিনটি ফুঁ দিতে হয়"